১৩৫২-র সেরা গল্প

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী
সম্পাদক

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—চৈত্র, ১৩৫১

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স

মুদ্রাকর—বীরেন সিমলাই
নববিধান প্রেস
৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

চার টাকা

সূচীপত্র

দুলিয়ে বেণী চলেন যিনি
এই আধুনিক বিনোদিনী
মহাকবি কালিদাসের কাব্যের নিপুনিকা, চতুরিকা,
মালবিকাদের অনুপম সৌন্দর্য্য এখনও পাঠককে অভিভূত
করে; কিন্তু বর্ত্তমানযুগের 'দুলিয়ে বেণী চলেন যিনি,
এই আধুনিক বিনোদিনী'-দের চিত্র মহাকবির কল্পনায়ও
ছিলনা। আধুনিকাদের সুদীর্ঘ বেণী দুলিয়ে চলার
লীলায়িত ছন্দ বাস্তবিকই নয়নাভিরাম।
বর্ত্তমানযুগে একমাত্র হিমস্নিগ্ধ 'হিমকল্যাণ'
কেশতৈলই সুদীর্ঘ বেণী রচনায় অদ্বিতীয়
হিমকল্যাণ
ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর
আয়ুর্ব্বেদোক্ত কেশতৈল
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস
কলিকাতা
UPCO. H.K. 22

ভূমিকা

গল্প বলো।—

সন্ধ্যার অন্ধকার এসেছে ঘনিয়ে। স্বর্গলোকের ঘুমহারা দুষ্টু শিশুদের মতো তারাগুলো মিট মিট ক'রে চাইছে। রাক্ষসীর এলো চুলের মতো দুলছে তালের পাতা। ঝোপে ঝোপে কালো পশমের মতো অন্ধকার এসে জমেছে। দিনের পরিচিত পৃথিবীকে রাত্রে আর চেনাই যাচ্ছে না। এই রহস্যময় অন্ধকারে মায়ের বুকে লুকিয়ে শিশু বলছে, গল্প বলো।

কী গল্প শুনতে চায় সে?

তার দিনের বেলার সঙ্গী-সাথী, খেলাধুলোর গল্প নয়। যাদের সে চেনে, তার কাছে তাদের কোনো রহস্য নেই। যাদের সে চেনে না, দিনের বেলায় যাদের কখনও দেখেও নি, হয়তো কোনো দিন দেখতে পাবেও না, অথচ রাত্রির অন্ধকারে যারা তার কল্পনাকে চঞ্চল ক'রে তোলে, তাদেরই গল্প সে শুনতে চায়। শুনতে চায়, সত্যযুগের কথা-বলা গাছের কথা, রাক্ষস-খোক্কস, বিহঙ্গম-বিহঙ্গমী, রাজা-রাণী-রাজপুত্র এবং পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা।

গল্প শোনার মূলে এই হোল সবচেয়ে বড় সত্য কথা। কি শিশু, কি বড়, সবাই সেই রহস্যময় অপরিচিতদের কথা শুনতে চায় যারা কল্পনাকে চঞ্চল ক'রে তুলতে পারে।

মানুষের এই গল্প শোনার আগ্রহেই ছোট গল্পের জন্ম। এরই মধ্যে মানব-সভ্যতার সুরু। যখন অক্ষরের সৃষ্টি হয়নি তখনও মানুষ গল্প ব'লেছে এবং শুনেছে। মুখে-মুখেই তা ছড়িয়ে পড়েছে। ভিন দেশের পথিক কল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে তার অভিজ্ঞতার কথা সরস ক'রে ব'লেছে। গভীর আগ্রহে শ্রোতার দল তাকে ঘিরে সেই গল্প শুনেছে। তারপরে যখন অক্ষরের সৃষ্টি হয়েছে তখন কেউ বা তা অক্ষরে গেঁথে রেখেছে, ভাবীকালের শ্রোতাদের জন্যে।

তারপরে আমাদের দেশের ঋষিরা যখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহাকাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ ক'রেছেন, ছোট গল্পকে তখনও তাঁরা ভুলতে

পারেননি। অসীম আকাশের মধ্যে বিধাতা যেমন ক'রে তারা ছিটিয়ে রেখেছেন, মহাকাব্যের আকাশে তাঁরাও তেমনি উপাখ্যানের আকারে [illegible] রসমাধুর্যে [illegible]

[illegible] ছোট গল্পের বিষয় বস্তুর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দেব-দৈত্য, গন্ধর্ব-কিন্নর, রাক্ষস-অসুর, যাদের ঘিরে একদা মানুষের কৌতূহল ও কল্পনা প্রবল হযে উঠেছিল, গল্পের আসর থেকে ধীরে ধীরে তারা বিলুপ্ত হতে লাগলো। রাজা-মহারাজা এবং রাজান্তঃপুরের অসূর্যম্পশ্যা রহস্যময়ীরাও বিদায় নিলেন। সাধারণ মানুষ, কেউ উচ্চ কেউ নিম্ন-মধ্যবিত্ত, কেউ বা শ্রমিক তারাই আজ গল্পের নায়ক-নায়িকা। কিন্তু তাই ব'লে যদি বলি, যে রহস্যময় অপরিচয়ের মধ্যে গল্পের সৃষ্টি হয়েছে, আজকের গল্পে তা আর নেই, তাহ'লেও ভুল বলা হবে।

আজও গল্পের জন্ম সেই রহস্যময় অপরিচয়ের মধ্যেই। যে জিন্নাত হাতে-পায়ে-কোমরে দড়ি-বাঁধা অবস্থায় লাকড়ি-ঘরে শুকনো হোগলার উপর শুয়ে নিঃশব্দে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে, অথবা যে সন্দেহ-পরায়ণা বাতগ্রস্তা পিসিমা সকল সময় সন্দেহ করছেন তাঁর অসাক্ষাতে বধূরা পরপুরুষের সঙ্গে হাস্যপরিহাস করছে, কিংবা যে জনাব সারাজীবন ইমারতের কাব্যে বিভোর হ'য়ে রইল তাদের এবং আরও যাদের আমরা দু'বেলা চোখের সামনে দেখি আর ভাবি এরা আমাদের বিশেষ পরিচিত, এদের চেনা সম্পূর্ণ হযে গিয়েছে, আসলে তাদের আমরা কত অল্প চিনি! মানব-মনের গহন অরণ্যের কতটুকু আমাদের প্রাত্যহিক দৃষ্টিতে পড়ে, তা বুঝতে পারি এখনকার গল্পগুলি পড়লে। এর নায়ক-নায়িকারা প্রথম দৃষ্টিতে কত পরিচিত মনে হয়, কিন্তু আসলে কত অপরিচিত! নতুনতর আবেষ্টনের মধ্যে ঘনিয়ে ওঠে কত অপরিসীম রহস্য!

রোমান্টিসিজ্‌মের যুগ অনেক দিন হোল শেষ হয়েছে। এখন রিয়ালিজমের যুগ। কিন্তু এই যে বস্তুতান্ত্রিকতা, এর অর্থ এ নয় যে,

সংসারে যে জিনিস যেমন ক'রে ঘটে, এখনকার গল্প তারই হুবহু ফোটোগ্রাফ। ফোটোগ্রাফ যেমন কদাচিৎ আর্টের পর্যায়ে পড়ে, ঘটনার ফোটোগ্রাফও তেমনি কদাচিৎ সাহিত্যে রসোত্তীর্ণ হয়। খাঁটি সোনায় অলঙ্কার তৈরী হয় না। খাদ বস্তুটি যতই মূল্যহীন হোক না কেন, অলঙ্করণে তার আবশ্যক একান্ত। বস্তুতঃ খাঁটি রিয়ালিজম অথবা খাঁটি রোমান্টিসিজম ব'লে কিছুই থাকতে পারে না। সাহিত্যে ও দুটোই অচল। যে সাহিত্যে রোমান্টিক অংশ বেশী তাকেই যেমন আমরা রোমান্টিক বলি, যাতে বাস্তবতার অংশ বেশী তাকেই তেমনি আমরা বস্তুতান্ত্রিক বলি। তফাৎটা নির্ভর করে মিশ্রণের অনুপাতের উপর। এই বইতে ১৩৫২ সালের যে ক'টি সেরা গল্প সংকলিত হয়েছে, তার উপরকার অতি সূক্ষ্ম রোমান্টিসিজমের পর্দা আশা করি, সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না।

গোড়াতেই ব'লে রাখা ভালো, এই সংকলনই ১৩৫২ সালের সেরা গল্পের সম্পূর্ণ তালিকা নয়। বাংলা সাহিত্য আজ যথেষ্ট সমৃদ্ধ। প্রতি মাসেই অনেকগুলি ভালো গল্প বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়। তার সমস্তগুলি একখানি গ্রন্থে সংকলিত করা সহজ নয়, আমাদের পক্ষে নানা অনিবার্য কারণে সম্ভবও নয়। বাংলার মাত্র বিশিষ্ট কয়েকজন গল্প-লেখকের একটিমাত্র ক'রে গল্প এতে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। যে গল্পগুলি আমরা চয়ন করেছি, সেইগুলিই লেখকদের গত বৎসরের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প কিনা, সে বিষয়েও মতভেদের সম্ভাবনা অবশ্যই রয়েছে। রসের বিচারে আমাদের সঙ্গে সকলেরই মতের মিল হবে, এ প্রত্যাশা নিশ্চয়ই আমরা করি না। কিন্তু গল্পগুলি যে নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট গল্প এবং এই সংকলন যে বৈদেশিক যে কোনো গল্প সংগ্রহের সমপর্যায়ে পড়ে, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

ছোট গল্পের আকার কত ছোট, অথবা কত বড় হবে, কোন্ সীমা অতিক্রম করলে আর তা ছোট গল্প ব'লে গণ্য করা হবে না, এ বিষয়েও এখনও কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়নি। রসিক সমাজ শুধু এই পর্যন্ত একমত যে, ছোট গল্প ছোটও হওয়া চাই, গল্পও হওয়া চাই। বৎসর পোনের পূর্বে 'বঙ্গশ্রীতে' কত ছোট ক'রে গল্প লেখা যেতে পারে তার

একটা পরীক্ষা আমরা অনেকে মিলে ক'রেছিলাম। গল্প যেন এক পৃষ্ঠার বেশী না হয় এই ছিল সর্ত। সর্ত যথাযথ পালিত হয়েছিল, কিন্তু প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তা থেকে অবশ্য একথা প্রমাণিত হয় না যে, এক পৃষ্ঠার মধ্যে সত্যকার ছোট গল্প লেখা যায় না। এইটুকু মাত্র প্রমাণিত হয় যে, এক পৃষ্ঠার মধ্যে ছোট গল্প লেখা কঠিন।

আমার নিজের বিশ্বাস, ছোট গল্পের ছোট হওয়াটাই বড় কথা নয়, গল্প হওয়াটাই বড় কথা। ছোট গল্পে বাহুল্যের কোন স্থান নেই। শিশিরবিন্দুর মত তা একটী সুন্দর সংকীর্ণ বৃত্তের মধ্যেই সম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু রস সম্পূর্ণ হবার পক্ষে বৃত্তটি যতটুকু বড় হওয়া একান্তই আবশ্যক, ততটুকু বড় না হলে চলবে না। তাই সংকলনে রসের বিচারই আগে ক'রেছি। সংকলিত গল্পগুলি আকারে খুব ছোট নয়, খুব বড়ও নয়, এবং সত্যসত্যই ছোট গল্প।

আর একটি প্রশ্ন আজকাল বড় ক'রেই দেখা দিয়েছে: গল্পের মধ্যে রাজনীতি অথবা সাহিত্যেতর অন্য কিছুর স্থান থাকা উচিত কিনা? সাহিত্য সম্পর্কে উচিত-অনুচিতের প্রশ্নের উপর আমি কোনোদিনই গুরুত্ব আরোপ করি না। আমার কাছে সাহিত্যে রসই মুখ্য, শ্লীল-অশ্লীল, রাজনীতি-অরাজনীতি সমস্তই গৌণ। অশ্লীলই হোক আর রাজনৈতিকই হোক, রচনা রসোত্তীর্ণ হ'লে তবেই তা সাহিত্য। রাজনীতিকে অবলম্বন ক'রে যদি কেউ রসসৃষ্টি করতে পারেন, তাহ'লে আপত্তির কি থাকতে পারে? রচনা তখনই ব্যর্থ হয়, যখন রসসৃষ্টির লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে তা রাজনৈতিক প্রচারকার্যেই নিযুক্ত হয়। যেখানে রাজনৈতিক প্রচারকার্যই মুখ্য এবং রসসৃষ্টি গৌণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই সংকলনে অনেকগুলি গল্পেই ১৩৫২ সালের ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। তাতে ক'রে গল্পাংশ ক্ষুন্ন তো হয়ই নি, বরং ঘটনা এবং পরিবেশের নতুনত্বে রস আরও ঘনীভূত হয়েছে ব'লেই আমি মনে করি। মানব-জীবনের বৈচিত্র্যের মধ্যেই গল্পের প্রাণরস। সেই বৈচিত্র্য সমাজের খাত বেয়েই আসুক, আর রাজনীতি অথবা অর্থনীতির খাত বেয়েই আসুক, তাতে

কিছু যায় আসে না। গল্পলেখকের কাছে সমাজও বড় নয়, রাজনীতিও বড় নয়, অর্থনীতিও বড় নয়। সেগুলি রসসৃষ্টির উপাদান মাত্র। বিচিত্র ঘটনার সংঘাতে অথবা একটা বিশেষ পটভূমিকার সামনে মানবমনের যে অপরূপ প্রকাশ, আসলে তাই তাকে আকর্ষণ করে। সেইটেই হচ্ছে গল্পের চিরন্তন আবেদন,—রাজনীতি নয়, অর্থনীতিও নয়। আজকের রাজনীতি কাল হয়তো বাতিল হয়ে যাবে, আজকের অর্থনৈতিক অথবা সামাজিক আবেষ্টনের কাল হয়তো চিহ্নও থাকবে না, কিন্তু মানুষের কাছে মানুষের যে আবেদন তা সর্বকালে এবং সর্বদেশেই সমান প্রবল। সাহিত্যের পরমায়ু তারই মধ্যে নিহিত। রাজনৈতিক মতবাদের তর্কের ঝড়ে সে কথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য আনন্দ পরিবেশন। আমাদের সংকলিত গল্পগুলি পাঠক সমাজকে আনন্দ পরিবেশনে সক্ষম হবে সে ভরসা আছে। সেই সঙ্গে তাঁদের মনে ১৩৫২ সালের আমেজও যাতে ফিরে আসে সে দিকেও লক্ষ্য রেখেছি। অনেকগুলি গল্প পড়লেই বোঝা যায়, এগুলি ১৩৫২ সালের এবং বিশেষ ক'রে ১৩৫২ সালেই লেখা। এখান থেকে প্রতি বৎসর একটি ক'রে সেরা গল্প সঞ্চয়ন প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছে যখন, তখন প্রতি বৎসরের সঞ্চয়নে সেই বিশেষ বৎসরের সুখ ও দুঃখ, আশা ও নিরাশা এবং আনন্দ ও বেদনার স্মৃতির একটি বিশেষ মাধুর্য আছে। তা মনকে স্বপ্নালু ক'রে তোলে, হৃদয়ে একটি অস্পষ্ট অথচ পরিচিত মধুর অনুভূতি জাগায়। তারও একটি বিশেষ মূল্য আছে।

উপসংহারে পাঠক সমাজের কাছে আরও একটি নিবেদন আছে। এই সঞ্চয়ন শারদীয়া পূজার পূর্বেই বার হয়। এবারও তাই হ'ত। কাগজের দুর্ভিক্ষ, ছাপাখানার অভাব এবং পুস্তক প্রকাশে আরও যে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন যুদ্ধের সময় থেকে এখনও চ'লে আসছে, সে সমস্ত তো আছেই। তৎসত্ত্বেও বইখানি পূজার পূর্বেই প্রকাশ করবার ব্যবস্থা ঠিক ছিল। এমন সময় এল ১৬ই আগষ্ট! এবং তার পরেই যে আগুন জ্বলে উঠলো

'আগে আগুনে ঝাঁপ দিই, পরে না-হয় পানিতে দেব।' জেন্নাতালি বললে।

'পথ ছাড়ো বলছি। রাগ-রঙ্গের জায়গা নয় এটা।' ঝলসে উঠল মমিনা: 'যদি না ছাড়ো তো বাড়ি ফিরে গিয়ে বাজানকে বলে দেব।'

'আমিও বাড়ি ফিরে গিয়ে বাজানকে বলতে পারি।'

'কি বলবে তুমি?'

'বলব মকবুল মুছুল্লির মেয়ে মমিনা বলছে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে।'

'ওমা, কখন বললাম!'

'ঘরে নয়, বলেছে, আমার মুখে আগুন লাগিয়ে দেবে।'

'দেবই তো একশো বার। নুড়ো জ্বেলে দেব।'

'তাই বাজানদের বললে লাভ হবে না, দাঙ্গা বেধে যাবে দুই বাপে। আমার মুখে জ্বলুক নুড়ো, ক্ষেতি নেই, কিন্তু তোমার মুখে একটু হাসি, ফোটাও, মমিনা।'

'মমিনা চোখ নামাল। বললে, 'হাসির গল্প নেই, তবু হাসি কি করে? শুধু শুধু কারু ফরমায়েসে হাসা যায়?'

'চাঁদ কি কারু ফরমায়েসে হাসে? আর যার অমন চাঁদমুখ—'

মমিনা হেসে ফেলল। ছলছলে জলে চিকচিক করে উঠল রুপুলি চাঁদের টুকরো। খালের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল জিন্নাৎ। বাকি জলটুকু পার হয়ে গেল সাঁতরে।

শিকস্তি-পয়স্তির দেশ। নতুন চর উঠেছে। যে নদী ভেঙেছে সেই নদীই দিয়েছে ভরাট করে।

জিন্নাতের বাপের নাম গফুরালি। সে বলে, আমার ভাঙ্গা জমি আবার ভেসে উঠেছে। শিকল-জরিপ করে জমি ভাঁউরে নিলেই বোঝা যাবে ঠিকঠাক।

মিথ্যে কথা। বলে মকবুল। মমিনার বাপ। বলে, নতুন চর, যখন আমার জমির লগ্ন, তখন আমার স্বত্ব।

প্রথমে ঝগড়া-বচসা। তর্ক-বিতর্ক। মন কষাকষি। শত্রুতালি। পক্ষাপক্ষি।

দু'পক্ষের জমিদার দু'পক্ষের পিছে এসে দাঁড়াল। ঠিক করলে প্রজাদের দিয়ে মামলা বসিয়ে পরোক্ষভাবে নিজেদের স্বত্ব বর্তিয়ে নেবে। পিছনে থেকে উস্কে দেয় ঘন-ঘন।

কিন্তু মামলা বসানো মুখের কথা নয়। তার অনেক তোড়জোড় লাগে, অনেক কাঠখড়। অনেক দলিল-দাখিলা। বাদী হওয়া সুবিধে না বিবাদী হওয়া এই নিয়ে সল্লা-পরামর্শ চলে। খালি দিন গোনে। চরে ঘাস গজায়। গজায় বনঝাউ।

এক দিকে আদমপুর, অন্য দিকে ধুলেশ্বর। তারা আর অপেক্ষা করতে রাজী নয়। দেওয়ানি আদালতে ফেরফার আর গলিঘুঁজির মধ্যে তারা যেতে চায় না। তারা ল্যাজা-লাঠির তদারক করে। আমি হামি হব, বলে গফুরালি। মকবুল বলে, আমি হামি হব। লাঠিতে তেল মাথায়, ল্যাজার মুখে শান পড়ে। সুরু হয় বুঝি হামলা-হামলি।

পলিমাটি শক্ত হয়ে উঠেছে। ফলেছে উড়ি। ধান সমর্থ হয়ে উঠেছে আবাদের জন্যে।

সাজ-সাজ রব পড়ে গেল দু'দিকে। গাজী-গাজী। ঢাল-সড়্‌ক, বর্শা-বল্লম, ল্যাজা-লাঠি, কোঁচা-টাঙ্গি, দা-কুড়ুল দুদিকেই ঝকমকিয়ে উঠল। চরের দখল নিয়ে বাধে বুঝি হাঙ্গামা।

আদমপুরের মোড়ল গফুরালি, ধুলেশ্বরের মোড়ল মকবুল। দু'জনেরই হাল-হালুটি বিস্তর, পাকা ভিতের উপর টিনের ঘর অনেকগুলি। তাঁবেদার লোক-লস্করের অভাব নেই। মোড়লে-মোড়লে ঝগড়া, কিন্তু দেখতে-দেখতে ছেয়ে পড়ল তামাম গ্রামে। এ-ও এককাট্টা, ও-ও এককাট্টা।

অকু হলে হোক। কুছ পরোয়া নেই। মারপিট, খুনোখুনি, দাঙ্গাফ্যাসাদ। হয়ে যাক হয়-নয়। এসপার কি ওসপার। আগে থেকে পুলিশে এত্তেলা দেবেনা কেউ। পরে জেল-ফাটক হয় তো হবে। দ্বীপান্তরেও রাজি। বুকের মাংসের চেয়ে দামী যে জমি, সেই জমির চেয়েও মান বড়। স্বত্বের চেয়েও বড় হচ্ছে দখল।

উলু মাঠ ভেঙ্গে চাষ সুরু করে দিল জিন্নাত। লাঙল দিলেই খড় ভেঙে-ভেঙে যায়। মাটি ফেটে-ফেটে পড়ে। এক চাষ দিয়েছে, দুয়ারে-

তিয়ারে দরকার নেই, আদমপুরের লোকেরা ছুটে এল দলে-দলে। পাখা-মেলা বাদুড়ের ঝাঁকের মত।

গফুরালি হুকুম দিলে, কোট-এলাকা বজায় রাখতে হবে। দখল যখন নিয়েছি একবার, বেদখল হতে পারব না। ওরা হটে গিয়ে আদালত করুক। থানায় গিয়ে এজাহার দিক। আমরা আমাদের গায়ের বস্ত্রের মত জমি কামড়ে পড়ে থাকব।

উঠন্ত রৌদ্রে ঝলসে উঠল অনেক পালিশ-করা শানানো লৌহমুখ, উড়ল অনেক ধুলোমাটি, ফিনিক দিয়ে ছুটল অনেক কাঁচা রক্তের তোড়। যার আর্তনাদ করার কথা সেও উন্মত্ত, ক্রুদ্ধ উল্লাস করছে। অস্ত্র ফেলে দিয়ে যার মাটি নেয়ার কথা সেও লাথি ছুঁড়ে মারে।

হেরে গেল গোফুরালির দল। ছোড়ভঙ্গ হয়ে গেল দেখতে-দেখতে। চম্পট দিল খাল-নালা সাঁতরে।

কিন্তু জিন্নাতালি ফিরল না।

জিন্নাতালি আটক পড়েছে শত্রুর কব্জার মধ্যে। আর ছাড়াছাড়ি নেই। কয়েদ-খালাসী মোকদ্দমা করতে চাও তো করো গে, কিন্তু তার আগেই গুম হয়ে যাবে।

মুচলেকা দাও, এই চর মকবুল মুছুল্লির। দাও মুক্তিপত্র। একটানা দখল করতে দাও বারো বছর। রাজি হও তো, ফিরিয়ে পাবে ছেলে। না হও তো, কচুকাটা করে ভাসিয়ে দেব দরিয়ায়।

হাতে-পায়ে-কোমরে দড়ি বাঁধা, জিন্নাত শুয়ে আছে লাকড়ি-ঘরে। শুকনো হোগলার উপর।

রাত গহিন, ঝিঁঝিঁ ডাকছে। জ্যোৎস্নায় মোছা-মোছা অন্ধকার।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল জিন্নাতের। তার জ্বরো কপালের উপর কার মিঠে হাতের ছোঁয়া।

'কে ?'

'আমি গো আমি। মমিনা।'

স্বরের মিঠানিতে জ্বর জুড়িয়ে গেল গায়ের। যেন স্বপন দেখছে, স্বপন শুনছে জিন্নাত।

'জখম হয়েছে তোমার ?'

'লাঠি লেগেছে ডান হাতে, বাঁ কাঁধের উপর। ব্যথায় ছিঁড়ে পড়ছে দু'হাত। বেতাগী ল্যাজা ফসকে গেছে, বিঁধতে পারেনি বুকের মধ্যে।'

'এইখানে লেগেছে?' হাতের মিঠানি কপালের থেকে চলে আসে বাহুর উপর।

'এখন আর ব্যথা নেই। শুধু দড়ির বাঁধনটাই যা ফেলেছে বেকায়দায়।'

সত্যি, সমস্ত জ্বর-জ্বালা ব্যথা বেদনা যেন উবে গিয়েছে এক পরশে। ফুটন্ত গায়ের রক্ত ঝিমিয়ে পড়ল। চোখে লাগল যেন ঘুমের আমেজ। নতুন-ফোটা কদমের গন্ধ পাচ্ছে মৃদু-মৃদু।

দড়ির গিট খুলে দিতে লাগল মমিনা।

'এ করছ কি মমিনা, বাঁধন খুলে দিচ্ছ গা থেকে?'

'হ্যাঁ,' ছোট-ছোট আঙুলে বিন্দু বিন্দু স্পর্শের শিশির ঢেলে-ঢেলে মমিনা বললে 'এ বাঁধন যে আমাকেও বেঁধে আছে আষ্টেপৃষ্ঠে। প্রথম রাতে সদ্দার-চাঁইরা হল্লা-ফুর্তি করেছে। জবরদখল তো করেইছে, হটিয়ে দিয়েছে বিপক্ষদের। তার উপরে কয়েদ করেছে ও দলের সাজোয়ানের ছেলে। কিন্তু আমি শুধু কেঁদেছি!'

'এ কি, ছেড়ে দিচ্ছ আমাকে? জানতে পারলে তোমার কী সর্বনাশ হবে জানো?'

'জানতে পারবে না।'

'পারবে না মানে?'

'মানে, জানতে পারলেও কিছুই করতে পারবে না আমার।'

'তা কি করে বলছ?'

'বলছি আমিও ছাড়া পাব তোমার সঙ্গে।'

'তুমি?'

'হ্যাঁ, আমিও তোমার সঙ্গে চলে যাবো।'

'চলে যাবে? কোথায়?'

'বল্লভপুরের কাজীর কাছে। জানো তো কাজী কুরমান মোল্লা আমার খালু। নদীর দু'বাঁক পরেই বল্লভপুর।'

'সেখানে কি ?'

'সেখানে গিয়ে কাজীর দরবারে কাবিননামা রেজেষ্ট্রি করব। তোমার সঙ্গে আমার সাদি হবে। তুমি তুলহা আমি তুলহান।' কথার মাঝে লজ্জা আর আনন্দের মিশেল। সাহস আর ব্যাকুলতার।

গায়ের রক্ত শির-শির করে উঠল জিন্নাতের। বললে, 'তোমার বাপ-চাচা রাজি হবে ?'

'না হোক। আমি তো আর নাবালগা নই যে অলি লাগবে বিয়েতে। আমি বালিগ হয়েছি গেল পৌষ মাসে। পনেরো বছর পেরিয়ে গেছি আমি। তা আমি সাবিদ করতে পারব। আমাদের বিয়ে তুড়তে পারবে না কেউ।'

'বিয়ে হবে আমাদের ?' ঘোর-ঘোর চোখে এখনো স্বপন দেখছে জিন্নাত ?

'হ্যাঁ, তোমার খেদমতে থাকব চিরকাল। আমাদের বিয়ে হয়ে গেলেই ঝগড়া-বিবাদ মিটে যাবে তু' পক্ষের। যে চর আমার বাজান বলছে আমার আর তোমার বাজান বলছে তার, সে-চর তারা তুয়ে মিলে আমাদের তুজনকে জায়গীর দিয়ে দেবে। নাইয়র যেতে-আসতে হবে আমাকে, বাঁশের নড়বড়ে সাঁকো আবার শক্ত কাঠের পোল হয়ে উঠবে। তু'গ্রামে ফিরে আসবে মিল-মহব্বত। তা ছাড়া আমি তো আর পথ দেখি না। নইলে চিরকালই তু'দল কেবল মারামারি করবে, আমার মনের মানুষের গায়ে ঝরবে রক্ত আর আমার চোখে ঝরবে দরিয়ার পানি !'

'কি করে যাবে, মমিনা ?' জিন্নাত উঠে বসল।

'ঘাটে ডোঙ্গা আছে মাছধরার। তাতে করে পালাব।' কালো চোখে আলো জ্বললো মমিনার।

'আমার হাত যে ভাঙ্গা। নৌকা বাইবে কে ?'

'আমি দাঁড় টানব ! তুমি শুধু হালটা ধরে বসে থাকবে। পারবে না ?"

'পারব।'

'তবে চলো। নদীর নাম আঁধারমাণিক। আঁধার থাকতে-থাকতেই বেরিয়ে পড়ি।'

দুজনেই ত্রস্ত হাল্‌কা পায়ে চলে এল নদীর পারে। বাদাম গাছের নিচে নৌকো বাঁধা। হালকা মেছো ডিঙি।

'হাল-দাঁড় কই ?' জিগগেস করলে জিন্নাত।

'ও!' বুঝতে পেরেছে মমিনা। সব আশা-সোটা হয়েছে দাঙ্গার উরদিশে। বললে, 'তুমি একটু বোসো। উঠোনে মুলি-বাঁশ আছে, তাই দুটো নিয়ে আসি কুড়িয়ে। লগি ঠেলে-ঠেলে চলে যাব দু'জনে। তুমি যদি না পার আমি একা বাইব। ভাটির নদী তরতরিয়ে বয়ে যাবে।' মমিনা ফিরে গেল।

এমনি করেই বুঝি সমাধান হবে, এত সব হাঙ্গাম-হুর্জ্জুতের, আক্রোশ-আক্রমণের! একটা মেয়েকে নিয়ে করে! ঘরের বিবি বানিয়ে। এত হুড়দঙ্গল, কলহ-কোন্দল, চোটজখম, এত রক্তপাত—সব এমনি করে রফানিষ্পত্তি হয়ে যাবে। এমনি ভাবে ভুলে যেতে হবে হার-মার, ঘায়ে মলম লাগাতে হবে মোলাম করে। বাজানকে গিয়ে বলবে, মোল্লার কাছে কেতাব-কলমা পড়ে এসেছি আমরা, এবার ছোলেনামা দাখিল করে দাও আদালতে।

সে না মরদের বাচ্চা ?

কিন্তু উপায় কি। এ যে একটা মেয়ে নয় খালি, এ যে মমিনা। নদীর নামে তারও নাম। সে যে আঁধারমাণিক।

ছোট দেখে দুটো হালকা বাঁশ নিয়ে এল মমিনা। এসে দেখে, জিন্নাত নেই, ডোঙাও নেই। দু' হাতে জল কেটে কেটে বেরিয়ে গেছে সে অনেক দূরে। ঐ দেখা যায়।

ভাঙা চাঁদ ডুবে গেল পশ্চিমে। মমিনা তাড়াতাড়ি চলে এসে তার ছাড়া বিছানায় শুয়ে পড়ল। বেড়ার ফাঁক দিয়ে নদীর আভাস দেখা যায় ঝাপসা-ঝাপসা। অন্ধকারে আঁধারমাণিকের দিকে চেয়ে থেকে ভাবতে লাগল, জিন্নাতের দু'হাতে হঠাৎ এত জোর এল কি করে ?

দুপুর রোদে

আশাপূর্ণা দেবী

ছুটির দরখাস্তখানা বড়সাহেবের টেবিলে রাখিয়া বাড়ী আসিয়া স্যুটকেস গুছাইতে বসিলাম।

বেণু লিখিয়াছে—"বিয়ে টিয়ে করবার মতলব আছে কি নেই সোজাসুজি খুলে বলো দিকিন, না থাকে বয়ে গেল। মনে কোরো না, অভিমানে মূর্চ্ছা যাবো। আশে পাশে এখনও এমন অনেক অ্যাড্‌মায়ারার আছে যে, শ্রীমতী বেণুর কৃপাকটাক্ষ পেলে ধন্য হয়ে যায়।

সময় থাকতে নিজের আখের গুছিয়ে নিতে হবে তো আমাকে? মোটকথা বুড়ি আইবুড়ি হয়ে থাকবার বাসনা আমার নেই। তুমি ওখানে বসে বসে গ্রেড্‌ বাড়াবার জন্যে জীবনপাত করতে থাকবে—আর আমি এখানে শুকনো পুঁথির পাতা নিয়ে রিসার্চ্চ করতে করতে জীবন মাটি করবো এর কোনো মানে হয়?"

এমন চিঠির পর স্থির থাকা শক্ত।

লাইনের ফাঁকে ফাঁকে বেণুর অভিমান-স্ফুরিত মুখখানি যেন ঝিলিক মারিয়া উঠিতেছে।

একথা মিথ্যা নয় ছুটি পাইলেই কলিকাতায় ছুটি বেণুর খাতিরেই, ফিরিয়া আসিবার সময় সাধু ভাষায় যাহাকে বিরহ যন্ত্রণা বলে সেটাও দস্তুরমত টের পাই, কিন্তু বিবাহ করিবার উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা যেন কিছুতেই মিলিয়া ওঠে না।

সত্য কথা গোপন না করিলে—সাহসেরও অভাব।

বারে বারে হিসাব করিয়াও আশঙ্কা আর কাটিতে চায় না। বেশ ছিলেন আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা—প্রেম করিবার দুঃসাহস না থাক্ বিবাহ করিবার সৎসাহ তাঁহাদের ছিল। এবং সেই চিরজীবনের জীবন-সঙ্গিনীকে চাক্ষুষ দেখিয়া লইবারও প্রয়োজন বোধ করিতেন না।

উত্তর পুরুষদের চাইতে বুকের পাটা যে তাঁহাদের বহুল পরিমাণে ছিল—সেকথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কিন্তু না—সাহস সঞ্চয় করিতেই হইবে—এমন স্পষ্ট দাবীকে অগ্রাহ্য করিব কোন সাহসে?

অন্য অন্য বারে অবশ্য সোজা বেণুদের বাড়ী গিয়াই হানা দিই, কিন্তু এবারে স্থির করিলাম অন্যত্র উঠিব। হাজার হোক চক্ষুলজ্জা বলিয়া একটা কথা বাঙলা ভাষায় চলিত আছে তো?

অগত্যা পিসিমার বাড়ী। ৫/২৬৭

ছেলেবেলায় পিসিমার বাড়ীটাই একরকম ঘরবাড়ী ছিল, এখন আর যাওয়া আসা তেমন নাই—নাই একরকম নিজেরই দোষে। হাওড়া স্টেশনের কাছাকাছি প্রবোধদার অফিস, কলিকাতায় যাইতে আসিতে ওই অফিস হইতেই তত্ত্ববার্ত্তাটা সারিয়া লই।

আজও ষ্টেশনে নামিয়া ভাবিলাম—অফিসটা ঘুরিয়া যাই, অনেকদিন খোঁজ খবর জানা নাই। খানিকটা যাইতেই দেখি পরেশবাবু টিফিন করিতে বাহির হইয়াছেন, প্রবোধদার এক টেবলেই বসেন—মুখচেনা ছিল। ডাকিয়া প্রশ্ন করিলাম—একা যে? প্রবোধদা বেরোন নি?

পরেশবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন—কে, সোমেনবাবু নাকি? আপনার প্রবোধদা তো আসছেন না—ছুটিতে রয়েছেন যে, আমারই হয়েছে মৃত্যু। সায়েব ব্যাটা হচ্ছে—তেমনি রগচটা, একটু উনিশ বিশ হলেই সর্ব্বনাশ, আমি মশাই একা ক'দিক সামলাই?

দাঁড়াইয়া শুনিলে যে, পরেশবাবু টিফিন খাওয়া ভুলিয়া সায়েবের আদ্যশ্রাদ্ধ হইতে সুরু করিয়া সপিণ্ডকরণ পর্য্যন্ত সারিবেন এ অভিজ্ঞতা কিছু কিছু ছিল, কাজেই ব্যস্ততার ভান করিয়া বলি—তাই তো, বিশেষ দরকার ছিল তাঁর সঙ্গে, বাড়ীতেই যেতে হচ্ছে তবে। কিন্তু ছুটিতে কেন বলুন তো, অসুখ বিসুখ নাকি?

—না মশাই অসুখ বিসুখ নয়, বছরে টু উইকস্ করে ছুটি পাওনা হয় আমাদের তা সে ভদ্রলোক যদি জন্মেও নেবেন? এরজন্যে আমরা কত সময় 'ইয়ে' করেছি ওঁকে, এবারে বেড়ালের ভাগ্যে সিকে ছিঁড়ে কি মন

হ'ল নিয়ে ফেললেন ছুটিটা। তা বাইরে কোথাও যান নি বোধ হয়, বাড়ীতেই পাবেন, যান।

কিন্তু বাড়ীতে পাইলাম না।

দুপুর রৌদ্রে—গলদঘর্ম্ম অবস্থায় মোটঘাট সমেত আমার এরকম নাটকীয় আবির্ভাবে যতটা না বিস্মিত হইলেন বৌদি, তার চতুর্গুণ হইলেন প্রবোধদার ছুটির খবরে।

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কহিলেন—কি যে বল সোমেন, কার অফিসে যেতে কার অফিসে উঠেছিলে হয় তো। ছুটি নেবেন তোমার দাদা? তা হলেই হয়েছে। যেমন চমৎকার অফিস—বৌ মরে গেলে ছুটি দেয় না ওরা।

কিন্তু আমি বা বিশ্বাস করিব কেন? প্রবল আপত্তি তুলি—আমায় কি পাগল পেলেন? প্রবোধদার অফিস ভুলে যাবো? সেদিনও এসেছিলাম আচ্ছা পরেশবাবুর নাম শুনেছেন?

—খুব। এক টেবলেই কাজ করে যে—

—তবে? ভদ্রলোক নিজে বললেন—প্রবোধদা দু'সপ্তাহ ছুটিতে রয়েছেন। তিনি একেবারে কাজ নিয়ে বেসামাল হয়ে যাচ্ছেন।

—নির্ঘাত ধাপ্পা দিয়েছে তোমায়, ভেতরে ঢোক নি তো?

ঢুকি নাই সত্য। কিন্তু পরেশবাবুর মত একজন সামান্য পরিচিত ব্যক্তি অসামান্য পরিহাস করিয়া বসিবেন কোন হিসাবে তাহারও কোন সদযুক্তি খুঁজিয়া পাই না।

বৌদিকে বোঝাইতেও পারি না—তিনি একইভাবে হাসিয়া বলেন—ছুটি যদি তো আছেন কোথায়? সত্যি তো আর পাগল নয় যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবেন? সেই তো পৌনে নটায় ভাত দুটো মুখে দিয়েই ছুটেছেন। ওই ছুটির জন্যে বলে—গত বছর সে কী মর্ম্মাতিক ব্যাপার—

—তার মানে?

বৌদি এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন এবার সিঁড়ির ধাপে বসিয়া পড়িয়া বলেন—তা হলে শোন বলি—একঘেয়ে সংসার করতে করতে তো ভাই পচে গেছি, কোথাও এক পা বেরোনো নেই, বাবা মারা গিয়ে পর্য্যন্ত বাপের বাড়ী যাওয়া ঘুচে গেছে—থেকে থেকে দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। মনে হয়

কোথাও গিয়ে একটু হাঁফ ফেলে আসি। ভেবে চিন্তে ধরলাম তোমার দাদাকে—চল একবার পুরী যাই, দু'জনে একলা। হাসছো যে, দু'জনে একলা হয় না? সত্যি, সংসারের ঝামেলা ঘাড়ে করেই যদি যাবো তো কলকাতা কি দোষ করলো? চব্বিশ ঘণ্টাই তো তোমার দাদার সঙ্গে চলেছে আজকাল—

বাধা দিয়া বলিলাম—ঝগড়া চলছে—আপনাদের? চোখে দেখলেও বিশ্বাস করবো না, বোধ করি সখের ঝগড়া!

—সখের? ওই আনন্দেই থাকো—রীতিমত দেনা পাওনার হিসেব নিকেশ, বুঝলে? যাক গে, শুনে আসছি বরাবর—সমুদ্রের হাওয়ায় যেমন ফুটো ফুসফুস রিপু হয়, তেমনি, ঝাঁঝরা প্রেম ঝালাই হয় তাই পুরীর বায়নাই নিলাম। এদিকে পাঁচজনের কাছে বলতে হয়—'জগন্নাথ টেনেছেন'—নইলে মান থাকে না। একলা বেড়াতে যাবো বললে তো ফাঁসির হুকুম?

…জগন্নাথও টেনেছেন—আমারও ট্রাঙ্ক স্যুটকেস সব গোছানো—ছেলেমানুষের মতন আহ্লাদে রাত্রে ঘুম নেই, দিনরাত সমুদ্রের স্বপ্ন দেখছি, হঠাৎ যাওয়ার আগের দিন ঘ্যাঁচ্ করে বলে বসলেন—ছুটি পাওয়া গেল না, বড়সাহেব রাঁচি না কোন চুলোয় যাচ্ছে। বোঝো ব্যাপার! মনে হ'ল গলায় দড়ি দিয়ে আফিঙ্ খাই। সেই মানুষ নাকি দু'সপ্তার ছুটি পেয়েছেন, হুঁ। তাও আবার আমি জানি না।

গল্প লেখার বাতিক আছে—যেখান সেখান হইতে প্লট জোগাড় করি, হঠাৎ মনে হইল—রহস্যের আবরণে ঢাকা যে প্রচ্ছন্ন বেদনার কাহিনীটুকু এইমাত্র শুনিলাম তাহাকে কেন্দ্র করিয়া এক করুণ ছন্দের গল্প লেখা যায়।

কিন্তু থাক গল্প, পরে লিখিলেও চলিবে—সোজাসুজি বোকা বনিয়া থাকা চলে না। বিচিত্র নয়– যে প্রবোধদা 'ঘর পর' উভয়কে লুকাইয়া নূতন কোথাও চাকরীর উমেদারী করিতেছেন, হঠাৎ একদিন পাঁচ-সাত শো টাকার পোষ্টে বসিয়া তাক লাগাইয়া দিবেন সকলকে।

সেই সন্দেহই ব্যক্ত করি।

বলাবাহুল্য বৌদি উক্ত আকাশ-কুসুমে লেশমাত্র আস্থা স্থাপন করিলেন না, উপরন্তু আমাকে ঘোলের সরবৎ খাইবার অনুরোধ করিলেন অর্থাৎ রোদে ঘুরিয়া মাথা গরম হইয়া যাওয়া নাকি অসম্ভব নয়, অগত্যা প্রতিকারার্থে ঘোল।

হাসিয়া প্রশ্ন করিলাম—কিন্তু অসময়ে পাবেন কোথায়?

মজুত রাখতে হয়, নইলে তোমাদের 'ঘাল' করবো কি করে? বলিয়া বৌদি বেশ সশব্দেই হাসিয়া ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গেই উপর হতে পিসিমার কণ্ঠস্বর বাজিয়া উঠিল—নিচে কে এসেছে বৌমা? কার যেন গলা পেলাম?

আমি কিছু বলিবার পুর্ব্বেই বৌদি ঠোঁটে আঙ্গুল ঠেকাইয়া নির্ব্বাক থাকিবার ইঙ্গিত করিলেন। অবাক হইবার মত কথা কিন্তু বেশী হই না, কারণ দীর্ঘদিন পরে দেখা হইলেও বৌদির পুর্ব্বকালের কৌতুকপ্রিয়তার কথা বিস্মৃত হই নাই।

মিনিটখানেক পরেই পিসিমার আরো অধীর স্বর শোনা যায়—বৌমা হঠাৎ চুপ করে গেলে যে? বলি, এই এতক্ষণ তো বেশ দিব্যি হাসাহাসি চলছিল।

ভাবিলাম এইবার বোধ হয় হাসিয়া ফেলিবেন বৌদি, কিন্তু ঘটনাটা ঘটিল অন্যরূপ, গলার সুরে কৌতুকের লেশমাত্র নাই, তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রায় ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—আপনি তো ঘুমোচ্ছিলেন—হাসাহাসি শুনলেন কখন?

ঘুমোচ্ছিলাম বই তো মরে থাকি নি বাছা? বেতো মানুষ পা নিয়ে নড়তে পারি নে, তাই সাপের পাঁচ পা দেখেছো বটে? ব্যাটাছেলের গলা আমি শুনেছি—

রহস্যের গতি যে এমন জঘন্য মোড় লইবে—এমন কল্পনা স্বপ্নেও করি নাই, অপ্রতিভভাবে উঠিতে চেষ্টা করি—কিন্তু উঠিতে পারি না। বৌদি আমাকে আরো অবাক করিয়া দিয়া গম্ভীরভাবে হাত ধরিয়া সিঁড়িতে বসাইয়া দিয়া বলিয়া ওঠেন—থাকো চুপ করে, দেখি কত চেঁচাতে পারেন।

—কিন্তু লাভ কি এতে ?

—লাভ আবার কি ? বরং লোকসান।

—তবে ?

—কিছু না। খুসী আমার, বাতের ব্যথায় নড়তে পারেন না তাই সর্ব্বদাই সন্দেহ ওঁর অসাক্ষাতে কখন কি করে ফেলছি। বাড়ীতে কেউ এলে দু'দণ্ড কথা কইবার জো নেই, অমনি ডাকাডাকি। ছিলই বাতিক, পঙ্গু হয়ে পর্য্যন্ত বেড়েছে। দুঃখের কথা বলবো কি—মেয়ে দুটো বড় হয়ে অবধি তাদেরও শান্তি নেই, যেন মেয়েমানুষ মাত্রেই খারাপ হ'বার জন্তে উদগ্রীব হয়ে আছে—যেন খারাপ হবার ইচ্ছে থাকলে কেউ কাউকে শাসনের জোরে আটকাতে পারে ?

ছেলেবেলায় পিসিমার কাছে আদর খাইয়াছি, আবদার করিয়াছি, স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তিখানিই স্মরণে ছিল, একই ব্যক্তি একের কাছে অমৃত ও অন্তের কাছে গরল হয় কেমন করিয়া কে জানে ?

—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মাথার দোষ ঘটে নাই তো ?

সন্দেহ প্রকাশ করিবামাত্র বৌদি যেভাবে অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্টাইলেন, সেটা কেবলমাত্র মেয়েমানুষের পক্ষেই সম্ভব।

নিতান্ত সাধারণ মেয়েমানুষ, যাহারা কথায় কথায় ছড়া কাটিতে পারে, অন্তের উপর আক্রোশ করিয়া ছেলে ঠ্যাঙায়, ঠ্যাঙ্ ছড়াইয়া বসিয়া এক কাঁসি সজিনাখাড়ার সঙ্গে পতিদেবতার মস্তকটী চর্ব্বণ করিতে দ্বিধা বোধ করে না, কিন্তু বৌদি কি এদের একজন মাত্র ?

কিন্তু এমন একটা সময় ছিল যখন এই বৌদিই ছিলেন প্রায় আমার আদর্শ। সেই সঙ্গীত বিভোর রবীন্দ্র পাগল তরুণীটী হারাইয়া গেল কোথায় ?

বিশবছর আগে পূর্ব্বরাগের চলন বেশী ছিল না—থাকিলেও স্কুলের ছাত্রীর উর্দ্ধে আর উঠিত না, কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে যে তাহারা পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশের চাইতে কিছু কম ওস্তাদ ছিল, এমন মনে করিবার হেতু নাই।

স্কুলের ছাত্রী হইয়াও বৌদি কেমন করিয়া টিফিনের সময় স্কুল পলাইয়া হেদোর মাঠে আসিয়া হাজির হইতেন, এবং প্রবোধদা কলেজে

প্রক্সি ঠেকাইয়া আসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা রৌদ্রদগ্ধ লোহার বেঞ্চে বসিয়া সেই অমূল্য সময়টুকুর প্রতীক্ষা করিতেন সে খবর আর কাহারও জানা না থাকিলেও আমার ছিল।

দশ বছরের ছোট বড় হইলেও কেমন করিয়া যে প্রবোধদার বন্ধুর পর্য্যায়ে পড়িয়া গিয়াছিলাম ঠিক বলিতে পারি না; হয় তো আমার অকালপক্কতা ও তাঁহার সরল সহৃদয়তার যোগফল।

মোট কথা, তাঁহাদের প্রেমে পড়ার আগাগোড়া ইতিহাস সঠিক বলিতে পারা আমার পক্ষে অসম্ভব নয়। এক রকম আমাকে সাক্ষী রাখিয়াই অগ্রসর হইতেন তাঁহারা—ইচ্ছা করিয়াই যেন একটু আড়াল রাখা, অবাধ স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছায় কিঞ্চিত খর্ব্ব করা।

প্রায়ই কোন ছুতায় আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেন—এবং বোধ করি নিতান্ত শিশুবোধে আমাকে জলছবি ও ডালমুট ঘুস দিয়া নিকটেই কোথাও বসাইয়া রাখিতেন।

বলা বাহুল্য প্রবোধদার ধারণা অনুযায়ী সরল শৈশবকাল তখন পার হইয়াছি—নিবিষ্টচিত্তে ডালমুট খাওয়ার ভাণে উৎকর্ণ হইয়া প্রেমালাপের সমস্ত অক্ষরগুলি কর্ণস্থ করিতাম, এবং অন্তরস্থ করিবার চেষ্টা করিতাম। কিছু কিছু যে না করিয়াছি এমন নয়।

বেশ মনে আছে, একদিন অভিমানের সুরে অনুযোগ করিয়াছিলেন বৌদি—সোমেনকে রোজ রোজ আনো কেন বলো তো? ভয় করো বুঝি? কেন, বাঘ না ভালুক আমি?

স্বভাবসিদ্ধ উচ্চহাস্যে উত্তর করিয়াছিলেন প্রবোধদা—ভয় তোমায় করি না নিরু, করি নিজেকে, আমিই না কোন সময় বাঘ ভালুক বনে যাই এই ভয়।

—ইস্ তবু যদি খোলা পার্ক না হ'ত।

—দুপুর রোদে খোলা পার্কেই বা ভরসা কি?

অস্বীকার করিব না, সেই বয়সে পক্ক কম ছিলাম না। একটা কিছু অনুমান করিয়া অন্যমনস্কের ছলে খানিকটা দূরে সরিয়া গেলাম, এবং আড়চোখে দেখিতে লাগিলাম খোলা পার্কের মর্য্যাদা থাকিল না গেল।

থাক সে সব কথা, তবে বিবাহের পর বৌদির অনুগত ভক্তদের

মধ্যে আমিই প্রধান। সজ্ঞানস্র নববধূর রহস্যঘন পারিপার্শ্বিকতাকে অতিক্রম করিয়া নিকটে পৌঁছিবার দুঃসাহস আর কার থাকিতে পারে আমি ভিন্ন?

যেন আমারই বিজয়লব্ধ ঐশ্বর্য্য, মনে মনে এমনি একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতাম, মুগ্ধ করিয়া দিত তাঁহার হাসি গল্প গান সেতার বাজানো কবিতা আবৃত্তি সব কিছুতে।

বয়সের তারতম্য না থাকিলে বোধ হয় সেই অন্ধআনুগতাকে প্রেমের পর্য্যায়ে ঠেলিয়া দিয়া লোকে অপবাদ দিয়া বসিত। নিতান্ত বালক বলিয়াই সে যাত্রা রেহাই পাইয়াছিলাম।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে আকর্ষণ কখন শিথিল হইয়াছে কে তাহার হিসাব রাখে? এখন সমস্ত দিন রাত্রি, সমস্ত চিন্তা কল্পনা, অতীত ভবিষ্যত সব গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে বেণু, পৃথিবীতে কখনো কোন প্রিয়জন ছিল সেটুকুও মনে পড়ে না।

অনেকদিন পরে দেখা হওয়ায় যে আনন্দটুকু বোধ করিতেছিলাম তাহার সুর কাটিয়া গেল। আরো বেসুরো লাগিতেছে পিসিমার ভাঙা গলার উচ্চ চীৎকার।

বোধ হয় নাতিনীদের উদ্দেশ করিয়াই বলিতেছেন—মেয়েগুলোও কি হয়েছে তেমনি বজ্জাত, অজ্ঞান হয়ে নাটক নভেল পড়ছে—বাড়ীতে কে এলো গেলো তার হিসেব নেই? ওরে শ্যামলি, অ-হারামজাদা মেয়ে বলি আছিস কোথায়? কাণের মাথা খেয়েছিস নাকি—দেখ্ না নীচেয় নেমে কে এসেছে?

শ্যামলি বোধ করি অজ্ঞান সমুদ্রের তলদেশ হইতে একবার মাথা তুলিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—কে আবার আসতে যাবে ঠাকুমা, তোমার দিনরাত্তির ওই এক বাতিক।

কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম কে জানে—দুই মিনিটও হইতে পারে দশ মিনিট হওয়াও বিচিত্র নয়।

এক সময় মাথা তুলিয়া প্রশ্ন করিলাম—বৌদি আপনার বয়স কত হ'ল?

—চৌত্রিশ, কেন ?

—এই সব সহ্য করেন এখনো ?

—কি করবো বলো, বাড়ী থেকে তো চলে যেতে পারি নে ?

—বিদ্রোহ করতেও তো পারেন ?

—ওরে বাবা ! কৃত্রিম বিস্ময়ে দুই চোখ কপালে তুলিয়া বৌদি গালে হাত দিলেন—বললে কি সোমেন ? স্বর্গাদপি গরীয়সী ? বরং নালু-টুলুর বৌ এলে এর শোধ নেব ! বলিয়া চমৎকার একটু হাসিলেন।

অথচ এমনই হয়, এই অবিশ্বাস্য রহস্যও সত্য হইয়া উঠে। সারা-জীবনের সঞ্চিত তিক্ততার গ্লানি সুদে আসলে উসুল হয় পরবর্ত্তীদের জীবনে।

এরপর পিসিমার সঙ্গে দেখা করিবার স্পৃহা না থাকিলেও কর্ত্তব্য বোধে করিতে হইল। ঘোলের সরবৎ ও সন্দেশ খাইলাম—বিবাহ সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় সকল পিসিমার গোচরীভূত করিলাম। অবশেষে সুটকেস ঘাড়ে করিয়াই ফিরিয়া আসিলাম।

থাকিবার ইচ্ছা অনেকক্ষণ লুপ্ত হইয়াছিল। দূর ছাই—বেণুদের বাড়ীই ভালো।

দুইদিন বাদে তো জামাই হইবই।

প্রবোধদার সংবাদটা সঠিক জানিতে আর একবার আসিলেই চলিবে, আপাততঃ দক্ষিণ কলিকাতার দিকে রওনা হই। আর্ল ষ্ট্রীটে বেণুদের বাড়ী, দশের-এ বাস হইতে রিচি রোডের মোড়ে নামিয়া ভাবিলাম 'ম্যাডক্স' পার্কের ভিতর দিয়া পথটুকু সংক্ষিপ্ত করিয়া লই, কিন্তু কে জানিত মূর্ত্তিমান বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল পার্কের মধ্যে।

গরমকালের চারটে আন্দাজ বেলা, চারিদিকে রৌদ্র খাঁ খাঁ করিতেছে, মাঠের এই রাক্ষসী মূর্ত্তি দেখিয়া অনুমান করা কঠিন ঘণ্টা-দুই পরেই এখানে শান্তির হাওয়া নামিবে, দলে দলে রঙীন প্রজাপতির মেলা বসিয়া যাইবে, জাতি ধর্ম্ম বর্ণের অপূর্ব্ব সমারোহে !

কিন্তু যা বলিতেছিলাম—

বিস্ময় বসিয়াছিল প্রবোধদার বেশ ধরিয়া।

মুখের সামনে ছাতা আড়াল করা থাকিলেও—সর্ব্বাঙ্গের পরিচিত ভঙ্গীটুকু যেন আমাকে কাছে টানিয়া আনিল।

প্রবোধদাই বটে—বিস্ময়ে প্রশ্ন করিতে ভুলিয়া যাই, কথা তিনিই আগে ক'ন। আড়চোখে একবার দেখিয়া লইয়া ছাতা সরাইয়া প্রশ্ন করেন—কিরে তুই হঠাৎ দুপুর রোদে এখানে? এলি কবে? যাচ্ছিশ কোথায়?

—সব বলছি আগে, তোমার খবর বলো।

—আমার? আমার আবার খবর কি? হাওয়া খাচ্ছি।

—হাওয়া খাচ্ছো? সময় ভালো—হাওয়া খাবার উপযুক্ত, কিন্তু এ রকম রহস্যময় হয়ে উঠলে কবে থেকে? অফিসে গিয়ে শুনলাম ছুটিতে আছো, অথচ—

বাধা দিয়া গম্ভীরভাবে বলেন—ছুটিই তো, নইলে পার্কে বসে আছি কি করে?

বেঞ্চের অপরার্দ্ধ দখল করিয়া কহিলাম—কিন্তু বাড়ীতে জানাও নি কেন?

—কে বললে জানাই নি? সন্দিগ্ধ প্রশ্ন করেন প্রবোধদা।

—বাড়ী গিয়ে শুনলাম, বৌদি তো—

—বাড়ী গিয়ে?

অকস্মাৎ ভূত দেখিয়া চমকাইয়া ওঠেন প্রবোধদা।

-বাড়ী গিয়েছিলি? ফাঁস করে এলি ছুটির কথা?

—বলব না কেন তাও তো বুঝছি না।

—বুঝবে কোথ্ থেকে? আকাশে পান্‌সি ভাসিয়ে প্রেমের পাল-তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছো—বুঝবে কি করে কত ধানে কত চাল। সর্ব্বনাশ করে এলি একেবারে—মামলায় হারিয়া আসার মত হতাশায় ভাঙিয়া পড়েন প্রবোধদা।

সান্ত্বনা দিব, না অপরাধ স্বীকার করিব, সেটাও বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। ফোঁস্ করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলেন—বাড়ী ফেরবার আর পথ রাখলি না আমার, মিলিটারী লরী চাপা পড়ে

আর ফিরতে না হলে বেশ হয়। উঃ কত কষ্টে যে এই বারোটা দিন আত্মগোপন করে আছি—চেনা পাড়া দিয়ে হাঁটি না, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয়ে ছাতা আড়াল করে সরে যাই, একপথে দু'দিন বেড়াই না, পাছে বলে দেয়, আর অক্লেশে আমার মাথাটা খেয়ে এলি? অদৃষ্ট! অদৃষ্ট!

এতদিন পরে দেখা—কুশলপ্রশ্নের পরিবর্ত্তে আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকেন প্রবোধদা।

কিন্তু এই দীর্ঘ বিলাপোক্তির মধ্য হইতেও আত্মগোপনের মূল তথ্য আবিষ্কার করিতে পারি না। অনুমানের উপর আস্থা হারাইয়া সোজাসুজি প্রশ্নই করিতে হয়।

বিস্তর সাধ্য সাধনায় মুখ খুলিল।

পকেট হইতে একমুঠা ঝালছোলা বাহির করিয়া আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া গম্ভীর সুরে কহিলেন—নে খা। নিজেও একগাল চিবাইতে চিবাইতে অন্যমনা সুরে বলেন—ছুটির কথা লুকোচ্ছি কি আর সাধ করে? অনেক দুঃখে, জানালে কি আর রক্ষে ছিল রে? ওৎ পেতে বসে থাকে, বুঝলি? পরের চাকরী করি কথাটি কইতে পায় না—ছুটির গন্ধ পেলে বাঘের মতন হালুম করে পড়ে। রবিবার দিয়ে দেখেছি তো? রাজ্যের কাজ তুলে রেখে দেয় ওই একটি দিনের জন্যে।

হাসিয়া প্রশ্ন করি—এত কিসের কাজ?

—কিসের? কিসের নয়? ঝাঁজিয়া উঠিয়া মেয়েলী ভঙ্গীতে আঙুলের পর্ব্ব গুনিতে থাকেন—ছুটি পেয়েছো, এ মেয়ের পাত্তর খোঁজো, ও মেয়ের তত্ত্ব পাঠাও, বুড়ো শ্বশুরের খবর আনো, রুগ্ন শ্যালীকে দেখে এসো—কত বায়নাক্কা। তা ছাড়া, সেলাই কল ভেঙে আছে, পায়খানার ট্যাঙ্কে জল নেই, রান্নাঘরের ছাদ ফুটো, কাপড়ের অভাবে লজ্জা বাঁচছে না, ঝি পালিয়েছে, ধোপা আসে না, তেল নেই, কয়লা নেই—বলে কি না কিসের কাজ! হুঁ। এর ওপরে আবার মা জননীর দেশের বাড়ী নিয়ে ঘ্যানঘ্যানানি লেগেই আছে। সম্পত্তির মধ্যে একখানা ভাঙা দালান, আর, একটা বুড়ো ডুমুর গাছ, তাই জ্ঞাতিরা ভোগ করছে বুক ফেটে যাচ্ছে। এতদিন ছুটী দেখলে অতিষ্ঠ করে ছাড়তেন, বুঝেছিস? দেখলে

না দেখলে না'—আরে বাবু চাকরী বাকরী ছেড়ে দিয়ে দেশের ডুমুর গাছ পাহার দিলেই কি খুব শান্তি হ'ত তোমার ?

যেন আমিই প্রতিপক্ষ।

হাত মুখ নাড়ার ভঙ্গী দেখিয়া হাসি চাপা দায় হয়।

তবে হাসি দেখিয়া রাগ করেন না, উদার ভাবে বলেন—হেসে নে, যে ক'দিন পারিস।

বলিলাম ঝঞ্চাট এড়িয়ে আরামটাই বা কি ভোগ করছো ? এই রোদে টো টো করে—

দাদা ক্রুদ্ধস্বরে বলেন—রোদে টো টো করবো না তো বালিগঞ্জের পাড়ায় কে আমার সুইটহার্ট বসে আছে, যে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বরফজল খাওয়াবে শুনি ? আরাম না থাক স্বস্তি আছে বাবা। নটা বাজলেই দিব্যি কেটে পড়ি, যতক্ষণ খুসি ঘুরে বেড়াই, যেখানে খুসি বসে থাকি, খিদে পেলে ছোলাভাজা কিনি, তেষ্টা পেলে সোডা খাই, ছ'টা বাজবার আগে বাড়ীর দিকে পা বাড়াই না। কলকাতার রাস্তাগুলো ভুলে গিয়েছিলাম রে, আবার সব মুখস্থ করলাম। বেশ লাগে গরমের দুপুরে রোদ্দুরে ঘুরে বেড়াতে।

বেশ লাগার নজীরটা ভালো।

কিন্তু বৌদির কথা ভাবিয়া দুঃখিত হই। আহা বেচারার সমুদ্রের স্বপ্ন সফল হইলেও হইতে পারিত।

আচমকা প্রশ্ন করিয়া বসি—তার চেয়ে বৌদিকে নিয়ে বাইরে কোথাও ঘুরে এলে পারতে ? ধর পুরী—

—পাগলের মতন কথা বলিস নে সোম, বৌদিকে নিয়ে পুরী, যেন সায়েব বিবি ? আরে বাবু বুড়ো মাকে একটু তীর্থ করাতে পারি নে, নিজেরা বেড়াতে যাবো কোন লজ্জায় ? এই তো আর বছরেই - ঝোঁকের মাথায় একবার বলে বসেছিলাম, ব্যস্ তোড়জোড় দেখে কে ? 'এটা চাই ওটা চাই' ইয়া লম্বা এক ফর্দ্দ, যেন হনিমুনে যাচ্ছি। এদিকে মার মুখ ভার— আর সত্যিই তো বুড়ো বয়সে তাঁর ঘাড়ে সংসার চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা হাওয়া খেতে যাওয়াটা কি ন্যায্য ? আমিও আজকাল চালাক হয়েছি—

ছুটি ক্যানসেল করে দিয়ে বললাম—পেলাম না, বড়সায়েব রাঁচি গেছে —বাবা সাপও মরলো লাঠিও বাঁচলো।

অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকি—সত্যই কি এটা খাঁটি মনের কথা? না যাহা দেখিতে শুনিতে ভালো—তাহার ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করিয়া নিজের 'ভালোত্ব'টা জাহির করিবার কষ্টকর প্রচেষ্টা মাত্র?

যাহারা প্রতিনিয়ত নিজেকে নিজে বঞ্চনা করিয়া চলে, তাহারা বঞ্চিত জীবনের সমস্ত গ্লানির দায় পরস্পরের ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হয় কোন হিসাবে?

ফেরারী আসামীর মত হাস্যকর ভাবে নিজেকে তাড়াইয়া বেড়ানোর চাইতে অবসর উপভোগ করিবার আর কোন ভালো পথ এরা খুঁজিয়া পায় না কেন? স্বল্পাবসর জীবনের বিরল কয়েকটি মুহূর্ত্ত রঙিন করিয়া তুলিবার ক্ষমতা কি ইহাদের সত্যই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে?

প্রবোধদা আমার মুখের দিকে একবার তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন – অমন মনমরা হয়ে গেলি যে? ভাবছিস তোর বৌদি খুব দুঃখিত হ'ল? দুঃখিত হওয়া তার কুষ্ঠীতে লেখে নি বুঝলি? আগুন আগুন, দিনরাত টগবগ্ করে ফুটছে। কখন কি মেজাজ বোঝা ভার। এই তো সেদিন বেশ ভালো মনে বললে—চল 'উদয়ের পথে' দেখে আসি, আমিও রাজী হয়েছি—মানে অফিসের সবাই ধন্যি ধন্যি করছিল বইটাকে, ভাবলাম দেখি ব্যাপারটা—তা সে, যেই বলেছি—মেয়ে দুটোও চলুক, আবদার নিচ্ছে ব্যস্ অমনি বলে বসলো—যাবো না! বোঝো কথা? আসলে এই মেয়েমানুষ জাতটাই অতি হিংসুটে, বুঝলি সোমেন?

কি বুঝলাম কে জানে, বোধ হয় মেয়েমানুষ জাতটার ভয়াবহ হিংস্রতার কথাই চিন্তা করিতেছিলাম—

হঠাৎ ফোঁস্ করিয়া একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া প্রবোধদা বলিয়া ওঠেন—ও আমাকে সুদ্ধ্ হিংসে করে জানিস? বিশ্বাস করতে পারিস? বলে কিনা—আমি নাকি আফিসের কাজের ছুতোয় দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াই—আমার নাকি বয়েস ছাড়া কাঁচা চেহারা—আর উনি হরদম সংসার করে করে বয়েস ছাড়া বুড়িয়ে যাচ্ছেন—বোঝো? আরে বাপু দিনরাত মনের ভেতর আগুন জ্বালালে আর শুকিয়ে যায় না মানুষ?

যাইতে পারে—যাওয়াই সম্ভব, কিন্তু জলের পরিবর্ত্তে অবিরত ইন্ধন পড়িলেই বা মানুষ করে কি? সে আগুন কে ঠেকাইয়া রাখিবে কোন শুভবুদ্ধির জোরে?

পার্কে লোক আসিতে সুরু করিয়াছে। সামনে দিয়া দুইটা ছেলে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। দুই-একটি বড়লোকের বাড়ীর ঝি, রঙিন জামা পরা কাঁচের পুতুলের মত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লইয়া মদগর্ব্বে ধরার দিকে সরার ন্যায় অবজ্ঞার দৃষ্টি হানিয়া ছায়াচ্ছন্ন জমি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। হঠাৎ যেন প্রবোধদার হুঁস্ হয়, পকেট উল্টাইয়া ধুলা ও খোসা সমেত বাকী ছোলাভাজাগুলা হাতে ঢালিয়া ফু দিতে দিতে বলেন—নিজের কথাই সাত কাহন, তোর খবর বল। তোর বেণুর খবর বল।

কেমন যেন শ্রান্ত লাগিতেছিল, উঠিবার উদ্যোগ করিয়া বলি—শুনো পরে, যাবো কাল-পর্শু। হ্যাঁ ভালো কথা, ও ছুটির কথাটা তুমি চেপেই যেও বাড়ীতে, হেসে উড়িয়ে দিও, বোলো—ঠাট্টা করে গেছে সোমেন।

—পাগল! আর এখন বিশ্বাস করলে তো?

বলিলাম ঠিক করবেন, মজা এই—বিশ্বাসটা এখনো ঘোচে নি, ওটা গেলে দাঁড়াবার আর ঠাঁই থাকবে না বলেই বোধ হয় প্রাণপণে আঁকড়ে আছেন, বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াই।

—এটা কি হ'ল?

—কিছু না, এমনি—আচ্ছা চলি—বলিয়া দাদার সবিস্ময় প্রশ্নকে এড়াইয়া চলিতে সুরু করি।

—আমিও উঠি এবার—চল একসঙ্গেই যাই।

ছাড়াছাড়ি হইবার মুখে সহসা প্রশ্ন করিলাম—কলেজ পালিয়ে দুপুর রোদে হেদোর ধারে বসে থাকার কথা মনে পড়ে প্রবোধদা?

প্রবোধদা যেন আচমকা হোঁচট খাইলেন, চকিত দৃষ্টিতে একবার আমার মুখের পানে চাহিয়া কি বলিতে গিয়া থামিলেন। আর দুই পা আগাইয়া গিয়া গম্ভীর ভাবে কহিলেন—পড়বে না কেন, পড়ে—তোরই কি একদিন মনে পড়বে না—দুপুর রোদে ভবানীপুরের রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো?

ইমারত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শিব প্রতিষ্ঠা করছেন শ্যামাদাস বাবু। লোকের কাছে পরম বিস্ময়ের কথা। কৃপণ লোক; কার্পণ্যের তপস্যায় তাঁর পিতামাতাও নাকি মুদ্রাত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। লোকে বলে এক এক পয়সা মা-বাপ শ্যামাদাস বাবুর। তাঁর টাকাও গল্পের টাকা। গল্পের বস্তু অল্প হয় না—কেউ বলে লাখ—কেউ বলে দু' লাখ—কেউ বলে লোকটা যত বড়—টাকার স্তূপটিও তত বড়। তাঁর সিন্দুকের সর্বশেষ স্তরের যে টাকাগুলি সেগুলি ওজনে ঠিক থাকলেও আকারে ঠিক নাই, উপরের টাকার রাশির ভারের চাপে চেপ্টে বড় হয়ে গিয়েছে এবং চেহারাতেও কালো হয়ে গিয়েছে, ছাতা ধরেছে। অনেকে বলে—সেগুলি অচল; কেন না সরকার নোটিশ দিয়ে ঘোষণা করেছেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রথম আমলের টাকা—যেগুলিতে মুকুটহীন রাণীর মূর্তি মুদ্রিত—সেগুলি অচলিত হয়ে গেল। একটি সময়ও তাঁরা দিয়েছিলেন, এই টাকা স্থানীয় রাজকোষে দিয়ে তার পরিবর্তে নতুন টাকা বদল নেবার জন্য। কিন্তু শ্যামাদাস বাবুর স্বভাবই অন্য রকমের, সিন্দুকে যা তিনি রাখেন তা আর বা'র করেন না। লোকে বলে—শ্যামাদাস বাবুর ধারণা—বা'র করলেই বাইরের বাতাসে সে উড়ে যাবে। শ্যামাদাসের তৃপ্তি—সঞ্চয়ের তৃপ্তি—সেখানে অচল হ'লেও ক্ষতি নাই—যেহেতু না চলবার প্রশ্নই নাই সেখানে। সেই লোক শিব প্রতিষ্ঠা করবে এতে লোকের বিস্মিত হবারই কথা।

বিস্ময়ের প্রধান কারণ এবং মূল রসটা আকস্মিকতার মধ্যেই নিহিত থাকে। এবং তার বৈচিত্র্য ও মহার্ঘতা অল্পক্ষণ স্থায়িত্বের মধ্যেই আবদ্ধ—ফ্রেমে ঘেরা ছবির মত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তারও ব্যতিক্রম হ'ল।

মন্দিরের উপকরণ যখন এল তখন পাকা ইঁট দেখে লোকের মনে হ'ল—তাদের কল্পনাকে এটা ছাড়িয়ে গেল। বললে—ইঁট পাকা হ'লেও কাদা দিয়ে গাঁথবে।

কয়েক দিন পর দেখা গেল—চুণ এসেছে, মজুরে সুরকী ভাঙছে। লোকে থমকে দাঁড়াল। গাঁথনী পাকাই হবে তা হ'লে! ছোটখাটো পাকা মন্দির একটি।

বিস্ময় আবার একদফা উৎপাদিত হ'ল—জনাব সেখ রাজ-মিস্ত্রীকে দেখে। এ অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ পাকা কারিকর। এবং তার হাতে কাজ কম খরচে হয় না।

মাঝখানে চেরা সিঁথিটি তার ওলংয়ের সুতোয় পাকানো সরু দড়িটির মত সাদা এবং সোজা, বাবরী কাটা সাদা চুলগুলি পরিপাটি ক'রে আঁচড়ানো কর্ণি দিয়ে মাজা পঙ্কের পলেস্তারার মত চকচক করছে। ঘাড়ের চুলগুলির প্রান্তভাগ সযত্নে কেটে নিচে থেকে ঘাড়টা কামিয়ে ফেলেছে, গোল থামের মাথায় বেড় দেওয়া কার্নিশের বিটের মত—সব চেয়ে পাতলা কর্ণি দিয়ে দড়ি ধরে কাটা হয়েছে যেন। গোঁফ এবং গাল কামিয়ে চিবুকের নিচে নূর দাড়াটিও ঠিক এমনি সযত্নে কাটা। ধপধপে পরিচ্ছন্ন দাঁতগুলির ফাঁকে কালো মিশির দাগ—পয়েন্টিং করা আলসের মত। চকচকে ছোট একটি হুঁকোতে ইঞ্চি চারেক লম্বা একটি বাঁশের নল লাগিয়ে, ভাল তামাকের মিষ্টি গন্ধে চারিদিকে বেশ একটা নেশার আমেজ ছড়িয়ে জনাব তামাক টানছে আর দীর্ঘ হাতখানির সরু আঙুল দেখিয়ে নির্দেশ দিয়ে কাজ করাচ্ছে। গলায় দু'হালি কালো কারে বেড় দিয়ে বাঁধা একটি পাকা সোনার চৌকা তক্তি। গায়ে চেক-কাটা পরিচ্ছন্ন ফতুয়া, কাঁধে বাহারে রঙের ডোরাকাটা, সযত্নে পাট করা একখানি গামছা। পরণে ময়ূরকণ্ঠি রঙের লুঙ্গি। পায়ের চটি জোড়াটা এককালে সৌখীন ছিল—কিন্তু এখন পুরানো হয়েছে।

ইঁটের থাক দেওয়া হচ্ছে। মজুরেরা ইঁটের উপর ইঁট সাজিয়ে থাকবন্দী করে রাখছে; যাতে ইঁট তুলতে সুবিধে হয়, বরবাদ না যায়, এমন কি দু'খানা ইঁট সরালেই ধরা যায়।

জনাব বলছিল—ই ক'রে রাখ বাপ, হুঁস ক'রে—হুঁস ক'রে রাখ। সুঁ-জু—সমা-ন ক'রে একটির উপর একটি রেখে যা বাপ। গাঁথনী করা ইমারতের নতুন বাহার দিবে। বেটাল হয়ে টলে পড়ে যাবে না।—এই দেখ। সর। দেখে লে।

সে তাকে সরিয়ে নিজেই ইঁটের উপর ইঁট সাজিয়ে রাখতে লাগল—নিপুণ হাতে—অবলীলাক্রমে।—হাঁ। হুঁস আর হিস্রাব। আর কাম করবার সময় মনে মনে বলিস না—বাবা রে! মন যখুন বলবে—বাবারে, তখুন একবার তামুক খেয়ে লিবি। লে টেনে লে একটান—। খুসবই ওয়ালা তামাক।—কাঁধের গামছাখানি দিয়ে হাত দু'খানি থেকে ইটের ধূলো ঝেড়ে নিয়ে কল্কেটি সে মজুরটির হাতে দিলে।

বিস্মিত রামপ্রসাদ জনাবের পিছনের দিকে থমকে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। এবার জনাব এ দিকে ফিরতেই প্রশ্ন করলে—তুমি এখানে জনাব? ব্যাপার কি বল তো?

কপালে হাত ঠেকিয়ে অভিবাদন করলে জনাব—সেলাম গো বাবু। শ্যামাদাস বাবুজীর মন্দিল হবে। আমি গাঁথছি।

—তা তো দেখছি। কিন্তু শ্যামাদাস বাবুকে তুমি মেরে ফেলবে নাকি?

জনাব একটু হাসলে। বললে— আজ্ঞে না, অল্প খরচে সেরে দিব—সে বুলেছি আমি বাবুকে।

—তোমার হাতে অল্প খরচে হবে তো?

জনাব হা-হা ক'রে হেসে উঠল। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলে উঠল—আঃ হায়—হায়—হায় গো। বলি—উ-কি ইটা ভাঙচিস গো তু? এঁ্যা! নোড়ার মতুন—মোটো—মোটো! এঁ্যা!

সে এগিয়ে গেল লম্বা পা ফেলে।

এদিকে এক জায়গায় জমায়েৎ হয়ে বসে বেশ যেন মজলিস করার ভঙ্গিতে মজুরনীর দল ছোট হাতুড়ি দিয়ে ইঁট ভেঙে খোয়া তৈরী করছিল।

বাছাই করা মজুরনী সব জনাবের। জনাবের নিজের মজুরীও বেশী, ওর মজুরনীদের মজুরীও চড়া। পরিচ্ছন্ন কাপড় আট ক'রে বেড় দিয়ে শেষ উদ্বৃত্ত অংশটুকু কোমরে ফেরতা দিয়ে জড়িয়ে পরেছে, হাতে এক হাত ক'রে কাচের চুড়ি, স্বাস্থ্যবতী তরুণী নিয়ে জনাবের মজুরনীর দল। আরও একটা বিশেষত্ব আছে, সাধারণে না জানলেও মজুরনীরা জানে, তরুণী হ'লেও যদি কেউ বেঁটে আর মোটা হয় তবে তাকে তারাই বারণ ক'রে দেয়—তু বুন যাস না। লেবে না। বুড়ো বলে—ঢ্যাপসা মেয়ে কাম করতে পারে না। লড়ে বসতেই উদের ছ মাস। তরুণী

মেয়েদের মধ্যে আবার যাদের চোখ ডাগর, চুল বেশী—তারাই থাকে জনাবের পাশে; জনাবের হাতে ইট জুগিয়ে দেয়, মসলা ঢেলে দেয় গাঁথনীর উপর, ওলং এগিয়ে দেয়, জলের মগ-পাটা দেয় হাতে হাতে, রাজ-মিস্ত্রীর হুকো কল্কে তামাক টিকে রাখে সযত্নে, বরাত মত সেজে দেয়। মধ্যে মধ্যে জনাব ভরা দুপুরের রোদের সময় বলে—লাতবউ একটা গায়েন কর না ভাই! বেশ মিহি গলায়। তু গাইবি—আমি আর লাতিন শুনব। হ্যাঁ।

মিহি কাজের সময় মধ্যে মধ্যে কাজ বন্ধ ক'রে ঘাড়টা একটু পিছনের দিকে হেলিয়ে দেখতে দেখতে বলে—দেখ তো ভাই লাতনী লাতবউ তুদের ডাগর চোখে, দেখতো এক লজর। বল দেখিনি কুথা কি খারাপ লাগছে?

অন্য মজুরনীরা সব দিদি। বড়দিদি, মেজদিদি থেকে ছোটদিদি পর্য্যন্ত। ১৩/৪৭৪

আগেকার কালে যারা পাশে থাকত তাদের কেউ ছিল ঠাকুর ঝি, কেউ ছিল ভাবী। দু'চারজনকে বউ বলেও ডাকত। তাদের দু'জন প্রৌঢ়া এখনও আছে জনাবের দলে। তারা সর্দারনী। দেখাশুনা করে মজুরনীদের কাজ। নিজেরাও করে টুকিটাকি এটা ওটা। এরাই আড়কাটির মত সংগ্রহ ক'রে আনে নতুন মজুরনী। আনলে জনাব খুসী হয়; সংগ্রহকারিনী প্রৌঢ়া দিন কয়েকের জন্য জনাবের কাছে পুরানো কালের সমাদরের খানিকটা যেন ফিরে পায়।

জনাব এগিয়ে গেল মজুরনীদের খোয়া ভাঙার জায়গায়। নতুন একটি মজুরনী খোয়া ভাঙছে—খোয়াগুলি ঠিক ভাঙা হচ্ছে না, অনভ্যস্ত হাতের হাতুড়ির আঘাতে কতক হচ্ছে বড় বড়, বাকী খানিকটা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে, কতক হচ্ছে নেহাৎ ছোট যা দিয়ে কোন কাজ হবে না।

জনাব তার হাত থেকে হাতুড়ি নিয়ে ভাঙার কৌশলটা দেখিয়ে দিলে—এই দেখ—এই দেখ, চোখ দুটি তো বড় বড়, লজর করে দেখ। বেশী মোটাও হবে না—বিচি বিচি ছুটুও হবে না; বেশী জোরে হাতুড়ি মারবি না, আবার আস্তে ঠুকুস ঠুকুস ক'রে মারলেও হবে না। এক তালে ঘা; হ্যাঁ—এই দেখ—এই দেখ!

শ্যামাদাসবাবু এসে দাঁড়ালেন। খাটো মানুষটি, গৌরবর্ণ রঙ, পাকা চুল, চঞ্চল প্রকৃতি ছেলের মত অস্থির লোক। বারকয়েক এদিক থেকে ওদিক ঘুরে বেড়ালেন, তারপর এসে দাঁড়ালেন মজুরনীদের খোয়া ভাঙার জায়গায়—জনাবের কাছে। দাঁড়িয়েও তিনি স্থির থাকতে পারেন না—অনবরত দোলেন। হাতের আঙুলগুলি অহরহ সক্রিয়, অঙ্গুষ্ঠের নখ দিয়ে মধ্যমার নখটা অবিরাম খুঁটে চলেছেন। লোকে বলে টাকা বাজিয়ে ঐ অভ্যাসটা হয়েছে তাঁর। শ্যামাদাসবাবু বললেন—জনাব! একে বলে—এই ছুঁড়িগুলোকে লাগালে কেন হে?

জনাব হাসলে, বললে—জোয়ানী বয়েস না হ'লে কাজ হবে কেনে হুজুর? খাটাবে কে? তা ছাড়া পাতলা হাত ওদের এখুন—হাল্কা। পা—হাল্কা শরীল, হাঁটবে বন বন ক'রে, ভারায় উঠবে থর থর ক'রে।

শ্যামাদাস বললেন—না—না—না, হারামজাদীরা ভারী পাজী। ক্রমাগত ফ্যাক ফ্যাক ক'রে হাসবে। মজুরগুলো কাজ করবে না ফষ্টি করবে। ভাগাও—ওগুলোকে তাড়িয়ে দাও।

জনাব বললে—আপুনি যান ইখান থেকে হুজুর। আমি রইলাম—আপনার কাম রইল। বরবাদ হয় আমাকে ফজিয়ৎ করবেন। আমি জবাবদিহি করব।

একটু চুপ ক'রে থেকে শ্যামাদাস বললেন—এই মাঝারী একটি মন্দির হবে। বেশী ছোটও না হয়, বেশী বড়ও না হয়। বুঝেছ তো? আবারও একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি বললেন—লোকে বলছে, তুমি লাগলে আর থাম না।

জনাব হাসলে; বললে—ইমারত আপনার, আমার লয়—আমার বাবার লয়। আপুনি যেমন হুকুম করবেন তেমনি হবে। পাঁচ হাত বলেন পাঁচ হাত; দশ হাত বলেন দশ হাত। আবার বুলেন একশো হাত দেড়শো ফুট তাই হবে। তবে একটা হিসাব তো আছে। যেমন ভিত করবেন তেমনি মন্দির হবে। আবার মাঝখানে বুলেন থেমে যাও জনাব, তাই হবে। কর্ণি পাটা নিয়ে চলে যাব বাড়ী।

শ্যামাদাস উত্তর খুঁজে পেলেন না এর। নিরুত্তর হয়ে চঞ্চলভাবেই চলে গেলেন সেখান থেকে।

মন্দির উঠছে।

লোকে যেতে যেতে দেখে পথে দাঁড়ায় সবিস্ময়ে। মন্দির তো ছোট হবে না!

ভারা বাঁধা হয়েছে। একখানা বাঁশের দৈর্ঘ্য ছাড়িয়েছে—প্রথম বাঁশের মাথায় আবার নতুন বাঁশ বাঁধা হয়েছে, তারও দুটো থাক ছাড়িয়ে তৃতীয় থাকে তক্তা পেতে জনাব কাজ ক'রে যাচ্ছে। পাশে দুটি তরুণী,—কাহারদের বউ মতিবালা, আর হাড়িদের মেয়ে দাসী। জনাবের বিপরীত দিকে আর একটা ভারায় দু'জন রাজ কাজ করছে—আব্দুল আর রসিদ।

শ্যামাদাসবাবু নিচে এসে কখন দাঁড়িয়েছেন। লোকের কথাই সত্য। জনাব সহজে থামবে না। এখনও চারখানা দেওয়াল সোজা উঠে যাচ্ছে। কাটান দিয়ে এখনও একখানা ইঁটও গাঁথা হয় নাই। সুতরাং কত উঁচুতে যে মন্দিরের চূড়া গিয়ে ঠেকবে সে বুঝতে পারা যাচ্ছে না। তার উপর কাজ অগ্রসর হচ্ছে যেন শামুক চলছে। জনাবকে দোষ দেওয়া যায় না, সে কাজ ক'রে যায় ঠিক, কিন্তু ওই যে দুটো রাজ-মিস্ত্রী ওরা ক্রমাগত বিড়ি খাচ্ছে। বিশেষ ক'রে সবচেয়ে অল্পবয়সীটা। শুধু বিড়ি খাওয়াই নয়—অল্পবয়সী মজুরনীগুলোর সঙ্গে হাসাহাসির আর বিরাম নাই। তিনি ডাকলেন—জনাব!

জনাব নিচে তাকিয়ে বললে—আজ কাটান দিব হুজুর।

—তা বেশ। কিন্তু একে বলে—ঐ ছোকরা রাজ-মিস্ত্রীটাকে কাজ করতে বল।

জনাব ছোকরার দিকে দৃষ্টি ফেরালে। জনাবের মনে আছে আজ ও কোনখান থেকে ইঁট গাঁথতে সুরু করেছে। কত ফুট গেঁথেছে সে-ও সে মাপ না ক'রে একবার নজর দিলেই বুঝতে পারে। তার ভুরু কুঁচকে উঠল। সত্যই ছোকরার কাজ মোটে এগোয় নাই।

সে বললে—কি রে? তুকি ভেবেছিস বুলত? মতলব কি রে তুর?

ছোকরা ব্যস্তভাবে কাজ করতে আরম্ভ করলে—কোন উত্তর দিলে না।

জনাব বললে দেখ, একটি বাত তুকে বুলি শুনে রাখ। এই টাকা বড় খারাপ চিজ। চাঁদি লয় পারা। পারাকে পুড়ায়ে ভসম লিয়ে খা - সি তখুন ওষুদ। কাঁচা খা—গায়ে ফুটে নিকলে যাবে।

একখানা ইট হাতে নিয়ে তার উপর কর্ণির ঘা দিতে দিতে আবার বললে—পরের ষোল আনি টাকা, যখুন ষোল আনি কাম ক'রে লিবি, তখুন সি হ'ল পারা ভসম্ (ভস্ম)। তাতে যা খাবি সে দিবে তুকে তাগদ। আর ফাঁকি দিয়ে লিবি—তো সি টাকা লয়, সি পারা। তাতে যা খাবি—সে হবে বদহজমী।

রাগ হ'লে জনাবের হাতের কাজের গতি বেড়ে যায়। বাঁ হাত বাড়িয়ে সে বললে—ইঁট লাত বউ! হাঁ। মসলা—জল। লাতিন। আচ্ছা—বাস করো।

খং—খং—খং—খং, ইঁটার উপর কর্ণির আঘাত কামারশালায় লোহার উপর হাতুড়ির আঘাতের শব্দের মত বাজতে লাগল।

জনাব বললে শ্যামাদাসবাবুকে—আপুনি যান বাবু। আজ থেকে আমি ফিতা মেপে হিসাব ক'রে কাম লিব। এই—এই রসিদ! এই হারামজাদী 'শুষনি'! এই!

জনাবের হাঁকে ডাকে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল, সচকিত হয়ে উঠল সকলে। চালাও চালাও। কাম চালাও। হাঁ।

খস খস শব্দে কর্ণি চলতে লাগল জল-সপ-সপে চুন-সুরকী-মেশানো মসলার উপর। গাঁথনির ইঁটের গায়ে পাটা বসিয়ে তার গায়ে হাতুড়ির আঘাত পড়তে লাগল—ঠক—ঠক—ঠক—ঠক!

জনাব আবার কিছুক্ষণের মধ্যে খুসী হয়ে উঠল। হ্যাঁ। এই ত! তারপর সে কাহারদের বউ মতিবালাকে বললে—লে তো ভাই লাতবউ, দুপুরের আমেজে ধরতো একখানা মিহি গলায়। ধরতো! লাতিন তু ভাই একবার তামুক সাজবি।

মতির বড় বড় চোখ—মাথায় একরাশ রুক্ষ চুলে মস্ত বড় খোপা। জনাবের ভারী প্রিয় সে। এরই মধ্যে জনাব তার লজ্জার সঙ্কোচকে অনেকখানি সহজ ক'রে এনেছে। গান গাইতে বললে সে আর সলজ্জভাবে মুখ নামিয়ে মৃদু হেসে নিরুত্তরভাবে ঘাড় নেড়ে অস্বীকৃতি জানায় না। দিব্য গান গেয়ে যায়। এদের লজ্জা সঙ্কোচকে জয় করবার শক্তি এবং দক্ষতা জনাবের অদ্ভুত।

দাসী তামাক সাজতে বসল—মতি মৃদুস্বরে গান ধরলে—

"বাবুদের চি-লে কো-ঠার ছাদে
চিল কাঁদিছে গো ভরা দুপুরে—
চিলি পালায় কোথা বাসা
বেঁধেছে কোন তালপুকুরে।"

জনাব বললে—উঃ কতকালকার গান! ছেরকাল রেজেরা গায়।

দাসী হুঁকো কল্কে এগিয়ে দিলে। জনাব কল্কে খসিয়ে মতির হাতে দিয়ে বললে—লে পেসাদ করে দে ভাই। তু খেয়েছিস তো ভাই লাতিন? তারপর আবার বললে—দে উয়াদিকে এক ছিলম ভাল তামাক দে। লে রে ভাই—খা, খুসবয়ওয়ালা তামুক এক টান খেয়ে—লে জমিয়ে কাম কর।

আবার বললে, সান্ত্বনার সুরে দেখ তুদের ভালর তরেই বুলি। ষোল বছর বয়সে বাবা কর্ণি হাতে দিয়েছিল, আর ওই কথাটি বুলেছিল আমাকে। বুলেছিল—বাপ্ এই কথাটি মনে রাখিয়ো; আগে ষোল আনি কাম দিবে তার বাদে ষোল আনি টাকাটি লিবে।

কর্ণির আঘাতে একখানা ইঁট ভেঙ্গে আধখানা নিচে পড়ে গেল। জনাব একবার দেখে নিলে নিচেটা। তারপর বললে—জোয়ানী কাল হ'ল খাটবার আর কাম শিখবার কাল। যে শিখবে আখের ভাল হবে। লইলে আখের তার ঝরঝরে। ওই তিনকড়ে আর আমি এক সাথে কাম সুরু করেছিলাম। তা দেখ কেনে—তিনকড়েকে কেউ ডাকে? গারার (কাদার) গাঁথুনি গেঁথেই তার দুনিয়ার বিস্তি কাবার হয়ে গেল।

মতি হেসে বললে, তিনকড়ি মিস্ত্রীর ওপর তোমার ভারি রাগ, লয়?

হা হা ক'রে হেসে উঠল জনাব। তুকে কে বুললে গো লাত বউ?

মতি সলজ্জ কৌতুকে বললে—রঙ্গুকে নিয়ে ঝগড়া আমরা জানি না বুঝি? হাড়িদের মেয়ে রঙ্গু!

উত্তরে জনাব মতির ডাগর চোখের সলজ্জ দৃষ্টি নিয়ে রসিকতা ক'রে বসল। মতি মুখে কপড় দিয়ে বললে, মরণ।

জনাব বললে—ঠিক তুর মত চোখ আর চুল রঙ্গুর। তবে তুর চেয়ে অনেক কালো। তেমন কালই আর চোখে পড়ল না।

জনাব হঠাৎ ভারার উপর উঠে দাঁড়াল।

বর্ধিষ্ণু গ্রাম। তবে পাকা গাঁথুনীর ঘরের সংখ্যা কম। দক্ষিণে হরিশবাবুর দোতলা দু'মহলা দালান, মধ্যে শ্যামাদাসবাবুর এবং শ্যামাদাসের ভাইয়ের পাকা বাড়ী। তারপর মাধববাবুর প্রকাণ্ড বাড়ী। তার মধ্যে একখানা তিনতলা। তারই ওধারে রামবাবুদের একতলা দালান। মধ্যে মন্দির। রামবাবুদের পাঁচটা শিবমন্দির পাশাপাশি। ও পাড়ায় দুটো খুব প্রাচীনকালের মন্দির। ওই উত্তর দিকে একটা মন্দির। উত্তর-পশ্চিম কোণে জনাবের পাড়ার মসজিদ। মিনার দুটো সোজা উঠে গিয়েছে।

জনাব বললে—ওই দেখ লাতবউ। ওই রামবাবুর একতলা দালান। ওই দালানে আমার হাতে খড়ি। তিনকড়িরও হাতে খড়ি ওই হোথাকেই। রঙ্গু এল খাটতে। আমাদের থেকে রঙ্গু বয়সে বড়। এই তুর মতুন চোখ, দাসীর মতন চুল, আর সে কি কাল রঙ! দেখে আমি মাতাল হয়ে গেলাম। ইঁটা দিতে এল রঙ্গু। লিতে গিয়ে ঝুড়ির কিনারাটা হাত থেকে খসে প'ড়ে গেল। রঙ্গু মুচকি হেসে বললে—ফেললে তো। দেখো নিজে প'ড়ে যেয়ো না।

দাসী হেসে বললে—তা বাদে তুমিতো রঙ্গুকে নিয়ে ভাগলে। তিনকড়ির ভয়ে।

—ভাগলাম? জনাবের ভুরু দুটো কুচ'কে উঠল। সে বললে—তিনকড়ির ভয়ে ভাগি নাই।

* * * *

জনাবের বয়স এখন ষাটের কাছাকাছি। আঠারো বৎসর বয়সে হাড়িদের মেয়ে রঙ্গুকে নিয়ে সে একদিন এখান থেকে পালিয়েছিল। লোকে বলে—তিনকড়ি রাজ-মিস্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে রঙ্গুকে ছিনিয়ে নিয়ে আত্মরক্ষার জন্যই জনাব পালিয়েছিল। জনাবের আত্মসম্মান এতে যেন আহত হয়। সে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। তিনকড়ি? আরে—সরম কি বাত, লজ্জার কথা! মর্কটের মত চেহারা, উল্লুকের মত তরিবৎ, তার সঙ্গে পিয়ারীর দিল নিয়ে লড়াইয়ে না কি জনাবকে পালিয়ে যেতে হয়! সেকালের জনাবের চেহারা এরা দেখে নাই। তাই এমন কথা বলে।

পালিয়েছিল সে অন্য কারণে। রঞ্জু যদি যেতে রাজী না হ'ত তবু সে পালাত। বাপের সঙ্গে গিয়েছিল সে পাথর চাপড়ীর মেলা। বড় জাগ্রত পীরসাহেব সেখানে। দশ-বিশ হাজার লোক জমায়েৎ হয় পীরের অর্চনার জন্য। তার অসুখের জন্যই তার বাপ পীর সাহেবের কাছে মান্নত করেছিল। মান্নতের টাকা ধান মোমবাতী তেল নিয়ে সপরিবারে তার বাপ পাথর চাপড়ী গিয়েছিল। পথে কিছু দূরে পড়ে রাজনগর। এককালে নবাব ছিলেন এখানে। সেকালের অনেক ইমারত আছে। পাথর চাপড়ীর ফেরৎ রাজনগর দেখতে গিয়েছিল তারা।

জনাব অবাক হয়ে গেল। জঙ্গলের মধ্যে প্রকাণ্ড এক তিনখিলানি ফটক। আশপাশ সব ভেঙ্গে গিয়েছে, কিন্তু তিনখিলান দাঁড়িয়ে আছে জমাটবন্দী পাথরের মত। কি তার বাহার, কি সব নক্সা! রাজ-মিস্ত্রীর ছেলে সে—নিজে রাজ-মিস্ত্রীর কাজ শিখছে কিন্তু এ জিনিস সে কল্পনাও করতে পারে নাই কখনও! মনে মনে হাজারো বার, লাখো বার সেলাম জানালে এই ইমারতের 'ওস্তাদ কারিগরকে। সবিস্ময়ে সে বারবার উচ্চারণ করলে—'শোভান আল্লাহ!'

ছেলের বিস্ময় দেখে বাপের কৌতুক হ'ল। সে ফিরবার পথে জেলার সদরের ইমারতগুলো দেখিয়ে নিয়ে এল। হিন্দুদের এক পুরানো মন্দির আছে। সে দেখেও তার তাজ্জব মনে হ'ল।

জনাব চোখে যেন যাদুর সুরমা প'রে ঘরে ফিরল। হাজার সেজের ঝাড়-লণ্ঠনের হাজার বাতির আলোর জলসা থেকে ফিরে কাঠের পিলসুজের উপর মাটির প্রদীপ দেখে যেমন মেজাজ খারাপ হয়ে যায় তেমনি তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। একমাত্র সান্ত্বনাস্থল ছিল রঞ্জু। গ্রামের বাইরে বিশ-পঁচিশটা ঝুরিওয়ালা বটতলায় রাত্রে কেউ যায় না। বলে ভূত আছে ওখানে। জনাবের ওই জায়গাটা খুব ভাল লাগে। বুড়া গাছটার ঘন ছায়ার তলায় কোন গাছ এমন কি ঘাস পর্য্যন্ত জন্মায় না,—পাকা মেঝের মত তকতক করে, মাথার উপরে ডালে পাতায় ছাউনীটি সুডৌল গোল, যেন ছাদের মত—গম্বুজের মত মনে হয়। মূল কাণ্ডটাকে চারদিকে ঘিরে বিশ-বাইশটা মোটা ঝুরি নেমে মাটির বুক ফুঁড়ে চলে গিয়েছে—বিশ-বাইশটা থামের মত। ছেলেবেলা থেকেই জনাবের এই

গাছতলাটিকে বড় ভাল লাগত। এখন শুধু ভালই লাগে না, এখন তার মনে হয় খোদাতায়লার এ এক বাহারের ইমারত। ছেলেবেলায় এসে গাছটার কাছে বসে থাকত দিনের বেলা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহস বাড়ল তখন বিকেলের দিকে এসে গাছটার তলায় গিয়ে বসত, ঘুরে ফিরে দেখত। রঙ্গুর সঙ্গে পরিচয় যখন প্রেমে পরিণত হ'ল, তখন সেই প্রেমে তার সাহস হয়ে উঠল দুঃসাহস। সন্ধ্যার পর সে এসে এই গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকত একটা মোটা ঝুরিতে ঠেস দিয়ে। ঝুরিটিতে এবং জনাবে যেন এক হয়ে যেত। গাছটার ঝুলে-পড়া ডালে ঝুলিয়ে দিত তার সাদা গামছাখানা। দূর থেকে অন্য লোক ভয় পেত, ভাবত সাদা কাপড় প'রে কেউ গাছের ডালে বসে দোল খাচ্ছে; রঙ্গু দূর থেকে বুঝতে পারত' জনাবের নিশানা। সে নির্ভয়ে চলে আসত। রঙ্গুর সঙ্গে যতক্ষণ থাকত ততক্ষণ ছিল তার আনন্দ।

রঙ্গুর কাছে সে গল্প করত রাজনগরের তিনখিলানি ফটকের সদরের চূড়ার, মন্দিরের। সদরের বড় বড় ইমারতের। এর ওর কাছ থেকে শোনা শহর মুরশিদাবাদের নবাবী আমলের ইমারতের। শহর কলকাত্তায় এক মিনার আছে—নাম বলে মনুমেণ্ট, তলাতে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকালে মাথার পাগড়ী টুপি খসে মাটিতে প'ড়ে যায়।

রঙ্গুর শুনতে ভাল লাগে—কিন্তু অবসর হয় না। তারও ঘর-দুয়ার আছে—মা-বাপ-ভাই আছে, স্বামী আছে। রাজ-মিস্ত্রীর সঙ্গে যারা মজুরনী খাটে তাদের সঙ্গে রাজ-মিস্ত্রীদের অপবাদ রটে, অভিভাবকেরা জানে—অপবাদের মূলে সত্যও আছে; তবুও নিয়ম হ'ল সব দিক মানিয়ে চলার। সেইটাই ভাল। রাজ-মিস্ত্রীদেরও এ বিষয়ে একটা নিয়ম আছে, সেটা তারাও মেনে চলে; গোপন প্রেম যতই প্রবল হোক তারা প্রণয়িনীদের ঘরছাড়া ক'রে নিজের ঘরে আনে না। এতে বদনামী হয় তাদের। ব্যবসার ক্ষতি হয়। লোকে কাজ দিতে চায় না, মজুরনীদের কাজ করতে পাঠাতে চায় না তার কাছে।

অকস্মাৎ একদিন জনাব তাকে বললে—আমার সঙ্গে যাবি?

—কোথা? কোলকাতা না মুরশিদেবাদ, না দিল্লী না লাহোর? তুমি তো নিয়ে গেছো আমাকে কত জায়গা! হাসলে রঙ্গু।

রঙ্গুর হাত চেপে ধরলে জনবে, বললে—না। ইবার আমি পালাব। খোদার কসম। একটু চুপ ক'রে থেকে জনাব বললে—বাপজীকে এত ক'রে বুললাম, তা সি যেতে দিবে না। বুলে মা-মরা ছেলে আমার তু, তুকে ছেড়ে থাকতে লারব আমি। আর গাঁয়ে মায়ে সমান কথারে বাবা, ইখানেই কাল কেটে যাবে, খেয়ে পরে কোন রকমে—উ সব খেপামী করিস না।

—তা তো হ'ল। কিন্তু যাবে কোথা? জায়গাটা শুনি?

—সাহেবডাঙ্গার কুঠী জানিস?

—হ্যাঁ। রেশম-কুঠী আছে সাহেবদের।

—সেথাকে।

—রেশম-কুঠীতে কি করবা?

—সিথানে লতুন ক'রে সব ইমারত হবে। পুরানো সব ভেঙে নয়া-নয়া কারখানা করেছে সাহেবানেরা। মোটা মজুরী। যাবি?

রঙ্গু এই অল্প বয়সের মধ্যে বহুজনের প্রলোভনে পড়েছে, অর্থ-সামগ্রীও সে অনেক পেয়েছে, কিন্তু তাদের কেউ জনাবের মত নিজেকে দেয় নাই এমন ভাবে। ফলে—সব দিক মানিয়ে, ঘর-সংসার এবং জনাব—এই দুইকেই বজায় রেখে মানিয়ে চলা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছে। সে প্রকাশ্যভাবে জনাবকে তার নিজের বলে এবং নিজেকে একান্তই জনাবের বলে ঘোষণা ক'রে দাঁড়াতে চায়। সে বললে—চল—তাই চল।

পরদিন সন্ধ্যায় আর তারা মিলিত হ'ল না। রাত্রি একটু গভীর হ'লে জনাব এসে দাঁড়াল গাছতলায় একটি পুঁটলি নিয়ে। ছোট বড় পাটা দুখানা হাতে নিয়েছিল। রঙ্গুও এল একটি পুটলি নিয়ে। দুজনে তারা বেরিয়ে পড়ল।

নদীর ধারে সাহেবডাঙ্গায় রেশম-কুঠী। একেবারে নদীর কিনারার উপর। সাহেবানদের কীর্তি দেখে জনাব বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। শোভান আল্লা! ক্রোশ ভর কিনারা একদল নিচে থেকে উপর পর্য্যন্ত বাঁধিয়ে ফেলেছে। বাঘিনীর মুখের মধ্যে লোহার দস্তানা পরা হাত পুরে দিলে যেমন হয় দরিয়ার হাল হয়েছে ঠিক তেমনি। কষের দাঁত

দিয়ে বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে চিবুতে চেষ্টা করছে সে। বাঁধানো সীমানা বরাবর নদী এখানে ধনুকের মত বাঁক ঘুরতে বাধ্য হয়েছে।

বাঁধানো কিনারার উপর উঠেছে কুঠী। পাঁচীল চলে গিয়েছে তীরের মত সোজা। তার ভিতরে দেখা যাচ্ছে গোল থামওয়ালা দোতলা বাড়ী। সব চেয়ে বিস্ময়কর চৌপলা মিনারের মত উঠে গিয়েছে ইঁটের তৈরী চিমনী।

ঘাটে উঠবার সময় জনাব পোস্তার গাঁথনীটা বেশ করে হাত দিয়ে নেড়ে দেখলে। এ্যায় বাপরে বাপ! জলে একদম পাথর বনে গিয়েছে। ইঁটের উপরে ইঁট -- তার উপরে ইঁট, মাঝখানের মসলা কোথায় কতটুকু, ধরতে পারা দূরে থাক আন্দাজও করা যায় না।

সাহেবের সামনে গিয়ে সেলাম করে সে দাঁড়াল। কুঠীর তখন অনেক কাজ, নতুন বয়লার বসবে, চিমনী তৈরী হবে; নতুন করে পাঁচশো খাই তৈরী হবে, তার শেড চাই। নতুন গুদাম হবে, কোয়ার্টার হবে, আণ্টাঘর হবে। অনেক কাজ, অনেক মিস্ত্রী চাই, অনেক লোক চাই। কাজ পেয়ে গেল জনাব। কুঠীর দারোয়ান তাকে সঙ্গে করে জিম্মা করে দিলে বড় মিস্ত্রীর—সেখ খুরসেদ আলি।

ঘাড় কামানো বাবরী চুল—চেরা সিঁথী, মাথায় মলমলের টুপী, গায়ে পাঞ্জাবী আস্তিন; পরনে চেকদার লুঙ্গি, পায়ে ফুলদার চকচকে জুতা—নাম পামশু। দোষে গুণে বেশ মানুষ ছিল খুরসেদ। বয়স তখন তার চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। জনাবকে একনজর দেখলে—জনাবকে দেখতে গিয়ে পিছনে রঙ্গুকে দেখে সে বললে—ও? ও কে?

জনাব বললে—আমার লোক। তারপরই নিজেকে সংশোধন ক'রে নিয়ে বললে—আমার বিবি।

খুরসেদ হেসে বললে—ঝুট।

তারপর আবার হেসে বললে—তাতেও কোন হরজা নেই। তুম্ রাজমিস্ত্রী হ্যায়—উ তুমারা রেজা হ্যায়। লেগে যাও কাজে। পিঠের দিকে জামার গলায় ঝুলানো ছিল -- ভাঁজকরা ইঞ্চি মাপের স্কেলটা—সেটা সে টেনে নিয়ে মাপতে বসল গাঁথনীটা। অবাক হয়ে গেল জনাব। সেও লাগল কাজে পরের দিন থেকে।

নদীর ধারের পলিমাটির তৈরী ইঁট—পগমিলে মাটি তৈরী হয়েছে. বাক্স ফর্মায় ছ'খানি পিঠ একেবারে যেন র‍্যাঁদা করা কাঠের মত সমান; একখানির উপর আর একখানি রাখলে বেমালুম বসে যাবে—কেতাবের ভিতরে সমান মাপে কাটা কাগজের উপর কাগজের মত। পাতলা গঁদের আঠার মত এক আস্তরণ মসলা কর্ণি চালিয়ে টেনে দিয়ে একখানার পর একখানা ইঁট বসিয়ে যাচ্ছে। সোহাগার পান দিয়ে জোড়া সোনার দানা দানার সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে। খিলান হচ্ছে—সাহেব লোকের আণ্টাঘর—গান হবে, বাজনা হবে' সাহেব মেম লোক নাচবে—জোড়াবেঁধে; গোটা ঘর জোড়া এক খিলান, দুই ধারে দুই থাম। বিশ ফুট চওড়া খিলান। মোটা শালের রোল দিয়ে মাচা বেঁধে খিলানের ঠেকা বাঁধা হয়েছে, তার উপর ইঁট গাঁথা হচ্ছে। খিলানের ইঁট সোজা বসছে না, বসছে আড়াআড়ি। মসলা নিজে দাঁড়িয়ে তৈরী করিয়েছে বড় মিস্ত্রী। 'বিলাইতী মাটি' আর কাশীর চিনির মত মিহি বালি মিশিয়ে শুকনা অবস্থায় বারবার তাকে কেটে ঘেঁটে মিশিয়ে জল ঢেলে ক্ষীরের মত পাতলা ক'রে তৈরী সে মসলা। সেই মসলা ঢেলে দিচ্ছে ফাঁকে ফাঁকে, কর্ণি দিয়ে মেজে ঘষে জোড় মিলিয়ে দিচ্ছে। বিলাইতী মাটি ওই এক তাজ্জবের মসলা। বালিতে আর 'বিলাইতী মাটিতে' মিশিয়ে তাল পাকিয়ে রেখে দাও ঠাণ্ডায়, একটু শুকালে ফেলে রাখ পানিতে; একদিন পর তুলে নাও—বাস্—পাথরের গুলী হয়ে যাবে।

আণ্টাঘরের গাঁথনী শেষ হ'ল। আরম্ভ হ'ল পলেস্তারা। সাহেব বলেছিল বিলাতী মাটিতে বালি মিশিয়ে পলেস্তারা কর। খুরসেদ বললে—হুজুর পঙ্কের কাম হ'ক—মার্বেলকে মাফিক জিল্লা দেগা। উসকে পর আঁখ রাখনেসে দরদ নেহি লাগে গা।

তিনকড়ি রাজ পঙ্কের কাম হয়তো চোখে দেখেছে। এখানে জনাব কিছু করেছে। কিন্তু সে কাজের হদিস সে জানে না। 'বিলাইতী মাটি' এখানেও আমদানী হয়েছে অনেকদিন। তিনকড়ি বুদ্ধি খাটিয়ে বেশী মজবুত করবার জন্য 'বিলাইতী মাটির' সঙ্গে মেশাবার বালির ভাগ কমিয়ে চুণ মিশিয়েছিল তার বদলে। উল্লুক—বুরবক—গিধ্বড় কাঁহাকা! মনে পড়লে জনাবের হা-হা করে হাসতে ইচ্ছা করে। মদের সঙ্গে দুধ! আরে

উল্লুক। হায় নসীব জনাবের! বিলাইতী মাটির সঙ্গে চুণা! তোবা! তোবা! ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল গাঁথনী!

হায় খোদা! হে ভগবান! এ কাজ কি এত সোজা? একি এমনি হয়! খোদাতায়লা দুনিয়া তৈয়রী করলেন—কোথাও গড়লেন পাহাড়, কোথাও গড়লেন নদী, কোথাও গড়লেন বন—সমান মেঝের মত দুনিয়ার ক্ষেত গড়লেন—কিনারায় কিনারায় সমুদ্দুর। তাঁর কাছ থেকেই না বড় বড় মানুষ দামী মগজে ভরে নিয়ে এল সেই বিদ্যা। সে কি সোজা! কত বড় বড় কেতাব লিখেছে সব বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার, কত নক্সা—কত মসলা কত মাপ—কত হিসাব। সে দেখেছে। চোখে দেখেছে সে সব কেতাব সাহেবানদের টেবিলের উপর। খুরসেদ কতক শিখেছিল তাদের কাছে, কতক শিখেছিল তার পুরানো দেশী ওস্তাদের কাছে—মুরশিদাবাদের বুড়া ওস্তাদ কারিগর, মগজের খোঁপে খোঁপে ছিল তার নবাবী আমলের ইমারতী এলেম। খুরসেদের কাছে জনাব অনেক কষ্টে আদায় করেছে এইসব বিদ্যা, এইসব এলেম। বহুৎ দাম তাকে দিতে হয়েছে এর জন্য তাকে। রঙ্গুকে দিতে হয়েছে খুরসেদকে।

রঙ্গুকে দেখে নেশা জাগল খুরসেদের। জনাবের উপর সে সদয় হ'য়ে উঠল। জনাবের কাছে সে পান চাইত রোজ। বলত রঙ্গিলা বিবির হাতের সাজা পান খাওয়াও মিয়া। এই সূত্রপাত। তারপর একদিন বললে রঙ্গিলা বিবির হাতের রান্না খাওয়াও জনাব ভাই। তখন জনাবকে রাখত সে ঠিক নিজের পাশে। জনাবও তখন কাজের নেশায় বিভোর। তখন খুরসেদের এ নেক নজরের কারণ ঠিক ধরতে পারে নাই। ভাবত, তার কাজে খুসী হয়ে বড়মিস্ত্রী তাকে ভালবাসছে, তাকে ঠিক ভাইয়ের মত দেখছে, তাই তার বাড়ীতে নিজে থেকে যেচে নিমন্ত্রণ নিলে। রঙ্গুর হাতের রান্না খেতে চাওয়ায় খুরসেদের কিছু মতলব ঠাওর করবার মতও কিছু ছিলনা। সে নিজেই পঞ্চমুখে রঙ্গুর রান্নার প্রশংসা ক'রত। রঙ্গু হাসত কাজের যোগদান দিতে দিতে।

রঙ্গু সেদিন হাসতে হাসতে বলেছিল—তাই নেমন্তন্ন কর বড়মিস্ত্রীকে। খুব আচ্ছা ক'রে কলিজার কালিয়া রেঁধে খাওয়াব।

জনাব সেদিনও বুঝতে পারে নাই কথাটা।

বুঝতে পারলে, হঠাৎ একদিন খুরসেদ তাকে বললে—রঙ্গিলা বিবিকে তুমি ছেড়ে দাও জনাব ভাই।

চমকে উঠল জনাব।

—আমি ওকে কলমা পড়িয়ে নেকা করব।

স্তম্ভিত হয়ে গেল জনাব।

বড়মিস্ত্রী হেসে বললে—রঙ্গি চলেও গিয়েছে আমার বাসায়। সেও রাজী আছে। আর বেশী গোলমাল করলে কোন ফায়দাও হবে না এতে। সেটা তুমি সহজেই সমঝাতে পার।

সমঝাতে হ'ল বৈকি। সারারাত নদীর বালিতে বুক চাপড়ে কেঁদে সে বুঝলে। মনকে বুঝালে। তারপরের দিনটাও সে বুঝলে। তার পরদিন সে হাসিমুখে এসেই খুরসেদকে বললে—তাই হ'ক বড়ভাই। হাজার হ'লেও তুমি ওস্তাদ।

বড়মিস্ত্রী বললে—তুই বেছে নে, এত কামিন রয়েছে—যাকে পছন্দ হবে তোর বল।

পছন্দ সে করলে একজনকে কিন্তু সে কথা বললে না বড়মিস্ত্রীকে। খুরসেদের বাসায় ছিল কিছুদিন আগে নেকা করা এক স্ত্রী। তাকেই নিয়ে একদা সে সাহেবডাঙ্গা থেকে গভীর রাত্রে বেরিয়ে পড়ল। তখন আণ্টাঘরের মেঝে হয়ে গিয়েছে—ছাদ হয়েছে, পলেস্তা হয়েছে—থামে পঙ্কের কাজের পালিশ হয়েছে। গাঁথা হচ্ছিল তখন চিমনী। মাঝের জায়গায় গাঁথুনা চলছিল, ভারার উপর থেকে নিচের দিকে চাইলে শরীর শির-শির্ করে—মাথা ঝিম-ঝিম করে। খুরসেদ তখন কিছু কিছু সন্দেহ করতে সুরু করেছে। তার ভয় হ'ল হঠাৎ খুরসেদ তাকে ভারা থেকে ঠেলে ফেলে দিতে পারে। শয়তান, ও সব পারে। পুরো চিমনীটা গাঁথতে সে পারলে না—এই আফশোষ নিয়েই সে হামিদনকে নিয়ে পালাতে বাধ্য হ'ল।

ঘণ্টা বাজছে। ঢং ঢং ক'রে পাঁচটা ঘণ্টার আওয়াজ হ'ল। ইস্কুলের ঘণ্টা,·পাঁচের ঘণ্টা শেষ হ'ল, বাজল তিনটে। জনাবের চমক ভাঙল—কতকালের কথা! কাজ করতে করতেই সে ভাবছিল। হাতের শেষ ইঁটখানি বসিয়ে সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল।

মতিবালা প্রশ্ন করলে—কি ভাবছিলে গো ওস্তাদ ? রঙ্গুকে ?

হেসে জনাব বললে—উঁহু।

—তবে ?

—তুর ডাগর চোখ দু'টি ভাবছিলাম। সে তার গালে একটি টোকা মেরে দিলে।

রাগের ভঙ্গিতে মুখ গম্ভীর ক'রে মতি বাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—উ কি ? না ! হ্যাঁ !

নিচে থেকে ডাকলেন শ্যামাদাসবাবু—জনাব !

—এই যাই আজ্ঞা। আজ দেখেন কাজ। মেপে দেখেন।

—কাটান দিলে ?

—কাল দিব। ভেবে দেখলাম—আজ দিলে জেরা সে খুঁত থাকত।

শ্যামাদাস চঞ্চল হয়ে নখ খুঁটতে আরম্ভ করলেন—শোন ত' তুমি। শোন ত। একে বলে—তোমার মতলটা কি একবার খুলে বলত শুনি।

জনাব বললে—পেটে এখুনও দানা-পানি পড়ে নাই বাবু। এখুন লয়। আসব সনজের সময়। এখুন হয়তো খারাপ বাত বেরিয়ে যাবে। সনজেতে আসব।

সন্ধ্যার সময় সে এল। এখন তার গায়ে ফতুয়ার বদলে জামা। পরনে কাপড় বহরে বড়। কোঁচাটি উল্টে গুঁজে প্রৌঢ়ত্বের সঙ্গে মানান সই ক'রে নিয়েছে।

শ্যামদাসবাবু বললেন—লোকে যা বলে সে মিছে নয়। লাগলে একে বলে—থামতে চাও না।

জনাব হেসে বললে এ আপুনি কি বুলছেন হুজুর ? কাম শেষ না হ'লে থামব কি ক'রে গো। সবেরই একটা সময় আছে, থামবারও একটা সময় আছে। একি বাজীকরের হুকার জল—হই বসায়ে দিলে—দিয়ে বুললে পড়, জল পড়তে লাগল—বুললে থাম, ব্যাস থেমে গেল।

শ্যামদাসবাবু বললেন—আজ কাটান মারবার কথা—তুমি নিজে—

—হাঁ বলেছিলাম। তা দেখলাম আজ যদি এইখানে কাটান মারি

তবে জেরা সে খুঁত হয়, খারাপ হয়ে যায় মন্দিল। ধরেন সবেরই একটা হিসাব আছে। ফিতা ধরে মাপ—ফুট ইঞ্চির হিসাব।

—কিন্তু এরই মধ্যে কত উঁচু হয়েছে দেখেছ?

জনাব ভুরু কুঁচকে হাসলে—উঁচু হয়েছে! উই কি উঁচু? উচাই যদি না হবে, তবে মন্দিল করছেন কেন হুজুর? একখানা সাত ফুট বাই আট ফুট গারার গাঁথনী ঘর করলেই তো হ'ত। মাথার উপর একটা তেকোনা পেরাপেট গেঁথে একটা ত্রিশূল বসায়ে দিলেই হ'য়ে যেত। তা বলেন না কেনে—এখনও হবে। তাই ক'রে দিছি আপনার। গাঁথুনী বন্ধ থাক, কড়ির অডার পাঠায়ে দিন, টালি আনিয়ে নি—

বাধা দিয়ে শ্যামাদাস বললেন—আঃ তুমি বড় একে বলে বাজে বক জনাব। তা' কে বলেছে হে বাপু? চঞ্চল হয়ে তিনি চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন, ঘুরতে লাগলেন ঘরময়, আঙুল দিয়ে নখ খোঁটার মাত্রা বেড়ে গেল।

জনাব বললে—তবে আপনি বুলছেন কি? মন্দিল হবে আপনার। আমার লয়। আমি লিয়ে যাব না ঘরে। লোকে বুলবে না জনাব সেখের মন্দিল, বুলবে অমুক বাবুর মন্দিল। হুজুর, মন্দিল লোকে করে কেনে? ঘর করলেই তো হয়। হুই মাথা লম্বা ক'রে আকাশের গায়ে মার দিয়ে মন্দিল করে কেনে? তার উপরে দেয় আপনার কলস, তার উপর ত্রিশূল—কেউ দেয় চক্র। কেউ বা দেয় পিতলের কেউ বা দেয় সোনার। কেনে দেয় হুজুর? উঁচার জন্যেই মন্দিল। আপনার দেবতা—আপনার ঠাকুর যে ইমারতে থাকবেন, সে নিচু হবে মানুষের 'থনি' (চেয়ে)? আপুনি থাকেন দোতলা ঘরে, তার চিলকোঠা হুই উঁচা আর ঠাকুরের মন্দিল এই নিচু হবে? মন্দিল হবে, দেবতার মন্দিল, আকাশের গায়ে মার দিয়ে মাথা উঁচা ক'রে খাড়া থাকবে, সুরুষের আলো প'ড়ে সোনার কলস ঝলবে। গাঁয়ের লোকের ঘুম ভাঙবে সকালে, আল্লাকে—ভগবানকে প্রণাম করতে মুখ তুলবে, আপনার মন্দিলের চূড়া চোখে পড়বে। তারা প্রণাম করবে আপনার ঠাকুরকে। বলবে—হ্যাঁ অমুক বাবু একটা আদমীর মতন আদমী ছিল, ভকত ছিল বটে, মন্দিল ক'রে গিয়েছে বটে। বেহেস্তে থেকেও শুনবেন সে কথা আপনি।

মন্দিলের চূড়া ক্রোশ বরাবর দূর থেকে দেখা যাবে। তবে সে মন্দিল। গাঁয়ের চার পাশে গাছপালা, জঙ্গল মনে হয় দূর থেকে। সেই জঙ্গলের মাঝখানে গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে আশ্বিনের টুকরাভর মেঘের মত মন্দিলের মাথা দেখা যাবে। লোকের প্রথমে মনে হবে মেঘই বটে। তা'পর মনে হবে—না, মেঘ তো লয়; মন্দিল—এ মন্দিল। তারিফ করবে লোকে। বলবে—হ্যাঁ, ইমানদার লোকের কীর্তি বটে। দেশদেশান্তরের লোক কেউ আসছে ই গাঁয়ে। পথে রাহীকে শুধালে অমুক কত দূর ভাই? লোকে বুলবে আর খানিকটা এগিয়ে গেলেই নজরে আসবে, পহেলেই দেখতে পাবে এক মন্দিলের চূড়া। ওই চূড়াতে চোখ রেখে চ'লে যাও। কার মন্দিল ভাই? অমুক বাবুর মন্দিল। হ্যাঁ!

শ্যামাদাসবাবু কথার মাঝখানেই পায়চারী ছেড়ে এসে চেয়ারে বসে-ছিলেন। স্তব্ধ হয়ে তিনি বসে ছিলেন। নখ খুঁটছিলেন অত্যন্ত মৃদুভাবে। জনাব তার কল্কের স্তিমিত আগুনে ফু দিতে দিতে বাইরে গিয়ে বসল। সেখানে আড়ালে বসে তামাক খেতে লাগল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে,—বাবু।

—উঁ।

—বুলেন, কথাটা আমি ঠিক বুলেছি কি না?

শ্যামাদাসবাবু বললেন—হুঁ! কথা তো ভালই বটে। একে বলে শুনতেও ভাল লাগছে। কিন্তু—

—উয়াতে আর কিন্তু নেই হুজুর। সাহেবডাঙ্গার কুটি 'থনে' গেলাম বর্ধমান। শুনলাম রাজবাড়ীতে ইমারত হবে নতুন। বুঝলেন? পথে পেরথম চোখে পড়ল সারি সারি মন্দিল—একশো আট শিবমন্দিল। দুধের মতন সাদা মন্দিলের সারি; আঃ মাঠের মধ্যেখানে—দু' কোশ দূর থেকে নজরে পড়ছে, আর মাঝে মাঝে গাছের আড়াল পড়ছে। তারপর কাছে এলাম; হুজুর সেখান থেকেই একশো আট সেলাম দিলাম রাজাকে—আর একশো আট সেলাম দিলাম কারিগরকে। তা বাদে আপনার রাজবাড়ীর ইমারত, সে কথা বাদই দেন। রাজা বাদশা নবাবদের কীর্তিই আলাদা। কিন্তু আপনিও তো আমীর লোক—আমিরের মতন কীর্তি তো আপনাকে করতে হবে। রাজার বাড়ীর থাম

নিচে তলা থেকে উঠে গিয়েছে তিন তলার ছাদ পর্য্যন্ত। পঙ্কের কাজ করা গোল থাম। সে সব কথা না হয় বাদই দিলাম। রাজবাড়ীর কাম হয়ে গেল, শুনলাম কাম হবে কাছেই এক জমিদার বাড়ীর—মন্দিল হবে। ন'টা চূড়া হবে মন্দিলের, দাওয়া হবে মানুষের গলা ভর উঁচা। কলকাতার ইঞ্জিনীয়ার নক্সা করেছেন।

শ্যামাদাসবাবু বেরিয়ে চলে গেলেন।

জনাব অপেক্ষা ক'রে ব'সে রইল। কিছুক্ষণ পর সেও উঠল। কি করবে সে ব'সে থেকে। ঝকমারীর কাম করেছে সে এই বাবুটির কাজ হাতে নিয়ে। দিলদার লোকের কাম করেও সুখ আছে। তাতে মজুরী কম হয় সেও আচ্ছা। দিলদার লোক ছিল বর্ধমানের সেই জমিদার। ঘুর ঘুর ক'রে বাবুসাহেব মন্দিরের চারি পাশে ঘুরচেই। —হাঁ, ওখানটা কেমন যেন বেঁকে গেল মিস্ত্রী?

—না হুজুর, ঠিক আছে নিচে থনে উঁচাতে এমন দেখায়।

—মিস্ত্রী দেখ, আমার ভারি ইচ্ছে—

—বলুন হুজুর, বলুন কি ইচ্ছে?

—ইঞ্জিনীয়ার করেছেন বটে, মাঝখানের চূড়াটি এই রকম, কিন্তু আমার ইচ্ছে, বর্ধমানের সর্বমঙ্গলার মন্দির তুমি দেখেছ তো? সেই রকম হয়।

—হবে—সেই রকমই হবে।

—আর দেখ, ভেবেছিলাম মন্দিরের সামনে যে খিলানের বারান্দা ওইখানেই শুধু মাবেল দেব। তা না সামনের যে খোলা বারান্দা ভিজে রোয়াক ওটাতেও মার্বেল দেব। কি বল?

—হাঁ হুজুর। খুব ভাল হবে।

বর্ধমানের ওই গাঁয়েই হামিদন মরেছিল। বিশ্রী ঘা হয়ে মরেছিল হামিদন। হামিদনের দোষ নাই। সে ঘা তাকে ধরিয়েছিল জনাব। জনাবকে ধরিয়েছিল বর্ধমানের কামিন সৈরভী। ছিপ-ছিপে পাতলা চেহারা, কোঁকড়ানো চুল, ঢুল-ঢুলে চোখ; ঠোঁট দুটো একটু উঁচু ছিল সৈরভীর; হাসলে দাঁতের সঙ্গে মাড়ি বেরিয়ে পড়ত। নেশা লাগত তাকে দেখে। কিন্তু বিষ ছিল তার মধ্যে। সেই জনাবের জীবনে প্রথম

বিষ। জনাব নিজের চিকিৎসা করিয়েছিল। হামিদন লুকিয়েছিল প্রথমটা। তারপর যখন প্রকাশ করতে বাধ্য হ'ল, তখন সে বর্ধমান ছেড়েছে। দূর পাড়াগাঁ থেকে চিকিৎসা ভাল হ'ল না। মরে গেল হামিদন।

—নসীব—নসীব জনাবের। হামিদন মরে গেল—মন খারাপ হয়ে গেল জনাবের। জমিদার বাড়ীর কাজ শেষ হ'তেই সে ফিরে এল এগাঁয়ে। বাপজানও সেই সময় অসুখে পড়েছিল। বাপজান বললে, আর বিদেশে যাস না বাপ। যে ক'টা দিন আমি বাঁচি ইথানেই থাক। কাজকাম কর। সাদী নিকা কর।

জনাব থেকে গেল। নসীব জনাবের।

জনাব বেরিয়ে আসছিল শ্যামদাসবাবুর ওখান থেকে। থমকে সে দাঁড়াল শ্যামদাসবাবুর বৈঠকখানা থেকে বেরিয়েই পতিত জায়গাটায়—মন্দিরের সামনে।

মন্দিরের পিছনে পুকুর। পুকুরের ওপারে বোধ হয় চাঁদ উঠেছে।

ওঃ—মন্দির যখন শেষ হবে, তখন এমন বাহার দেবে!

কে? কে উখানে? মন্দিরের সামনে উপরের দিকে মুখ ক'রে কে দাঁড়িয়ে আছে? জনাব এগিয়ে গেল। সে বিস্মিত হয়ে গেল। শ্যামদাসবাবু উপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। জনাবের বুঝতে দেরী হ'ল না—বাবু অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মনে মনে মন্দিরটাকে ছকে দেখে নিচ্ছেন।

—হুজুর?

শ্যামাদাস চমকে উঠলেন।

—আজ্ঞে আমি জনাব। সেলাম। তা হ'লে যাই আমি।

—একে বলে, কাল থেকে জোর দিয়ে কাজ আরম্ভ কর। একে বলে বড় হ'ক ছোট হ'ক তাড়াতাড়ি শেষ কর।

—যো হুকুম হুজুর।

জনাবও একবার আকাশের দিকে তাকালে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল গোটা মন্দিরটা।

মন্দিরের কাজ জোর চলছে। খাঁজে খাঁজে অল্প অল্প ভেঙে চারখানি দেওয়াল পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে উপরের দিকে উঠে চলেছে। মন্দিরের চূড়ার মাঝখান ছাড়িয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে। জনাব ভারার উপর দাঁড়িয়ে দেখে। দুই দেখা যাচ্ছে—তাদের পাড়ার মসজিদের মিনার। ও মিনারের আধখানা জনাবের হাতের গড়া। যে বৎসর সে ফিরল—সে সালটা পুরানো লোকের সবার মনে আছে। বড় ভূমিকম্প হয়েছিল। দু'তিন বাঁশের উপরে বাঁধা ভারা যখন ঝড়ে দোলে, তখনই জনাবের সে দিনকার কথা মনে পড়ে। দুনিয়াটা দুলে গেল ঝড়বাজা ভারার মত। বড় বড় দালান ভেঙে পড়ল। ছাদে ফাট ধরল। সে ভূমিকম্পে ভেঙে গেল মসজিদের দক্ষিণ তরফের মিনার। এ গাঁয়ে তখন দালান কোথা? হরিশবাবুর দালান, এই শ্যামদাসবাবুর দালান হয়েছে সবে। রামবাবুদের একতালা দালানটাকে সে ইমারতই বলে না। ইটের পাঁজা। পলেস্তারা নাই, পয়েন্টিং পর্য্যন্ত না। আরে, আসল মানুষের গাঁথনীটা তো হাড়ের; গাছের ভিতরটা তো কাঠ; হাড়ের কাঠামোর উপর মাংস লাগিয়ে পঙ্কের কামের পলেস্তারার মত চামড়া দিলে তবে না সে মানুষ, গাছের গায়ে বাকল না হ'লে কি সে গাছ? নোনা ধরেছে এর মধ্যে।

মিনারটার মাপ তার মনে আছে। তার ইচ্ছা ছিল মিনারটাকে আরও খানিকটা উঁচু করে সে তৈরী করে—কিন্তু তাহ'লে উত্তর তরফের মিনারটার সঙ্গে বেমানান হ'ত। অনেক ভেবে তার মনে হয়েছিল, তাতেই বা ক্ষতি কি? এ দিকেরটা হোক না বড়। পাশাপাশি ছোট বড় তালগাছ দাঁড়িয়ে থাকে—সে কি খারাপ লাগে দেখতে! গড়তে পারলে বেমানানের মধ্যে এমন বাহার আনা যায়, সে একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারা যায়। ট্যারা কামিন টুনীর দিকে সব মাতালের মত চেয়ে থাকে অথচ ওটা কেউ ধরতে পারে না। মুস্কিল তো ওই, সমঝদার লোক মেলে না। বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার হ'লে বুঝতে পারে। এখানকার লোকে বুঝতে পারে নাই তার কথা। সেই পুরানো মাপে উত্তরের মিনারের সঙ্গে জুড়ি মিলিয়েই গড়তে হয়েছিল তাকে। হায় আল্লা—নিজের বাড়ীর দিকে কেউ খেয়াল ক'রে চেয়ে চেখে না? আপনার বাচ্চাদের বড় থেকে ছোট তক পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেখ দেখি!

আঃ। একটা ছোট্ট ইঁটের টুকরো লেগেছে জনাবের হাঁটুতে। কে ? হুঁ ! রসিদটা ছুঁড়েছে মতির গায়ে। দুটোতে চুলবুল করছে। গম্ভীরভাবে জনাব বললে—কাম কর রসিদ। কাম ক'রে যা।

মসজিদের মিনারের চেয়ে মন্দির উঁচু হবে অনেক।

মাধববাবুর তিনতলা নয়া দালানটাই এখানকার সবচেয়ে উঁচু বাড়ী। তিনতলার ছাদের সিঁড়ির মাথাটা অনেক দূর থেকে দেখা যায়। ওইটাই এখানকার সবচেয়ে ভাল বাড়ী। কলকাত্তার মিস্ত্রী এসে ওর চারিপাশে নক্সা কেটে গিয়েছে, থামের মাথায় কার্ণিসে কারিগিরি ক'রে গিয়েছে। হাঁ সে লোকটা মিস্ত্রী একটা। বিলাইতী মাটি আর বালিতে কার্ণিসের মাথা জমিয়ে কেটে কেটে বার করত নক্সা। দুই হাতে সাদা ফুল। ঠোঁটে গালে সাদা ফুল—খাটো মানুষটা পাজামা পরত, মাথায় দিত মখমলের কালো টুপি, গায়ে রঙীন কামিজ। নক্সার মিস্ত্রী ভাল। কিন্তু ছাদ খিলানের কিছু জানে না। সে ছাদ খিলানে এই জনাব আলী সেখ !

এখানকার ওই পুরানো কয়টা মন্দির—মসজিদের গম্বুজে খিলান ছাড়া তামাম ছাদে জনাবের কর্ণির দাগ আছে। ভূমিকম্পে সব ছাদে ফাট ধরেছিল, জনাব কতক তার তুলে ফেলে নতুন তৈরী করেছে। কতক—যে সব ফাট অল্প স্বল্প—সে সব বহুৎ হুঁসিয়ারির সঙ্গে মেরামত ক'রে জোড় মিলিয়ে দিয়েছে। বেমালুম জমে ফের এক হয়ে গিয়েছে। বড় বড় সার্জন ডাক্তার ভাঙ্গা হাড় কাটা অঙ্গ জুড়ে দেয়—এমন জুড়ে দেয় যে একটু দাগ ছাড়া কিচ্ছু বুঝতে পারা যায় না, তাও কাটা চামড়া সেলাই করলে, তবে দাগটা থাকে, নইলে বেমালুম জুড়ে যায়, শুধু জুড়েই যায় না—ঠিক সহজ শরীরের মত জোরালো হয়। জনাবের ছাদ জোড়ার কেরামতিও ঠিক তেমনি। এক ফোঁটা জল পড়ে না আজও।

শ্যামাদাসবাবু ডাকলেন নীচে থেকে—জনাব !

—বাবু !

—ঝিনুক তা হ'লে কিনতে আরম্ভ করি। এনেছে আজ ক'জন।

—হাঁ হুজুর। উয়াতে আর কথা কি।

পঙ্ক চুণ তৈরী হবে। মন্দিরের একদম মাথার অংশটা পঙ্ক চুণে পলেস্তারা হবে—মাজাই হবে। নেশা ধ'রছে শ্যামাদাসবাবুর।

চার দেওয়ালের উপর 'পারা লেবেল' বসিয়ে দেখলে জনাব, মাঝখানে চার কোণায় বসিয়ে দেখে নিলে, ঠিক আছে, ঠিক মাঝখানটিতে মুক্তার দানার মত টল-টল করছে পারা।

—ঠিক হ্যায়, চালাও, হাত চালাও, হুঁস ক'রে রসিদ—হুঁসিয়ারি ক'রে কাম করবি।

ইঁটের উপর কর্ণির ঘা পড়েছে খন-খন-খন-খন। চূড়ার কাটান যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে, সেখানে লোহার কড়ি বেরিয়ে নিচের দাওয়ার কিনারায় গোল থামের মাথায় বসেছে। বরগা পড়েছে, তার উপর হচ্ছে ছাদ। কামিনের দল তালে তালে কোপা পিটছে, বাজনা বাজছে যেন। জনাব ভারা বেয়ে নেমে গেল ছাদে। মাটির বড় জালায় মসলা ভিজানো জল রয়েছে, জনাব নিজ হাতে মগে ভরে সেই জল ঢেলে দেয়। চালা দিদিরা—হাঁ। সমান জোরে। এক ঘা বেশী জোরে এক ঘা কম জোরে যেন না হয়। আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা!

যে দিকে বারান্দার ছাদ পিটছিল কামিনরা—তার বিপরীত দিকে গিয়ে জনাব দাঁড়াল। ডাকলে—ঠাকুরঝি ইদিকে ভাই শুন ত একবার।

ঠাকুরঝি এখন প্রৌঢ়া—এককালে সে জনাবের পাশে থাকত, মতির এবং দাসীর মত। প্রৌঢ়া এসে দাঁড়াল।

নিম্নস্বরে জনাব বললে—মতিটার সঙ্গে রসিদটার কাণ্ডটা কি রকম বল দেখি?

ঠাকুরঝি একটু বিরক্তিভরেই বললে—মরণ, ওই আবার শুধাতে হয় না কি?

—হুঁ। জনাব উঠে চলে গেল।

ঠাকুরঝি আপন মনে বললে—মরণ, বুড়ো বয়সে উদিকে চোখ কেনে?

জনাব কাজে লাগল। হঠাৎ বললে—উহুঁ—ই হচ্ছে না। মতি তু নিচে ছাদের কাজে যা গো। এত উপরে ভারায় তু লারবি। হেই রাণী—তু উপরে উঠে আয় গো।

রাণী মধ্য বয়সী মেয়ে। সে সন্থ এ পদ থেকে খারিজ হয়েছিল।

মন্দিরের গাঁথনী শেষ ক'রে জনাব দাঁড়াল মাথায় কলস বসাবার শিকটা ধ'রে।

শ্যামদাসবাবু নিচে দাঁড়িয়ে দেখলেন—জনাবকে দেখাচ্ছে ঠিক তাঁর মত খাটো মাথার মানুষ। খুসী হয়ে উঠল তাঁর মন। তবু মনটা খুঁত খুঁত করে। অনেক টাকা বেশী খরচ হয়ে গেল। অনেক টাকা।

জনাব দেখছিল—গ্রামের ঘরবাড়ী গাছপালার মাথার উপর দিয়ে তার নজর চলেছে—ওই নয়াগাঁ—ওই বামনপাড়া—ওই দেবীপুর—ওই মাঠে চৌধুরী দীঘি—ওই নয়ানজুলির মাঠ—ওই নদী কিনারের আকাবাঁকা জঙ্গল—ওই সরকারী পাকা শড়ক লাল ফিতার মত চলে গিয়েছে—পুতুলের মত লোক চলেছে—গাড়ী চলেছে। বাহবা, বাহবা! বুড়ো বয়সের ছাতিও তার ফুলে উঠল।

এইবার পলেস্তরা, নক্সা, কার্ণিস, বিট, পাতলা ছুরির মত ধারালো মিহি কর্ণির কাজ। কাগজে পেন্সিল দিয়ে ছ'কে নিতে হবে নক্সা। সাদীর কনেকে যেমন টিপ দিয়ে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সাজায়—তেমনি ক'রে সাজাবার পালা।

ভারা থেকে সে নেমে এল। শ্যামদাসবাবুকে সেলাম ক'রে বললে—সেলাম হুজুর—দেখে লেন কাম। ইঞ্জিনীয়ার নিয়ে এসে কাম দেখে লেন।

ঠাকুরঝিকে ডেকে বললে—শুন ইদিকে।

পকেট থেকে নীল কাগজে মোড়া দু'টি সোনার কানের টাপ তার হাতে দিয়ে বললে—মতিকে দিস। আর এই লে ভাই তুর। একটি টাকাও তার হাতে দিলে।

—মতিকে ?

—হ্যাঁ। মন্দির শেষ হ'ল। বকশিশ দিলাম নাতবউকে।

—কি বলব ?

—আমি কিছু বুলব না। সি তার যা খুসী হয় করবে।

ঠাকুরঝি যেতে-যেতে বললে—মরণ।

আজ মাসখানেক পরে জনাব সন্ধ্যায় হুকায় তামাক খেতে খেতে ভূতুড়ে বটগাছ তলায় গিয়ে বসে। এখান থেকে মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে, মসজিদের মিনার দেখা যাচ্ছে, বাবুদের চিলে-কোঠা দেখা যাচ্ছে। মাধববাবুর তেতলার ঘরের সারি দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এল।

ইমারতগুলো আর দেখা যায় না। অন্ধকারের মধ্যে সাদা কিছু যেন নড়ছে জমীনের উপর। এগিয়ে আসছে।

*   *   *   *

পলেস্তারা চলছে। হঠাৎ সেদিন জনাব এল না। শ্যামাদাসবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—কি হ'ল?

রসিদ হেসে বললে—ভীমরথি হয়েছে বুড়ার হুজুর। খারাপ ব্যামো হয়েছে।

—খারাপ ব্যামো? কি বিপদ! কি ব্যামো?

—ওই কামিনগুলাকে নিয়ে মাতামতি করে হুজুর এই বুড়া বয়সে—। হাসলে রসিদ।

—রাম রাম রাম!

—কিছু ভাববেন না বাবু, আমরা কাম ঠিক বাজিয়ে দোব আপনার।

এই ব্যাধি জনাবের ছিল—প্রথম হয়েছিল বর্ধমানে। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ দেখা দেয়। আবার নতুন করেও হয়। জনাব যায় ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তার বলেন—কি জনাব? একটু হাসেনও সঙ্গে সঙ্গে।

জনাব সকলের সামনেই বলে - রোগের নাম, বলে—কাজকাম হাতে রয়েছে জলদি সারিয়ে দিতে হবে। টাকা ধরে দেয় ডাক্তারের টেবিলের উপর।

আগে ইনজেকশন ছিল না। এখন ইনজেকশন উঠেছে। জনাব সব হাল হদিস জানে। সকাল থেকে কোন কিছু না-খেয়ে খালি পেটেই এসেছে। সে তার মোটা মোটা শিরাওয়ালা হাত একখানা বাড়িয়ে দেয়; কনুয়ের ভাঁজের জায়গাটায় তাকিয়ে দেখে। ওইখানটার শিরাতেই ডাক্তার স্চ ফুটিয়ে দেবে। বহুত তারিফের হাত ডাক্তারবাবুর। পুট ক'রে স্চটি ফুটিয়ে চালিয়ে দেবে শিরার মধ্যে। বহুৎ পাতলা হাত।

ইনজেকশন নিয়ে একটু ব'সে সে চলে যায় বাড়ী।

অদ্ভুত বাড়ী জনাবের। মাটির দেওয়ালের ভাঙা ঘর। সামনে একটু পাকা বারান্দা। গোল থাম, পাকা ছাদ, পাকা মেঝে। সেই বারান্দার উপর বিছানা পেতে সে শুয়ে পড়ে। ইনজেকশনের পর জ্বর আসবে।

বাড়ীতে কেউ নাই। হামিদনের মৃত্যুর পর সে আর নিকা করে নাই। ইচ্ছাই হয় নাই। কি করবে সে নিকা ক'রে? রঙ্গু, সৈরভী, হায়তন, রোশনী, টগরী বউ, সত্য ঠাকুরঝি, জুবেদা, রাণী সই, মতি নাতবউ, দাসী নাতনী—এদের নিয়ে দিন কাটছে তার, কি করবে সে নিকা ক'রে? এক হামিদন এসেছিল তার জীবনে—সেও জানটাকে দিয়ে গেল গোনাহগারির মাশুল। আবার নিকা? নিকা ক'রে সে মানুষটাকে কষ্ট দিয়ে কাজ কি? ওদের তো সে ছাড়তে পারবে না! সে জানে। অহরহ কাজ-কামের সময় যারা পাশে থাকে, হাতে হাত লাগে, চোখে চোখ রাখতে হয়, পায়ে ইঁট পড়লে আহা বলে, যাদের মাথার চুল মুখে এসে পড়ে ঝুঁকে ইঁট মসলা দেবার সময়, ভারার উপর কড়া রোদে মাথা ঘুরে গেলে যারা বাতাস দেয় আঁচল দিয়ে, তাদের উপর দিল না পড়ে উপায় কি? এমন কোন রাজমিস্ত্রী সে তো দেখলে না—যে এদের দিল না দিয়ে পারলে! তবু তারা বিয়ে করে। করুক—জনাব করে নাই।

সে জানে খোদাতায়লার দরবারে এটা তার 'গোনাহ'। তার এই পাপ—'জেনার' জন্য গোনাহের গোনাগারী তাকে দিতে হবে। দুনিয়ার মানুষকে সে দেখছে। ভালমানুষ আছে বইকি। এই দুনিয়ায় পয়গম্বর আসেন—ইমানদার মানুষ আছেন—তাইতো দুনিয়া আজও আছে। নইলে দুনিয়া ফেটে চৌচির হয়ে যেত মানুষের পাপে। ওঁরা বাদে বিলকুল মানুষ সুদ খাচ্ছে—ঘুষ নিচ্ছে, চুরি করছে—জেনা ব্যাভিচার করছে। সে সুদ খায় না; ঘুষ নেয় না; চুরি করে না। দস্তুরী অবশ্য নিয়ে থাকে সে মালিকে জানে—ঘুষ আর চুরি জানিয়ে করা হয় না! দস্তুরী দস্তুরী—সে তার পাওনা। সেও তার গোনাহ নয়। এক গোনাহ এই। সেই পাপের ভার আর বিয়ে করে সে বাড়াতে চায় না। স্ত্রী বর্তমানে এই অন্যায় আরও গোনাহ।

সে বলে—আল্লাহ্ তায়লা—খোদা তায়লা—মহম্মদ রসুল আল্লাহ! আমার এই গোনাহটুকু মাফ্ কিয়া যায় হজরৎ!

অনেকক্ষণ পর সে আবার বলে—যদি গোনাহগারি দিতে হয়—মাফ যদি নাই কর—সাজা দিয়ো তুমি।

জ্বরের ঘোর কমে আসে; জনাব উঠে বসে। দুটো ইনজেকশনেই

জনাব তাজা হয়ে ওঠে। বাইরে থেকে রোগের লক্ষণ আর কিছু নাই। বাবরী চুল আঁচড়ে গামছায় মুখ মুছে গায়ে ফতুয়া দিয়ে চটী পায়ে সে এসে দাঁড়ালো মন্দিরের কাছে।

বুড়ো হয়েছে জনাব। রাগ যেন চট ক'রে হয়ে যায়। রসিদকে সে সজোরে এক চড় মেরে বসল। বেইমান কোথাকার! সয়তান কোথাকার!

রসিদ হতভম্ভ হয়ে গেল। তারপর রুখে উঠল।

জনাব গর্জে উঠল—চিল্লাস না—ইখানে চিল্লাস না। গদানা ধরে নিকাল দিব। ইখানে চিল্লাস না। তুর বাপ সুদি কারবার করে—আমি টাকা ধারি না, তুর বাপের অনেক জমীন আছে—আমি কৃষাণ নই। তু ওই মতির সর্বনাশ করেছিস—নিজের বেমার উকে দিছিস। তুর নিজের জোয়ানী বয়েস, বেমার ধরিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছিস না। তোবা, তোবা। হারামী হারামী তুই। নিকাল হামারা হিয়াসে!

রসিদ তার যন্ত্রপাতি নিয়ে চলে গেল।

জনাব মতির কাছে এসে দাঁড়ালো। মতি ভয়ে কাঁপছিল। জনাব একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললে যা তুকে আর কিছু বুলব না। তুদের জাতটাই এমনি।

ছুটির সময় বললে—ডাক্তারকে আমি বুলে রেখেছি। যাস। ডাক্তার ফুঁড়ে ওষুদ দিয়ে দেবে। জ্বর আসবে—ইখানে শুয়ে থাকবি। ছুটি হলে বাড়ী যাবি। এই কাঁচা বয়েস—এখন থেকে ঘুন ধরাস না শরীলে।

আব্দুল বললে যাবার সময়—রসিদকে মেরে ভাল কর নাই ওস্তাদ। ওর বাপ—।

জনাব হা-হা করে হাসলে। —কি করবে আমার?

রসিদ এবং রসিদের বাপ কিছু করতে পারত কি না ঠিক পরখ হ'ল না। মাস দুয়েকের মধ্যে মন্দির শেষ হ'তেই জনাব চলে গেল এখান থেকে।

এ-জেলার পাশেই জেলা সাঁওতাল পরগণা। সেখানে সাহেবান পাদরী বাবালোক—বড় আড্ডা করেছে। সাঁওতালদের কেরেস্তান ধর্ম দিয়েছে। লেংটীর বদলে পাতলুন পরিয়েছে, মেয়েরা ঘাঘরা পরে, বাবুলোকের

মেয়েদের মত ভাল ভাল শাড়ী পরে, জামা পরে, জুতা পরে, খোপা বাঁধে, লেখাপড়া শেখে। সেখানে এক বড় ভারী গির্জা হবে। বড় বড় খিলান —বহুৎ উচু চূড়া হবে, চাঁপার কলির মত গড়নের গোল চূড়া ক্রমশ সরু হয়ে উঠে মিলে যাবে সূচালো হয়ে। খিলান—গোল খিলান নয়—ঠিক ইস্কাপনের মাথার মত না হলেও—ঐ ধরণের মাথাটা হবে—একটি বাহারের কোণ তৈরী করে মিলবে।

জনাবকে খবর দিয়েছে তারই এক জানা ঠিকাদার। জনাবের খিলানের পাকা হাত সে জানে।

মতিবালা খবরটা শুনে কাঁদলে।

জনাব বললে -যাবি আমার সঙ্গে ?

মতি চুপ ক'রে রইল। যেতে সে পারবে না।

জনাব নিজেই বললে না:। যেয়ে কাজ নাই তোর। ঘর থেকে পা বার করলে তোরা আর থামবি না। ভাগবি আমাকে ফেলে কারুর সঙ্গে। তা ছাড়া - মরেই যদি যাই আমি তো--তোর কি হবে ?

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললে—আমি রসিদকে বলে যাব। ওই তোকে দেখবে, বুঝলি। হেসে আবারও বললে—আমি জানি তুর মনের আসল টানটা রসিদের উপর।

রসিদকে ডেকে বললে—গোসা রাখিস না ভাই। আমি চল্লাম। দেখিস—তু মতিকে দেখিস, মেয়েটা ভাল।

গ্রাম থেকে বেরিয়ে একবার সে দাঁড়াল। পিছন ফিরে দেখলে। ওই মন্দির—মন্দিরের উপরের পঙ্কের পালিস বকের পালকের মত ঝলমল করছে—মাথার উপর পিতলের কলস ঝকমক করছে। ওই মসজিদের দক্ষিণ দিকের মিনার।

আবার সে ফিরল। সাঁওতাল পরগণায় লালমাটির টিলা, সেই টিলার উপর সাহেবানদের গির্জা হবে। চাঁপার কলির মত গোল ক্রমশঃ সরু সূচালো হয়ে উঠবে গির্জার চূড়া।

* * * *

শ্যামাদাসবাবুর মন্দির এবং জনাব নিয়ে গল্প শেষ হয়েছে। কিন্তু জনাবের কথা শেষ হয় নাই। সামান্য কয়েকটা কথা।

তিন বৎসর পর। জনাবের শেষ দশা। হয়তো আট-দশটা দিন কি দু-একটা মাস—কিম্বা মাত্র কয়েক ঘণ্টাও হতে পারে। সাঁওতাল পরগণা থেকে দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে সে ফিরে এসেছে। অনেক ব্যাধি —তার মধ্যে পেটের অসুখটাই প্রধান। জীর্ণ শরীর, দেখলে চেনা যায় না, বাবরী চুল আছে, কিন্তু তার অধিকাংশই উঠে গিয়েছে। নাকের হাড়টা খাঁড়ার মত উঁচু হয়ে উঠেছে; মোটা হাড়গুলি সার হয়েছে, হাতের আঙুল ঠক ঠক ক'রে কাঁপে। জনাব তবু সেই জনাব। ফিরে এল—সঙ্গে এক ওখানকার সাঁওতাল মেয়ে। বোধ হয় কেরেস্তান। ঘাঘরা না পরলেও—বেশ কায়দা ক'রে কাপড় পড়ে. চুল বাঁধে চমৎকার ছাঁদে। সাধারণ সাঁওতাল মেয়ের মত নয়। পুরানো লোকে বললে—তাজ্জব। একেবারে সেই রঙ্গুর মতো দেখতে।

মাসখানেক পর সে দিন—জনাব বসেছিল—সেই বুড়া বটতলায়।

তার বাড়ী তিন বৎসর না ছাওয়ানোতে ভেঙ্গে পড়ারই কথা। কিন্তু একেবারে ভেঙ্গে সেখানে নতুন ঘর হয়েছে। জমিদারের বাকী খাজনার নালিশের নীলামে রসিদ আলির বাপ সেটা কিনে পুরানো ঘর ভেঙ্গে নতুন ঘর তুলেছে। রসিদ এখন ঠিকাদারী সুরু করেছে; তার চুণ, সিমেন্ট আরও মালপত্র সেখানে থাকে। মতিবালা সেখানে বাঁধা কামিন এখন।

জনাব প্রথম দুটো দিন আব্দুলের বাড়ীর দাওয়াতে ছিল। দ্বিতীয় দিন রাত্রে দাওয়ার আশেপাশে লোক ঘুরতে দেখলে জনাব। সাঁওতাল মেয়েটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। জনাব তাকে আগলে জেগে বসে রইল। সকালে উঠে বাজারের ভিতর গিয়ে একটা ঘর ভাড়া করলে; হাজার হলেও বাজার, এখান থেকে একটা মানুষকে জোর ক'রে তুলে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। জোরের কিন্তু দরকার হ'ল না; দিন বিশেক পরে মেয়েটাই চলে গেল—রসিদের আড়তে নয়—তার বাড়ীতে—রসিদ তাকে কলমা পরিয়ে নিকা করবে।

জনাব আব্দুলকে বললে—দুটো ক'রে রান্না ভাত আমাকে দিবি? পয়সা আমি দোব।

আব্দুল বললে—তুমি ওস্তাদ। তুমার কাছে কাম শিখেছি। এ আমার ভাগ্যি। তুমি এইখানেই থাক। তবে পয়সা আমি লিব না।

খুশী হ'ল জনাব। আল্লাহতয়লার দুনিয়া রসুলে আল্লা-হজরত মহম্মদ এসে দিয়ে গেলেন; কোরান সরিফ, এসব কি বরদাদ হতে পারে? ইমানদার মানুষ আছে বৈকি। সে বললে—বেশ তবে আমি মরে গেলে নিবি। আমাকে ওই বটতলায় একটা ছোট ঘর—চালা ঘর বানিয়ে দে। ওখানেই আমি থাকব।

—সে কি?

—হাঁ। চোখের উপর আমি দেখতে পারব না আব্দুল। তার চেয়ে নিরালায় বেশ থাকব আমি।

সে কিছুতেই তার গোঁ ছাড়লে না।

একটা চালাঘর।

সামনে কতকগুলা ইঁট। জনাব বলে মেঝেটা বাঁধিয়ে নেব। তারই কতকগুলা সে বিছিয়ে নিয়েছে বটতলায়, সেইখানে বসে থাকে।

আষাঢ় মাস। ঘনঘটায় মেঘ করে এসেছে, আকাশ যেন ভেঙ্গে পড়বে। বৃষ্টি আসবে। জনাব উঠতে চেষ্টা করলে—পারলে না। আবার সে বসল। ওই চালা ঘরে গিয়েই বা কি হবে; এ জল আটকাবে না। জোর হাওয়া দিলে হয়তো ভেঙ্গে চাপাই দেবে। আব্দুলের দাওয়াতে গেলেই বা কি হ'ত? ঝাপটায় ভিজতে হ'ত। নিজের ঘর থাকলেও—ভাঙা চাল—দেওয়ালের ফাটলের ভিতর দিয়ে জল আসত। এ নয় তার চেয়ে কিছু বেশী।

ঘন কালো মেঘ। কালো রং মিশানো সিমেণ্ট করা মেঝের মত বাহার খুলেছে। বাহবা! বাহবা! ও কি মন্দিরটা নয়? কালো আকাশের গায়ে সোণার বরণ কলস—কয়েকটা দানাবাঁধা বিজলীর মত ঝকমক করছে, তার নিচে পঙ্কের পলেস্তারা করা দুধবরণ মন্দিরের মাথা! আহা-হা-! চোথ ফেরালে সে। আকাশ জোড়া কালো মেঘের পালিশের গায়ে হলুদ-বরণ ঘরে মাধববাবুর তেতালার ঘরের সারি। সোণার বরণ বহুড়ীরা জানালা ধ'রে দাঁড়িয়ে মেঘ দেখছে। নিচের তলায় বৈঠকখানা ঘরে বাবুরা মজলিশ ক'রে বসে গরম চা খাচ্ছে। বাচ্চারা সব বারান্দায় ছুটাছুটি করছে। তার হাতে গড়া—তার হাতে গড়া ছাদ। কোন ভয় নাই, যত জোরে আসুক বৃষ্টি, এক ফোঁটা গলে পড়বে না। আনন্দ রহো, আরাম

করো। আরও একটু দৃষ্টি ফিরিয়েই—ওই আর এক টুকরো দালান—কার চিলে কোঠা—কালো মেঘের গায়ে ভাসা বাড়ীর মত মনে হচ্ছে। কবুতরেরা, কাকেরা, পেঁচারা আলসের নিচের খোপে খোপে গিয়ে ঢুকেছে; গলা ফুলিয়ে চুপ ক'রে সব ব'সে আছে। এ খোপ রাজ মিস্ত্রিরাই রাখে। থাকুন সুখে আরামে মৌজ ক'রে মালিকরা ঘরের অন্দরে, পাখীরা থাকবে খোপরে-খোপরে। থাক, তোরা আরামসে থাক। খোদাতায়লার কাছে কলকল ক'রে বলিস—জনাব আলির জনার গোনাহ্ যেন মাফ করেন। আর কোন গোনাহ তার নাই। আবার দৃষ্টি ফেরালে সে, এদিকে কোন কিছু দেখা যায় না। শুধু মেঘ—শুধু মেঘ। বাহারে! চমৎকার মেঘ তো এ দিকটার! সাদায় কালোয় যেন ভাঙা গড়া চলছে লহমায় লহমায়। ওই দিকটা দিয়েই সে সাঁওতাল পরগণা গিয়েছিল। বাঃ, সাদা মেঘ ঠিক যেন গির্জার চূড়া হয়ে উঠেছে। চাঁপার কলির মত গোল মিনার ক্রমশঃ সরু সুঁচালো হয়ে মিশে গিয়েছে। দুনিয়ার সব দুঃখ সে ভুলে গেল। দৃষ্টি ফেরালে সে আবার।

আঃ—ওই যে মসজিদ—ওই যে তার হাতে গড়া মিনার!

ঝপ ঝপ করে বৃষ্টি নেমে আসছে।

আসুক।

জনাব তাকালে মাথার উপরে—বুড়া বটগাছের পাতায় পাতায় ঢাকা গোল গম্বুজের মত মাথার দিকে। খোদাতায়লার নিজের হাতে গড়া ইমারত।

সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছে—এইটুকু ছাড়া।

মৃত্যুবাণ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

গুনিনের ওপরে শীতলার ভর হল। গাঁয়ের বারোয়ারী অশথতলা। তার নীচে পুরাণো বেদীটা প্রদীপের তেলে আর মেটে সিঁদুরে একটা বিচিত্র রঙ ধরেছে। নীল শ্যাওলার ওপর দিয়ে কালো পোড়া তেল ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ছে—একপাশে থকথকে সিঁদুর জমেছে চাপ বাঁধা রক্তের মতো। ধূনোর গন্ধে যেন নিশ্বাস আটকে আসে।

বেদীর ওপরে একখানা কালো পাথর—তার সারা গায়ে ব্রণের চিহ্ন। মারী জননীর প্রতীক। মাঝখান দিয়ে একটা প্রকাণ্ড ফাটল—দেখলে মনে হয় কেউ যেন সেটাকে দুটুকরো করে কেটে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। পৌত্তলিকতাদ্বেষী রাঢ়জয়ী মুসলমানেরই তলোয়ারের কোপ পড়েছিল কিনা কে জানে।

ফাল্গুনের রৌদ্রে উদ্ভাসিত এই ভরা দুপুরেও অশথের বিস্তীর্ণ শান্ত ছায়ার নীচে ঘনিয়েছে উগ্রগন্ধী অন্ধকার। ধুনো পুড়ছে—গুগ্‌গুল পুড়ছে। পট পট করে শব্দ হচ্ছে—কালো ধোঁয়া চক্রাকারে উঠছে সাপের কুণ্ডলীর মতো। ঢাকের গগনভেদী বোল উঠছে—ক্যান্ ক্যান্ করে তীক্ষ্ণ পেত্নীর কান্নার মতো স্বর তুলছে কাঁসর। আর তার ভেতরে বসে গুনিন একটানাস্বরে মন্ত্রপাঠ করে যাচ্ছে। তার কতকটা সংস্কৃত, কতকটা বাঙ্গালা, কতকটা দুর্বোধ্য ড় আর ট-এর সমারোহ। অশুদ্ধ উচ্চারণে জোর দিয়ে বলে যাচ্ছে: হাড় কট্টন, মাংস চর্ব্বণ—

চারিদিকে মেয়ে-পুরুষের ছোট একটা দল জমেছে। গলায় আঁচল দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেউ, কেউবা তাকিয়ে আছে বিস্ফারিত বিহ্বল দৃষ্টিতে। ঢোল আর কাঁসরের বিরামযতিতে সেই গম্ভীর মন্ত্রনাদটা যেন অলৌকিক হয়ে উঠেছে। ধূনোর ধোঁয়ায় যাদের মাথা ঘুরছে, চোখে যারা দেখছে অন্ধকার—তাদের যেন মনে হচ্ছে ওই কালো পাথরটা হঠাৎ একসারি ধারালো দাঁতশুদ্ধ কালো একখানা রক্তাক্ত মুখ মেলে দেবে, আর কড়মড় করে হাড় মাংস চিবোতে সুরু করে দেবে!

—হেই গুনিন, ভালো করে মন্তর পড় বাবা। মার অনুগ্রহ একটু না কমলে যে আর বাঁচি না।

জনতার মধ্য থেকে কার যেন সকাতর অনুনয়! গুনিন একবার পিছন ফিরে তাকালো। মদের নেশায় আর ধূনোর আগুনে চোখ দুটো রাক্ষসের মতো টকটক করছে। প্রকাণ্ড একটা গোলাকার মুখ—খাড়া খাড়া চোয়াল। মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলোয় কপালের অদ্ধেকটা ঢাকা পড়েছে।

যেমন করে ম্যালেরিয়ার ঝাঁকুনি আসে, তেমনি থরথর করে একটা কাঁপন এসে যেন গুনিনের আপাদ-মস্তক ঝাঁকিয়ে দিয়ে গেল। দুহাতে দুটো ধুনুচী নিয়ে উঠে দাঁড়ালো গুনিন—সমস্ত শরীর তার টলছে। তারপরে সুরু হল তাণ্ডব নাচ।

গুনিনের ওপরে শীতলার ভর হয়েছে। মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ করে বেরুচ্ছে একটা বীভৎস চাপা আওয়াজ। কখনো মাটিতে আছড়ে পড়ছে—পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে নেচে চলেছে রুদ্রতালে। ঝাঁকড়া চুলগুলো থেকে ধূলোর ঝড় উড়ছে। ফটাস করে একটা ধুনুচী মাটিতে পড়ে দুখানা হয়ে গেল—চারিদিকে ছিটকে গেল আগুন। 'সর সর' করে লোক পালিয়ে যেতে পথ পেল না।

গুনিন আবার উঠেছে—আবার নাচ সুরু করেছে। কিন্তু নাচের তালে কেন যেন ভাঁটা পড়েছে এবার। পা আর তেমনভাবে চলছে না। মুখ থেকে চাপা গোঙানির শব্দটা কেমন বিকৃত আর অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। জ্বলন্ত চোখ দুটো যেন ঝিমিয়ে আসছে ক্রমশ।

এবারে গুনিন থেমে দাঁড়ালো। টলমল করে কাঁপতে লাগল তার সর্বশরীর। তারপর ঠিক ইচ্ছে করে নয়—পেছন থেকে কে যেন মস্ত একটা ধাকা দিয়ে তাকে ঘাড় মুচড়ে ফেলে দিলে মাটিতে। চারপাশের জনতা চঞ্চল হয়ে উঠল। কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগছে—যা হওয়া উচিত এ.তো তা নয়। বিস্ফারিত ভয়ার্তচোখে গুনিন কিছুক্ষণ গোঁ গোঁ করতে লাগল, কষ দিয়ে ফেনার সঙ্গে বেরিয়ে এল এক ঝলক রক্ত। বলি দেওয়া পশুর মতো বার কয়েক হাত পা ছুড়েই সে সটান শক্ত হয়ে গেল। সমস্ত শরীরে ঢেউয়ের মতো দোলা দিয়ে বেরিয়ে এল অন্তিম

একটা দীর্ঘশ্বাস—নাকের সামনে থেকে খানিকটা ধুলো উড়ে গেল হাওয়ায়।

হৈ হৈ করে ছুটে এল জনতা। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে। মরে পাথর হয়ে গেছে গুনিন।

ঢাকের বোল থেমে গেল, স্তব্ধ হয়ে গেল কাঁসরের আর্তনাদ। স্তম্ভিত জনতা এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ, নিদারুণ ভয়ে একটি কথাও কেউ বলতে পারলে না।

একজন বললে নিশ্চয় অশুচি হয়ে পুজোয় বসেছিল, তাই—

ধুনোর অন্ধকারে ব্রণ-চিহ্নিত শীতলার পাথরটা গাঢ় রক্তের মতো খানিক সিঁদুর মেখে ক্ষুধার্ত হয়ে তাকিয়ে আছে। অশথের পাতায় শাঁ শাঁ একটা উদাস বাতাস বয়ে গেল। যেন একটা অশরীরী কণ্ঠ চাপা গর্জন করে বলে গেল: এবার তোদের পালা, গুনিনের মতো তোরাও—

মুহূর্তে বারোয়ারীতলা জনশূণ্য। প্রাণ নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পালিয়েছে সকলে। শুধু অসমাপ্ত পুজোর উপকরণের সামনে নিঃস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল গুনিনের দেহটা। মুখের পাশে রক্তের চাপ ক্রমে ঘন হয়ে উঠ্‌তে লাগল—ধূপ আর গুগ্‌গুলের ধোঁয়া একটা কালো পর্দার মতো নিবিড় হয়ে নামতে লাগল তার চারপাশে।

* *

গুনিনের আসল নাম অভিরাম দাস—জাতিতে অন্ত্যজ।

এই জাতিটা নাকি বর্ণসঙ্করের কঠিনতম শাস্তির প্রতীক। প্রতিলোম বিবাহকে ক্ষমা করবে না ব্রাহ্মণ-চালিত সমাজ, ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে অব্রাহ্মণকে পতিরূপে বরণ করলে তাদের সন্তান হবে অন্ত্যজ। সমাজের সমস্ত পথ তার কাছে বন্ধ হয়ে যাবে। তাকে শ্মশানে বাস করতে হবে, অখাদ্য আহার করতে হবে, মড়ার কাপড় নিয়ে লজ্জা নিবারণ করতে হবে। তাদের ছায়া মাড়ালে খণ্ডে যাবে—খয়ে যাবে সতেরোবার বিশ্বনাথ পরিদর্শনের পুণ্য।

আজকাল্ অবশ্য অন্ত্যজ মাত্রেই শ্মশানের বাসিন্দা নয়। কিছু কিছু পদোন্নতি যে তাদের হয়েছে তাতে আর সন্দেহ কী। এখন তারা ভদ্র-পাড়ার কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে কিছুটা। শুয়োর চরায়, ডালা কুলো ধুচুনি তৈরী করে, ভদ্রসমাজের দৈনন্দিনের পক্ষে সেগুলো অপরিহার্য।

কেউ কেউ ক্ষেত করে, তরিতরকারী লাগায়, বিক্রী করে বাজারে। দু'একটা ভালো ফল-ফুলুরি উপহার দিলে স্থায়রত্ব স্মৃতিরত্নেরা খুশি মনেই সেগুলো গ্রহণ করে থাকেন, অবশ্য নেবার সময় কিছু-কিছু গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেওয়া হয় তাতে। কিন্তু এছাড়াও আর একটা দিক আছে এদের। সে জন্যে ইতর ভদ্র নির্বিচারে ভয় করে এদের—শ্রদ্ধা করে। এরা মন্ত্রসিদ্ধ।

অভিরামের বাপ নিধিরাম ছিল এই তল্লাটের সেরা গুনিন। না জানত এমন মন্ত্র নেই, না পারত এমন ঝাড়ফুঁক নেই। কুকুরে কামড়েছে, একটুখানি জলপড়ায় সে তা ভাল করে দিত। সাপে ছোবল মেরেছে—পিঠের ওপর পেতলের থালা আটকে দিয়ে তার ওপর মন্ত্রপড়া মাটি ছড়িয়ে সে বিষ নামিয়ে নিত। ভূতে ধরলে তো আর কথাই নেই, নিধিরাম না গেলে কার সাধ্য সে ভূত নামায়। বাণ মারতে পারত, বাটি চালান করতে পারত, জ্বলন্ত একটা প্রদীপ আকাশে উড়িয়ে দিয়ে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পারত দূরের কোনো একটা নিশ্চিন্ত নিদ্রিত গ্রামে।

তা ছাড়া বংশানুক্রমিক ভাবে তারা বারোয়ারী শীতলার পূজারী। শুধু পূজারী নয়, দেবীর প্রসাদপুষ্ট। কোনো এক অতীত অনার্য সংস্কৃতির ধারায় অন্তত এখানে ওদের অধিকার অব্যাহত। কোন্ অনাদিকাল থেকে এরা শীতলার পুজো করে আসছে কেউ বলতে পারে না। ব্রাহ্মণের প্রবেশ নিষেধ। শোনা যায় কিছুদিন আগে তন্ত্রসিদ্ধ এক ব্রাহ্মণ এসেছিলেন গাঁয়ে। অন্ত্যজে দেবীর পুজো করে শুনে তিনি ক্ষেপে উঠলেন। বললেন, দেবী অশুচি—তাঁকে শোধন করে নিয়ে ব্রাহ্মণকে দিয়ে পুজো করাতে হবে।

গাঁয়ের লোকে নিষেধ করলে, কিন্তু দাম্ভিক তন্ত্রসিদ্ধ সে কথা শুনলেন না। দেবী শোধনের ব্যবস্থা করে পুজোয় বসলেন তিনি। আর পরমুহূর্তেই আশ্চর্যকাণ্ড। কোথা থেকে প্রকাণ্ড একটা চড় বাজের মতো শব্দ করে তাঁর গালে এসে পড়ল। অদৃশ্যহাতের সেই চড় খেয়ে ব্রাহ্মণ যে উলটে পড়ে গেলেন, আর উঠলেন না।

সেই থেকে অন্ত্যজেরা এখানে পুজো করার কায়েমি অধিকার

পেয়েছে। খাতির বেড়েছে তাদের, খ্যাতি বেড়েছে আরো অনেক বেশি। গাঁয়ের উঁচু জাতেরা অসংকোচে অন্ত্যজের দেবীকে পূজো করেন, অন্ত্যজ পূজোরীর ছোঁয়া প্রসাদ পান। আর বসন্ত চিকিৎসার ব্যাপারে অধিকার তো তাদের একচেটিয়া।

কোথা থেকে একদিন পেত্নী নামিয়ে এসে ভরা দুপুরের সময় নিধিরাম ঢকঢক করে এক ঘটি জল খেল। আর মারাও গেল তার ঘণ্টাখানিক পরেই। দু'চারজন লোকে মুখে বললে, সর্দিগর্মি, কিন্তু সকলেই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে নিলে রোজার ঘাড় ভূতেই মটকেছে শেষ পর্যন্ত।

তার ছেলে অভিরাম। বাপের মতো তারও এমনি হঠাৎ মৃত্যু ঘটে গেল। আশ্চর্য হবার কিছু নেই—এ যেন ইতিহাসের সহজ এবং স্বাভাবিক ধারা। কিন্তু তারও আগে আরো একটু গল্প আছে।

বাঙ্গালা দেশের ওপর দিয়ে মহামন্বন্তর বয়ে গেল।

যারা যাওয়ার তারা তো মরে বাঁচল, কিন্তু যারা রয়ে গেল, তাদের দুর্গতির আর সীমা রইল না। শ্মশান বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে শ্মশানের প্রেতের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল মানুষ। এক মুঠো কাঁকর মেশানো ভাত সম্বল, এক ফালি ছেঁড়া ন্যাকড়া সম্বল। রাতারাতি যেন সবাই মায়া প্রপঞ্চময় সংসারটাকে চিনে ফেলেছে—দেহে মনে, বেশে বাসে অনাসক্ত বৈরাগ্য। চোখের দৃষ্টি অর্থ-হীন—যেন বাইরের অবাস্তব পৃথিবীটার ফাঁকিটা ধরে ফেলে ব্রহ্মলাভের জন্যে একান্তভাবে অন্তর্মুখী হয়ে গেছে।

শাস্ত্রে বলেছে সবই যখন 'নলিনীদলগতজলমিব'—তখন একটি মাত্র ভরসা আছে। সেটি হচ্ছে সাধুসঙ্ঘ এবং তার দ্বারাই ভবার্ণব পার হওয়া যায়। এবং ঈশ্বর করুণাময়—সাধুসঙ্ঘ তিনি পাঠালেন।

দুর্ভিক্ষ যখন শেষ হয়ে গেল তখন দেশের লোককে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সরকারী ধানের গোলা বসতে লাগল এখানে ওখানে। এল লাইসেন্সপ্রাপ্ত সরকারী এজেন্টের দল—মহাজনের করাল গ্রাস থেকে দেশকে বাঁচাবার মহৎ ব্রত নিয়েছে তারা। তার সঙ্গে এল সিভিল সাপ্লাই ইন্সপেক্টার, এল বোট অফিসার, এল এনফোর্সমেণ্ট—কে এল এবং কে এল না!

এখান থেকে বারো মাইল দূরে ধান-চালের মস্ত বড় একটা গঞ্জ। তার পাশ দিয়ে যে নদী, বর্ষার সময় ছাড়া তাতে নৌকো চলে না। হাঁটু জলের ওপর যে পরিমাণে কচুরির স্তূপ জমে ওঠে, তা'তে বরং মোটর চালিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু নৌকোর প্রশ্ন অবান্তর। অতএব—

অতএব রাস্তা তৈরী করতে হবে।

সে কাজ নিলে কৃষ্ণপ্রসাদ। গৌরী সেনের টাকা—অফুরন্ত এবং অকৃপণ। একবার টেণ্ডার নেওয়াতে পারলে আর ভাবনা নেই। পরবর্তী পথটুকু মসৃণ—তৈলাক্ত।

ধানের আল আর মজা দীঘির পাশ দিয়ে কৃষ্ণপ্রসাদ সাইকেল চালিয়ে এল। বারোয়ারী অশথতলায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালো। ভারী ভালো লাগছে ঠাণ্ডা ছায়া আর ঠাণ্ডা বাতাসটা।

—আপনি, হুজুর?

মস্ত একটা প্রণাম জানিয়ে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে অভিরাম।

—আমি? বাঁ হাতটাকে হাফপ্যাণ্টের পকেটে পুরে কৃষ্ণপ্রসাদ সিগারেটের ধোঁয়া উড়াতে লাগল। বললে, সরকারী লোক। রাস্তা করতে হবে এখানে--আঠারো মাইল মোটরের রাস্তা। সরকারী লরী যাবে, গাড়ি যাবে, বুঝেছ?

—রাস্তা হুজুর?

—নিশ্চয়। মুখস্ত করা বুলির মতো কৃষ্ণপ্রসাদ বলে গেল: দেশের ভালোর জন্যেই। ধানচালের ইজি সাপ্লাই হবে—গ্রামের উন্নতি হবে, ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষের পথ বন্ধ হবে। একেবারে পাকাপাকি বন্দোবস্ত।

অভিরাম বিস্মিতমুখে তাকিয়ে রইল। কৃষ্ণপ্রসাদ যেন আকাশ থেকে কথা বলছে। দেশটাকে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে নিস্তার দেবার জন্য স্বর্গ থেকে মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছে হাফপ্যাণ্টপরা সাইকেলধারী একটি দেবতা। অশথতলায় পাথরের শীতলা নিদ্রিত হয়েই আছেন, কিন্তু ইনি যেমন জাগ্রত, তেমনি মুখর।

ভাবতে পারা যায় রাস্তা তৈরী হবে এই গ্রামের মধ্য দিয়ে? যেখান দিয়ে কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে রেল গাড়ি চলে যায়, তার চাকায় চাকায় চলে মুখর সভ্যতার গর্জন, সে এখান থেকে কতদূরে! একটা মরা নদীর

খেয়া, তিনখানা হাট, ছ'খানা মাঠ, আরো এক ক্রোশ জেলাবোর্ডের পথ। এখানকার মানুষ যেন রাস্তা বেঁধেছে জীবনের তটতীর থেকে বিচ্ছিন্ন একটা দ্বীপের মধ্যে। একটা প্রাইমারী ইস্কুল - সেও দু'মাইল দূরে। রাত্রির অন্ধকারে বহু দূর থেকে যেমন মহানগরীর মাথার ওপরে একটা অস্বচ্ছ জ্যোতির্মণ্ডল দেখা যায়, এখান থেকেও তেমনি নাগরিক জীবনের একটা দুর্লক্ষ্য জ্যোতিঃসংকেত অনুভব করা চলে মাত্র। তবু চৌকীদারী ট্যাক্স আসে; তামাকের ওপরে, দেশলাইয়ের ওপরে নতুন খাজনা আসে, শহরের তৈরী লোভের কারখানা থেকে মন্বন্তর আসে। এখানে আমদানী নেই—এ শুধু রপ্তানির দেশ।

এখানে রাস্তা হবে, গ্রামের উন্নতি হবে।

কি রোমাঞ্চকর অনুভূতি! শুধু অভিরাম নয়, অভিরামের তো দু'চারজন নয়। সমস্ত গ্রামটাই আনন্দিত বিস্ময়ে সজাগ হয়ে উঠল। আর সেই বিস্মিত আনন্দকে তটস্থ করে দিয়ে মাঠের পাশ দিয়ে একরাশ তাঁবু পড়ে গেল। যেন উড়ে এল হাওয়াতে!

পাঁচশো বছর আগে শীতলার থানে মুসলমানের তলোয়ারের ঘা পড়েছিল—তারপরে আর কোনো জীবন চাঞ্চল্য জাগেনি এখানে। পাঁচশো বছরের মরা গাঙে নতুন করে জোয়ার এল। সেদিন এসেছিল রাষ্ট্রবিপ্লবে, আজ এল মন্বন্তরে।

অশ্বত্থগাছের ঠাণ্ডা ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে হীরালাল বাগ্দী বললে, কারবারটি একবার দেখেছ গুনিন ভাই?

অভিরাম সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিল। বললে হু

—উঃ কী পেল্লায় কাণ্ড করছে রে বাবা। বনজঙ্গল গাছ পালা সব লোপাট করে দিয়ে সড়ক বানাচ্ছে। মানুষের নাকি আর ভাতের দুঃখু থাকবে না। এই যদি মনে ছিল-রে বাপু, তা হলে কটা দিন আগে এলিনে কেন? সব সাবাড় করে দিয়ে—

—তখন তো ওদের সময় হয়নি।

—ওদের সময় হয় একটু দেরীতে, তাই না?—হীরালাল রসিকতার চেষ্টা করলে: সিঁদেল চোরে সব লোপাট করে নিয়ে তিন মাইল ডাঙা পেরিয়ে গেলে চৌকিদারে এসে হাঁক পাড়ে।

অভিরাম জবাব দিলে না—কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। সামনে যা চলছে তা প্রলয়কাণ্ডই বটে। পাথরের মতো শক্ত টিলা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে—সাফ হয়ে যাচ্ছে জঙ্গল, আদ্যিকালের পচা ডোবাগুলো দেখতে দেখতে ভরাট হয়ে গেল, আর নাকি ম্যালেরিয়া থাকবে না দেশে। শাবল, গাঁইতি, কোদাল। একশো কুলি খাটছে—শব্দ উঠছে ঝপ্-ঝপ্ ঝপাস, ঠন-ঠন ঠনাঠ্ঠন। কোদালের মুখে মাটির তলা থেকে বাদামী রঙের মানুষের হাড় উঠে আসছে, পাঁচশো বছর আগেকার হাড় কি-না কে জানে!

চোখ দুটোকে হঠাৎ সঙ্কুচিত করে আনলে অভিরাম। মোটা মোটা ভ্রূদুটো এক সঙ্গে এসে যোগ হয়ে গেল, তার ওপরে রেখা ফুটল একটা অর্ধবৃত্তের আকারে।

—লক্ষণ আমার ভালো লাগ্ছে না হীরু।

—কেন গুনিন ভাই, কেন?

কী জানি কেন। অভিরাম নিজেও জানে না। হয়তো এই আকস্মিকতাকে ভয়—হয়তো এই নতুনকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। গাঁইতি আর কোদালের মুখে পুরোনো মাটি যেন যন্ত্রণায় কেঁদে উঠছে, যেন অভিশাপ দিচ্ছে। অথবা এ হয়তো ওর রক্তার্জিত সংস্কার। আকাশে বাতাসে যেসব অশরীরী শক্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই সভ্যতা বর্জিত নগণ্য গ্রামে যাদের ছিল একাধিপত্য; রাতদুপুরে যারা অকারণে ঝপঝপ সর সর করে প্রকাণ্ড বটগাছের ডালপালাগুলোকে ঝাঁকিয়ে দিত, ভরা অমাবস্যায় মড়ার মাথা নিয়ে যারা শ্মশানে খটাখট করে গেণ্ডুয়া খেলত আর খিলখিল্ করে হাসত, কিংবা পুরোনো দীঘির ধারে যাদের মুখে লকলক করে আগুন জ্বলে উঠত—তারাই কি প্রেতসিদ্ধ গুনিনের অনুভূতির ওপরে সঞ্চারিত করছে তাদের অলৌকিক প্রতিবাদ?

রহস্যময় মুখখানাকে আরো রহস্যময় করে গুনিন বললে, সে যাক।

ওদিকে রাস্তা তৈরী হয়ে চলেছে; চমৎকার রাস্তা—উঁচু নীচু অসমতল মাটিকে দীর্ণবিদীর্ণ করে দিয়ে সরকারী লরীর মসৃণ মনোরম চলবার পথ। রাজপথ। কিন্তু কাজ এগোতে পারছে না। কৃষ্ণপ্রসাদ

হিসেব করে দেখলে এভাবে চললে বাঁধা সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হবে না। ওপরওয়ালা আর কর্তাদের কাছ থেকে তাগিদের পর তাগিদ আসছে। অতএব আরো লোক চাই। ঝড়ের গতিতে কাজ শেষ করো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পথ তৈরী করে দাও। যুদ্ধ—খাদ্য-সংকট—এমার্জেন্সি।

কুলির জন্যে খবর গেল সদরে। কিন্তু কুলিরও বাজার দর বেড়েছে—বর্মা থেকে আসামফ্রন্ট পর্যন্ত তাদের চাহিদা। আরো এই অজগর বিজেবনে লোক পাঠানোর বন্দোবস্ত করতে শক্ত। সুতরাং সদর থেকে পাল্টা খবর এল : লোকাল রিক্রুট করো।

কৃষ্ণপ্রসাদের স্বর্গীয় আভিজাত্য আর রইল না। খাকি হাফপ্যাণ্টের নীচে হাঁটু পর্যন্ত জমে উঠল ধূলো। ঘরে ঘরে তাগিদ পড়ল : এসো তোমরা, কাজে লেগে যাও সবাই।

সকলের হয়ে এগিয়ে এল অভিরাম।

—কুলির কাজ আমরা করব না হুজুর।

বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধহয়ে কৃষ্ণপ্রসাদ বললে কেন ?

—আমাদের বাপ-পিতেমো কখনো মাটিতে কোদাল মারেনি—ছোট কাজ করেনি। সে পারে ছাতুর', আমরা পারব না।

—ছোট কাজ! কৃষ্ণপ্রসাদ হেসে উঠল হা হা করে। একবেলা খেতে জোটে না—আভিজাত্যের জ্ঞানটা টনটন করছে একেবারে। ঢোঁড়া নয়, হেলে সাপ ; কুলোপানা চক্কর নয়—বারকোশপানা।

কিন্তু পরক্ষণেই বেদনায় কৃষ্ণপ্রসাদের গলার স্বর যেন ভারী হয়ে গেল। ছিঃ, ছিঃ এ কী কুবুদ্ধি তোদের। গায়ে খাটবি, পয়সা পাবি, এতে অপমানের আছে কী। এই জন্যেই না বাঙালীর এমন দুর্দ্দশা। আর এই ঘরপোড়া দুবুর্দ্ধির জন্যেই তো এত লোক না খেয়ে শুকিয়ে মরল। অথচ পশ্চিম থেকে হিন্দুস্থানী কুলি এসে কীভাবে যে বাঙলা দেশকে লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে—

পাঁচ মিনিট একটা দীর্ঘ টানা বক্তৃতা। উদারা, মুদারা এবং তারায়। ঘুরে-ফিরে অতি কোমল নিখাদে যখন যুক্তিপূর্ণ ভাষণটা সমাপ্ত হল, দেখা গেল আবেগে কৃষ্ণপ্রসাদের চোখের কোণায় কোণায় জলের বিন্দু দেখা দিয়েছে।

—এখনো ভেবে দ্যাখ সবাই। এক বেলাও তো পেট পুরে ভাত জুটছে না তোদের। অথচ কুলিগিরি করে যা মজুরী পাবি তাতে—

অর্ধভুক্ত ক্ষুধিত চোখগুলো লোভে জ্বলজ্বল করে উঠল। দৃষ্টির সামনে ঝলক দিয়ে গেল সোনালি মরীচিকা। সত্যিই তো, এতে অন্যায়টা তাদের কোন্‌খানে। জমিতে যদি লাঙল ঠেলতে পারে, তাহলে কোদাল মারায় মহাভারত সত্যিই কিছু অশুদ্ধ হয়ে যাবে না!

অভিরাম মাথাটি ঝাঁকিয়ে বললে, কিন্তু বাবু—

কিন্তু লোকচরিত্র বোঝে কৃষ্ণপ্রসাদ। অভিরামের সর্বাঙ্গে বিদ্রোহ ঘনিয়েছে—গাঁয়ের লোকের ওপরে তার অপ্রতিহত প্রতিপত্তি, অন্য নতুন লোক এসে সে অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে এটা সে কল্পনাই করতে পারছে না। কিন্তু তার আধিপত্যটা আধ্যাত্মিক—আধিভৌতিক প্রয়োজনের দাবীটা ঢের ঢের বেশি এবং বাস্তব—এই সহজ কথাটুকু বোঝবার বুদ্ধি কৃষ্ণপ্রসাদের আছে।

ঠোঁটের কোণা দুটো একটু বিস্তৃত করে কৃষ্ণপ্রসাদ তীক্ষ্ণ সর্পিল হাসি হাসলে। অভিরাম ছাড়া আর সমস্ত মানুষগুলির মুখই একাকার হয়ে গেছে। অলৌকিক ভীতি নয়—লৌকিক ক্ষুধা। লোভে এবং দ্বিধায় তারা বিচলিত হয়ে উঠেছে। মুহূর্তের জন্যে কৃষ্ণপ্রসাদ অনুভব করলে অভিরাম তার প্রতিদ্বন্দ্বী, তার ক্ষমতালাভের পথে প্রতিপক্ষ। কিন্তু কৃষ্ণপ্রসাদের হাসিটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে আরো খানিকটা বিকীর্ণ হয়ে পড়ল: শেষ পর্যন্ত জয় হবে তারই।

পকেট থেকে কালো চামড়ার নোট বই বেরুল।—বলো, কে কে রাজী আছো।

একবার কৃষ্ণপ্রসাদ আর একবার অভিরামের মুখের দিকে তাকালো সকলে। অভিরামের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, শক্ত হয়ে উঠেছে খাড়া চোয়াল। যেন যে নাম লেখাবে, বাঘের মতো তারই ঘাড়ের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়বে সে।

কিন্তু জয় হল অপদেবতার নয়—সরকারী কণ্ট্রাক্টারের। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল নিষ্কম্প স্তব্ধতায়। তারপর গলাটা সাফ করে নিয়ে হীরালাল বললে, লিখুন—

অভিরাম নড়ে উঠল। দুটো চোখ থেকে এক ঝলক আগুন বৃষ্টি করলে যেন। তারপর হনহন করে হেঁটে চলে গেল।

এবারে শব্দ করে হেসে উঠল কৃষ্ণপ্রসাদ: লোকটা পাগল নাকি?

গাঁয়ের লোক সে হাসিতে যোগ দিল না।

গুনিনের চোখের সামনে দিয়েই সরকারী রাস্তা তৈরী হয়ে চলল। সবাই খাটে সেখানে হীরালাল, মতিলাল, জনক। তিনচার দিনের মধ্যেই হালচাল বদলে গেছে তাদের। রাতারাতি সব বড় মানুষ। গাঁয়ের দুঃখ দূর হল এতদিনে। কৃষ্ণপ্রসাদের বক্তৃতায় ফাঁকি নেই। দেশের দুঃখে ঝরে-পড়া তার চোখের জল যে নিঃসন্দেহ আদি এবং অকৃত্রিম, এ সম্পর্কে মনে আর কেউ সন্দেহ পোষণ করেন না।

এক পয়সার বিড়ি জুটত না কোনকালে পোড়া বিড়ি কুড়িয়ে নিয়ে ধূমপানের তৃষ্ণাটা নিবারণ করত জনক। সেই এসে হাজির হল এক বাক্স সিগারেট নিয়ে। বললে, নাও গুনিন—একটা সিগারেট নাও। ভালো জিনিস—ঠিকাদারবাবু দিয়েছে।

অসীম বিরক্তিভরে অভিরাম বললে, নাঃ।

—না? কেন, আপত্তিটা কিসের? সত্যি দাদা, তুমি ঠকলে। খালি ভূত ঝাড়লেই কি পেটের ব্যবস্থা হয় আজকাল? চলে এসো, আমাদের সঙ্গে দুকোপ মাটি তোলো, দিন-মজুরী দুটো টাকা তোমার রোখে কে?

—একটা চড় মেড়ে তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।

আস্তে আস্তে জনক পিছু হটতে লাগল। ভীরু গলায় বললে, কেন—কেন অন্যায়টা কী বলেছি, সবাই যখন দু-পয়সা করে নিচ্ছে—

দু পয়সা!—হঠাৎ রাক্ষসের মতো গলায় গুনিন গর্জে উঠল: নিজের মান-সম্মান বিসজ্জোন দিয়ে অমন পয়সার মুখে লাথি মারি আমি। ভাবিসনি, এ সুখ তোদের সইবে। মা শীতলে জেগেই আছেন—জানলি, ধর্মের গাঁয়ে এ অধর্মো তিনি সইবেন না।

জনকের বুকের মধ্যটা কেঁপে গেল। শাপ দিচ্ছে নাকি গুনিন! মন্ত্রসিদ্ধ ভূতসিদ্ধ লোক সে, তার অসাধ্য কুকাজ নেই। একি শুধু কথার কথাই—না এমনিভাবে দেশশুদ্ধু লোকের সর্বনাশ করবার মতলব আঁটছে সে! কিন্তু কেন? এমন কি অপরাধ করেছে তারা। ঘরের ভেতর

ছটফটিয়ে মরলেও যখন একটিবার কেউ ডেকে জিগ্যেস্ করে না কিংবা এক ফোঁটা জল দেয় না খেতে, তখন গায়ে গতরে খেটে দুটো পয়সা রোজগার করলে কার কী বলবার আছে। অথচ কেন এমন করছে গুনিন, কেন সে এমন-ভাবে হিংস্র হয়ে উঠেছে! জনক কিছু বুঝে উঠতে পারল না।

কিন্তু সর্বের মধ্যেই যে ভূতে ধরেছে সে খবর অভিরামের জানা ছিল না।

সন্ধ্যার সময় গুনিনের বউ পদ্মা এসে সামনে দাঁড়াল। বললে, একটা কথা বলব?

কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে অভিরাম ডালা বুনছিলো। বললে, কী বলবি?

গাঁয়ের মেয়েরা তো সবাই রাস্তায় কাজ করতে যাচ্ছে। দু'পয়সা পাচ্ছেও। তাই—

তাই?—হাতের ডালাটা নামিয়ে রেখে সন্দিগ্ধ উগ্র চোখে তাকালো অভিরাম। চোয়ালের হাড় দুটো কঠিন হয়ে উঠেছে, মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলো নেমে এসেছে কপাল ছাড়িয়ে। অগ্নিগর্ভ স্বরে বললে, তাতে কী হয়েছে!

ডালা-কুলো বেচে আর ভূত ঝেড়ে তো সংসার চলে না। যা আকাল পড়েছে! আমিও যদি ওখানে গিয়ে কাজ করি, তা হলে অন্তত একটা করে টাকা—

অভিরাম তীরের মতো খাড়া হয়ে দাঁড়ালো।

—খবরদার, খবরদার পদ্মা ওকথা আর একবার মুখে আনবি তো সোজা খুন হয়ে যাবি। গুনিনের বংশ আমরা। মা শীতলের দয়া আমাদের ওপরে। ঘরে না খেয়ে মরে থাকবো সে-ও ভালো; কিন্তু ওসবের মধ্যে আমরা নেই। গোলামী করি না আমরা—ছোট কাজ করি না।

অন্ত্যজের ঘরের সুন্দরী বউ পদ্মা ঠোঁট ওলটালো। স্বাস্থ্যপুষ্ট কালো শরীরটা যেন নদীর জলের মতো ছলছলিয়ে উঠল চাঞ্চল্যে এবং অবিশ্বাসে।

—তোমার মান নিয়েই তুমি গেলে। সবাই যখন কাজ গুছিয়ে নিলে, তখন—

পদ্মাকে মারবার জন্যে একটা ব্যাঘ্রমুষ্টি তুললে অভিরাম। আর সেই মুহূর্তেই বাইরে থেকে ডাক পড়ল ; গুনিন—গুনিন ?

—কে ?

অপরাধী গলায় উত্তর এল : আমি হীরালাল।

একটা ঘোমটা টেনে ঘরের মধ্যে সরে গেল পদ্মা, আর কেরোসিনের অনুজ্জ্বল আলোর সামনে হীরালাল এসে দাঁড়ালো। চোখ দুটো ভীতিতে বিস্ফারিত এবং বিহ্বল।

—কী হয়েছে ?

—একবার এসো ভাই। আমার বড় মেয়েটার যেন কী হয়েছে। জ্বর নেই, জারি নেই, সন্ধ্যে থেকে কেবল তড়পাচ্ছে আর থেকে থেকে চোখ উলটে আসছে। তুমি একবার চলো !—হীরালালের গলা কান্নায় কাঁপছে।

হুঁ, এবার গুনিনকে মনে পড়েছে তা হলে।

রাগ কোরোনা ভাই, চলো। তুমি রাগ করলে আমরা কোথায় দাঁড়াই।

একটা বিরাট আত্মপ্রসাদে ভরে উঠল অভিরামের মন। খালি কৃষ্ণপ্রসাদ নয়, তারও দাম আছে, তারও প্রয়োজন আছে। এ তাদের বংশগত অধিকার, মা-শীতলার অনুগ্রহে আধিব্যাধি সারাবার দায়িত্ব একমাত্র তাদেরই। পেটের ক্ষিদে মেটাবার লোভ দেখিয়ে কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রামের লোককে বশীভূত করতে পারে, কিন্তু যে শত্রুকে চোখে দেখা যায় না, তার বেলায় মা ওলাইচণ্ডী আর মা শীতলার যে সমস্ত অনুচর দৃষ্টির অলক্ষ্যে মৃত্যুবাণ নিয়ে ঘুরছে, তাদের হাত থেকে বিপন্ন মানুষকে রক্ষা করতে পারে কে ? অন্ধকার শ্যাওড়া গাছে যাদের আস্তানা কিংবা এলোচুলে ভর সন্ধ্যেতে পুকুর ঘাটে গেলে যাদের নজর পড়বেই—কোনো সরকারী ঠিকাদারের সাধ্য নেই যে মুঠো মুঠো টাকা ছড়িয়ে দিয়ে তাদের বশীভূত করতে পারে।

ছোট বেতের ঝাঁপিটা তুলে নিয়ে অভিরাম বললে, চলো।

হীরালালের দাওয়ায় তখন লোকারণ্য। ছোট মেয়েটা পাগলের মতো ছটফট করছে, গড়াচ্ছে, কষ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফেনা। অমানুষিক

দুটো বড় বড় চোখ মেলে তাকাচ্ছে, আর থেকে থেকে উঠছে প্রচণ্ড এক একটা হিক্কার ধমক। হীরালালের বউ মড়া-কান্নার রোল তুলেছে তারস্বরে।

কটমট করে খানিকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল অভিরাম। তারপর সংক্ষেপে বললে, হুঁ, পেত্নীতে পেয়েছে।

বাড়িময় কোলাহল—কান্নার রোল আরো প্রবল হয়ে উঠল। গুনিন প্রকাণ্ড একটা ধমক দিয়ে বললে, চুপ। কিছু সর্ষের জোগাড় করো।

ভূত ঝাড়া সুরু হল। সর্ষের পর সর্ষের প্রহার সর্বাঙ্গে জলের ছিটে। কিন্তু পেত্নীর নামবার লক্ষণ নেই। মেয়েটা তেমনি করেই দাওয়াময় গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। থেকে থেকে এমন এক একটা হিক্কা উঠছে যে, সন্দেহ হয় কখন তার দম আটকে যাবে।

অভিরামের কপালে ঘাম জমে উঠতে লাগল। সংশয়ে ভরে যাচ্ছে মন। কিছুতেই কিছু হবার লক্ষণ নয়। সমস্ত বাড়িময় কালো অন্ধকার ঘনিয়েছে—ছোট আলোটা মিট মিট করছে, নিবে যাবে এক্ষুনি। আর সেই অস্পষ্ট আলোয় মেয়েটার দুটো ভয়াবহ চোখ দেখে তারই অন্তরাত্মা শিউরে উঠল। কামরূপ-কামিখ্যের ডাকিনীর আদেশ কোনো কাজে লাগছে না, বাঁচানো গেল না মেয়েটাকে।

টর্চের জোরদার আলো পড়ল প্রায়ান্ধকার প্রাঙ্গণে। জুতোর মচমচ শব্দ করে এসে ঢুকেছে কৃষ্ণপ্রসাদ। সঙ্গে আরো একটি ভদ্রলোক।

কৃষ্ণপ্রসাদ হাসল: তোমার মেয়ের অসুখের খবর শুনে ডাক্তার নিয়ে এলাম হীরালাল। আমারি বন্ধু—এদিকে কাজে এসেছিলেন। সুবিধেই হলো তোমার।

হীরালাল দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বললে, গুনিন্ ওকে ঝাড়ছিল কিনা হুজুর তাই—

ডাক্তার তাচ্ছিল্যভরে বললে, হ্যাং ইয়োর গুনিন। ওসব বুজরুকিতে কাজ চলে না, রোগও সারে না। তোমার ওই ঝুলি কাঁথা নিয়ে সরে দাঁড়াও তো বাপু, আমি একবার দেখি।

বিদ্রোহী ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকিয়ে অভিরাম বসে রইল। এক তিল নড়ল না।

কৃষ্ণপ্রসাদ টর্চের আলোটা অভিরামের মুখের ওপর ফেলল : একটু সরে বসো তুমি। অনেক তো করলে, কিছু পারলে না দেখতেই পাচ্ছি। এবার ডাক্তারবাবুকে দেখতে দাও।

অভিরাম তবুও নড়ে না। বললে, আমাকে ডেকে এনেছে হীরালাল। আমি ঝাড়ব একে—কোনো ডাক্তার-ফাক্তারের পরোয়া রাখি না আমি।

—ননসেন্স—ইডিয়ট!—নতুন ডাক্তারের ধৈর্যচ্যুতি হল : রোগীকে মেরে ফেলবে নাকি লোকটা? এদের নামে ক্রিমিন্যাল কেস্ করে দেওয়া উচিত!

অভিরামের মাথায় চড়ে গেল রক্ত, আর উদ্বেলিত সেই রক্তের উচ্ছ্বাস যেন ফেটে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম করলে দুটো চোখের মধ্য দিয়ে। একটা অশ্লীল গাল দিয়ে অভিরাম বললে, খবর্দার!

মুহূর্তে কোথা থেকে কী হয়ে গেল! ডাক্তার সজোরে জুতো শুদ্ধ একটা প্রকাণ্ড লাথি বসিয়ে দিলে অভিরামের বুকের ওপরে। ভূত ঝাড়বার সরঞ্জামগুলোতে বিপ্লব ঘটিয়ে তিন হাত দূরে ছিটকে পড়ল অভিরাম। ব্যাপারটা যেন ভোজবাজী—এমন একটা কিছু যে ঘটতে পারে এ যেন কল্পনার অতীত।

জনতা নিঃশব্দ এবং নির্বাক। কৃষ্ণপ্রসাদ বললে, ছিঃ ছিঃ সেন, করলে কী!

সেন তখন রোগীর ওপরে ঝুঁকে পড়েছে নির্বিকার মুখে। শান্ত গলায় জবাব দিলে, যা করা উচিত, তাই করেছি। শূয়োরের বাচ্ছাটা পেসেণ্টকে মেরে ফেলবার উপক্রম করেছিল—তার ওপরে আবার লম্বাই চওড়াই! চৌধুরী, এক কাজ করো—কালই ওই স্কাউণ্ড্রেলটাকে হ্যাণ্ড্-ওভার করবার বন্দোবস্ত করে দিয়ো। রেগুলার মার্ডারার! কত লোককে এই ভাবে মেরে ফেলেছে কে জানে।

কিন্তু সেন ঠিক সময়মতোই এসে পড়েছিল। একটা ইঞ্জেকৃশনেই রোগী স্বাভাবিক হয়ে উঠল আস্তে আস্তে, হিক্কার প্রকোপটা কমে গেল ক্রমশ। উঠে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ডাক্তার বললে, অল্ রাইট—ক্রাইসিস কেটে গেছে। বাই দি বাই, সে জোচ্চোরটা গেল কোথায়?

ডাক্তারের লাথি খেয়ে অন্ধকার উঠানে ছিটকে পড়েছিল গুনিন। কিন্তু সে নেই, কোন ফাঁকে সে উঠে গেছে কেউ টেরও পায়নি।

রাত ঝম ঝম করছে। একফালি অনুজ্জ্বল চাঁদ উঠেছে আকাশে, তার আলোয় দেখা যাচ্ছে মাঠের ওপারে কতগুলো শাদা পাখীর মতো তাঁবুগুলো ঘুমন্ত হয়ে আছে। একটু আগেই জোরালো আলো জ্বলছিল ওখানে, আসছিল কুলিদের দুর্বোধ্য গান, আর ঢোলের কলরব। কিন্তু এখন নীরব হয়ে গেছে সমস্ত, মিশিয়ে পড়েছে যেন গভীর একটা অবসাদের মধ্যে। তার সামনে সাদা একটা সাপের মতো পড়ে রয়েছে নতুন পথ—রাজপথ। ওই পথ—ওই সাপটার বিষনিশ্বাস অনুভব করছে অভিরাম—তার সর্ব্বাঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে, যেন জ্বলে যাচ্ছে সমস্ত।

বুকের ভেতরে তখনো টনটন করে একটা ব্যথা চমক দিয়ে যাচ্ছে—জোর লাথি মেরেছে ডাক্তার। গুনিন বিছানা ছেড়ে উঠে বসল। পাশে মড়ার মতো অঘোরে ঘুমুচ্ছে পদ্মা।

অভিরাম উঠে আলো জ্বালালো। ঘরের এক কোনা থেকে বার করলে লাল কাপড়ের একটা পুঁটলি। অসহ্য উত্তেজনায় তার হাত কাঁপছে—তার চোখে তীক্ষ্ণ আর শাণিত হয়ে উঠেছে হত্যাকারীর দৃষ্টি। শুধু একজন মানুষকে সে খুন করবে না—শুধু ওই ডাক্তারকেই নয়। এই পাপকে—এই লাঞ্ছনা আর অপমানের হেতুকে ঝাড়ে মূলে উচ্ছন্ন করবে সে।

একটা কালো বোতলের মধ্যে কতগুলো শাদা গুঁড়ো সে চোখের সামনে তুলে ধরল। কৃষ্ণপ্রসাদ কল্পনা করতে পারে না, ডাক্তারের ভাববারও ক্ষমতা নেই—ওই বোতলটার মধ্যে বন্দী হয়ে আছে দেশব্যাপী মহামারী। ওই বোতলের সাদা গুড়োগুলো আর কিছু নয়—বসন্তের বীজ—শুকনো গুটির মামড়ী। এগুলো ওরা সংগ্রহ করে ওষুধে লাগাবার জন্যে—আর সময় বিশেষে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্যে। অবিশ্বাসীকে কঠিন শাস্তি দেবার জন্য গুনিনেরা বহুবার ওই মৃত্যুবিষ বর্ষণ করেছে তার বাড়ীতে—কদিনের মধ্যেই পাওয়া গেছে হাতে-নাতে প্রত্যক্ষ ফল। বহুদিন পরে ওই মারণাস্ত্র প্রয়োগ করবার প্রয়োজন এল আবার। বোতলের কারাগারে যে মৃত্যু-রাক্ষস বন্দী হয়ে আছে, একবার ছাড়া পেলে

সে আর ক্ষমা করবে না—নিঃশেষে গ্রাস করে যাবে সমস্ত। ওই ডাক্তার—ওই কৃষ্ণপ্রসাদ—ওই কুলিদের উপনিবেশ, দুদিনের মধ্যেই মৃত্যুর কলরবের মধ্যে তলিয়ে যাবে সমস্ত।

নিঃশব্দে ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়ে অভিরাম বাইরে বেরিয়ে এল। ম্লান জ্যোৎস্নায় পাড়ার কুকুরগুলো গুনিনের একটা দীর্ঘ ছায়ামূর্তি দেখে আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল—পরমুহূর্তেই থেমে গেল আবার। সন্ধ্যাবেলা কারা যেন শূয়োর পুড়িয়েছিল—এখনো পোড়া মাংস আর পোড়া কাঠের গন্ধ বাতাসে সমাকুল হয়ে আছে। বড় একটা যজ্ঞ ডুমুরের ঝুপসী গাছ থেকে একটা কাক বোধ হয় স্বপ্ন দেখেই জড়িত কণ্ঠে ডেকে উঠল—রাত্রে কাকের ডাক অত্যন্ত দুর্লক্ষণ! কা—কা—কা—। গুনিনের মনে হল, যেন বলছে : খা—খা—খা—

অন্ধকার শীতলার থানের দিকে এগিয়ে চলল অভিরাম। ঝুরি-নামা অশ্বথ গাছের পাতায় প্রেতাত্মার দীর্ঘশ্বাস। বাইরের জ্যোৎস্নার আক্রমণে পলাতক তমিস্রা যেন এখানে এসে ঘনীভূত আশ্রয় নিয়েছে। শীতলার থানের ওপর গুচ্ছে গুচ্ছে জোনাকি জ্বলছে—যেন রাক্ষুসে দেবতা সহস্র সহস্র চোখের আগুন শাণিত করছে সমস্ত পৃথিবীর ওপরে ছড়িয়ে দেবার জন্যে।

মাঠের ওপারে দেখা যাচ্ছে নতুন রাস্তা—জ্যোৎস্নায় রহস্যাতুর রাজপথ। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশকে বাঁচাবার জন্যে রাজকীয় প্রতিশ্রুতি। সিভিল সাপ্লাইয়ের শুভ-বুদ্ধিতে গৌরী সেনের টাকার সদাব্রত। তার ওপারে তাঁবুর সমারোহ—কৃষ্ণপ্রসাদের উপনিবেশ।

শীতলার থানে একটা প্রণাম করলে গুনিন। কল্পনা করে নিলে বিস্ফোটক-ভূষিতা দেবীর করালীমূর্তি। সারা গায়ের ক্ষত-চিহ্ন থেকে রক্ত আর পুঁজ গড়িয়ে পড়ছে। এক হাতে মারণশূর্প—তার বাতাসে মহামারীর বিষ উড়ে যাচ্ছে দেশে দেশে। গর্দভাসীনা দেবীর প্রসারিত জিহ্বা থেকে রক্ত পড়ছে গড়িয়ে।

গায়ের রোমগুলো রুদ্ধ উত্তেজনায় কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠেছে। ম্লান জ্যোৎস্নায় দীর্ঘ ছায়া ফেলে ফেলে অভিরাম অদৃশ্য হয়ে গেল।······

······তার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত।

শহর থেকে বন্দোবস্ত বা ডাক্তার আসবার আগেই কৃষ্ণপ্রসাদের কলোনীতে বসন্ত সুরু হল। অতএব—

ভীত কৃষ্ণপ্রসাদ বললে, স্ট্রাইক দি টেণ্ট্!

নতুন পথ অসমাপ্ত রেখেই কৃষ্ণপ্রসাদের দলবল পিছিয়ে গেল দশমাইল দূরে। বিলীয়মান গোরুর গাড়ীর সারির দিকে তাকিয়ে পিশাচের মতো হাসল অভিরাম। তার জয় হয়েছে। দেবী তার সহায়—জয় তার নিশ্চিত।

কিন্তু মহামারীর রাক্ষসটা কৃষ্ণপ্রসাদের তাঁবুতেও আর সীমাবদ্ধ রইল না। নির্বিচারে তার ক্ষুধা বিস্তীর্ণ হয়ে এল গ্রামের দিকে। যারা বাইরে থেকে এসেছিল তারা পালিয়ে বাঁচল, কিন্তু যাদের বাইরে যাবার জায়গা নেই—বসন্তের আক্রমণ তাদের ওপরেই ভেঙে পড়ল অনিবার্যভাবে।

এবার কোথায় গেল কৃষ্ণপ্রসাদ, কোথায় গেল কে। অভিরাম ছাড়া আর উপায় নেই কারো। একটি ব্রহ্মাস্ত্রেই সম্রাট নিজের রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত।

—বাঁচাও গুনিন, বাঁচাও।

অভিরামের ঠোঁটে ধারালো হাসি: কেন, সরকারীবাবু কোথায় গেল? তাকে ডেকে পাঠাও না।

—রাগ কোরো না ভাই, দয়া করো। তুমি ছাড়া আর কে আছে। এ সময়ে তুমি না এলে—

তারপর একদিন অভিরামের হাসিও বন্ধ হয়ে গেল। বসন্ত হল পদ্মার। লক্ষ্য ভেদ করে ব্রহ্মাস্ত্র যে আবার তার বুকের দিকেই ফিরে আসবে এ কথা তো গুনিনও জানত না।

অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে মরে গেল পদ্মা। সুন্দরী বউ পদ্মা। অমন অপূর্ব্ব দেহটা তার পচে গেল, এমন বীভৎস হয়ে গেছে যে সেদিকে তাকানো চলে না। সৌন্দর্যের আবরণের তলা থেকে বীভৎস নরককুণ্ড।

এইবারে মাটিতে আছড়ে আছড়ে কাঁদলে অভিরাম। কী করলাম, কী করলাম আমি!

কিন্তু সব চাইতে বড় আঘাত তখনো তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। পদ্মার মৃতদেহ সরাতে গিয়ে বিছানার তলা থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা

চমৎকার আংটি! এই রকম একটা আংটি—ঠিক এই আংটিটাই কার হাতে দেখেছিল সে? ডাক্তারের, না কৃষ্ণপ্রসাদের! তা হলে? পদ্মা?—

শোক মিলিয়ে গেল—মাথার মধ্যে জ্বলে যেতে লাগল দুঃসহ একটা অগ্নিকুণ্ড। তা হলে শেষ পর্যন্ত জয় হল কার? চরম অপমান আর চরম পরাজয়ের মধ্যে তাকে ফেলে গেল কে? গ্রামের ঘরে ঘরে মড়া-কান্না উঠেছে—অভিরাম কি এই চেয়েছিল? আর পদ্মা? পদ্মা? এই সোণার আংটি?

পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল গুনিন। লাল পুঁটলিটার মধ্যে নানা জাতের তীব্র প্রাণঘাতী বিষ সঞ্চিত আছে—অভিরাম হার মানবে না। না—কিছুতেই না।

* * * *

কিন্তু কৃষ্ণপ্রসাদ ভালো লোক।

সরকারী ডাক্তার, স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টার আর ভ্যাকসিনেটারের একটা ছোট দল নিয়ে সে গ্রামের দিকে আসছিল। বারোয়ারীতলার কাছাকাছি আসতেই দলটা থমকে দাঁড়িয়ে গেল একবার। দিনে-দুপুরেই গুনিনের বিষ-জর্জরিত মৃতদেহটা শেয়ালে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল সেখানে।

—অ্যানাদার ভিকটিম - ডাক্তার বললেন।

বস্ত্রং দেহি

নবেন্দু ঘোষ

বুড়ো এককড়ির বয়স হয়েছে প্রায় ষাট। বছর দুয়েক ধ'রে চোখে তার ছানি পড়েছে, দেখতে পায় না বললেই চলে। শ্বশুরের চোখের দৃষ্টিকে দুর্ব্বল ক'রে দিয়ে লজ্জাহারী ভগবান যে হরিমতীর নগ্নতার লজ্জা রক্ষা করেছেন, তা এককড়ির ছেলে তিনকড়ি মানে, তিনকড়ির বউ হরিমতীও মানে। নগ্ন নয় তো কি? যে শাড়ি দুটো প'রে হরিমতী দিন কাটাচ্ছে আজকাল, তা প'রে বাইরে বেরোনো তো দূরের কথা, বাড়ির ভিতরে ওই প্রায়ান্ধ শ্বশুরের সামনে চলাফেরা করতেও বাধে হরিমতীর। তবু তো তারা ভদ্রলোক নয়, তারা ছোটলোক—চাষী।

সন্ধ্যা না হ'লে বাড়ির বাইরে যায় না হরিমতী। জল আনা, বাসন মাজা, কাপড় ধোয়া সবই অন্ধকারে সারতে হয় তাকে। ছোটলোক, চাষীরবউ বটে হরিমতী, কিন্তু ইজ্জৎ-রক্ষা সম্বন্ধে সচেতনতা ও লজ্জা তার ভদ্রঘরের বউদের চেয়ে এক তিলও কম নয়। হয়তো বেশিই, কারণ হরিমতী বরাবরই একটা বিষয়ে গর্ব্ব পোষণ করে। তার বাপ মাইনর পর্য্যন্ত লেখাপড়া করেছিল, যা তার স্বামী তিনকড়ির বাপ ওই এককড়ির সাধ্যে কুলোয় নি।

তবু চলছিল কোনমতে। লজ্জার মাথা খেয়েও। কিন্তু মুশকিল হ'ল, যখন একজন অনাহুত অতিথি এসে হাজির হ'ল তার অপ্রীতিকর আত্মীয়তার দাবি নিয়ে! এককালে অতিথিরা দেবতা ব'লে পূজা পেত, কিন্তু সেকাল একাল নয়। কালচক্রের আবর্ত্তনে সেকাল তলিয়ে গেছে। এখন প্রয়োজন হ'লে পিতা পুত্রকে অস্বীকার করে, স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, মা সন্তানকে বিক্রি করে। তাও না হয় সহ্য করা গেল, অমন করতেই হয়। নিদারুণ অভাবে দিন কাটলেও মোটা চালের ভাতের সঙ্গে একটা শাক আর একটা তরকারির অভাব হবে না। উঠোনের

পাশে লাউগাছটাতে লাউ ফলেছে, এক কোণে ডাঁটাগাছগুলো ঘন হয়ে হাওয়ায় দুলছে।

এসেছে নন্দনগাছি থেকে দূরসম্পর্কের এক ভাই। তিনকড়ির মাসতুতো বোনের পিসতুতো ভাই নন্দলাল। কি একটা কাজে, বিকেলেই চ'লে যাবে। সঙ্গে তার এক ছোকরা, জাতে তিলি।

তা আসুক। একদিনের অতিথি ওরা। ব্যবস্থা একটা হবেই। একটু দুধও চেয়ে আনা যাবে তারিণী মণ্ডলের বাড়ি থেকে। কিন্তু মুশকিল বাধল পরিবেশনের সময়।

কথা ছিল যে, তিনকড়ির এগারো বছরের মা-হারা বোন প্রতিমা ওরফে পুঁটী পরিবেশন করবে। কিন্তু যখন আসন পাতা হ'ল তখন খিড়কির দোর দিয়ে কলসী কাঁখে মেয়েটা বেরিয়ে গেল জল আনবার অছিলা ক'রে। ওরও লজ্জা করে। হরিমতী ব্যগ্রকণ্ঠে কয়েকবার ডেকেছিল তাকে, কিন্তু মেয়েটা ফিরল না। অগত্যা যা এড়াবার জল্পনা কল্পনা অনেকক্ষণ ধ'রে করছিল হরিমতী, তাই অর্থাৎ পরিবেশন তাকেই করতে হ'ল।

খেতে খেতে উশখুশ করে তিনকড়ি। বউয়ের দিকে তাকিয়ে গলা দিয়ে ভাত আর নামতে চায় না তার। বহুদিনের পুরোনো, ময়লা ছেঁড়া তালি-দেওয়া আর জায়গায় জায়গায় গেঁট-দেওয়া একটা শাড়িকে অতিকষ্টে সারা দেহে জড়িয়েছে সে। এই শাড়িটার ইতিহাস মনে আছে তিনকড়ির। যুদ্ধ লাগার আগে, তার মরা ছেলে খোকনের জন্মাবার আগে, হরিমতীর সপ্তামৃতের সময় দু টাকা এক আনায় একজোড়া কিনে এনেছিল সে। একটা অনেকদিন আগেই গেছে, ওইটেই একটু যত্নে তোলা ছিল ভাল ব'লে, গেল বছর থেকে একাদিক্রমে প'রে প'রে ওই অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। অমন সযত্নে শাড়িটাকে সারাদেহে জড়িয়েছে হরিমতী, তবু লজ্জা রক্ষা হয় না। বাহুর কাঁধের ও বুকের পাশের অনেক অংশই অনাবৃত রয়েছে। পাতলা, সারবিহীন শাড়ির অন্তরালে দেহের যেটুকু আছে, তাও আবছাভাবে দেখা যায় একটু নজর দিলেই। একটা শেমিজ পরলে হয়তো ও লজ্জা ঢাকত, কিন্তু একটা সাধারণ মোটা শাড়ি

পাওয়াটাই যেখানে চরম ও পরম সৌভাগ্যের কথা, সেখানে শেমিজের মত বাহুল্যের বিষয়ে নিষ্ফল কামনা করবার মত সময় নেই তাদের।

তিনকড়ি উশখুশ করে আরও একটা কারণে। সবাই তারা মুখ নীচু ক'রেই খাচ্ছে, কিন্তু নন্দলালের সঙ্গী ছোকরাটির চোখ দুটো বড় চঞ্চল, বড় জংলী। বারংবার ছোকরা আড়নয়নে হরিমতীর সর্ব্বাঙ্গ লেহন করছে খেতে খেতে। হরিমতী রূপসী নয়, তবে কুশ্রীও নয়। শ্রী একটা আছে তার যৌবনদৃপ্ত সবল দেহে। আরও সবল, আরও স্বাস্থ্যবতী ছিল সে আগে। কিন্তু গত দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করার সুবিপুল চেষ্টায় দেহে একটু জীর্ণতা এসেছে, একটু ভাঙন লেগেছে। আরও কারণ আছে। সেই পঞ্চাশের অন্নহীন, খাদ্যহীন প্রাণধারণের উপযোগী ঘাসপাতারও অভাবের দিনে, নিদারুণ ক্ষুৎকাতরতার মধ্যে, একরকম অনাহারেই হরিমতীর বুকের একটা পাঁজর খ'সে গিয়েছে। তার একমাত্র সন্তান, তার পাঁচ বছরের খোকনমণি মারা গিয়েছে। কিন্তু মৃত্যু যেমন একটা দুর্লঘ্য নিয়ম, বেঁচে থাকাও তেমনই একটা নিয়ম। তাই হরিমতী বেঁচে আছে। আর বয়স তার খুব বেশি নয়, বাইশ। তাই যৌবনের রেশ এখনও লেগে আছে হরিমতীর দেহে। নন্দলালের সঙ্গী ছোকরা তাকাবে বই কি! নগ্নতা ঢাকার লজ্জায় হরিমতীর দেহ যেন আরও দর্শনীয় হয়ে ওঠে ছোকরার কাছে।

হরিমতীও টের পায় ব্যাপারটা। শেষবার যখন সে পরিবেশন করতে এল, তখন সে শ্বশুরের ছেঁড়া গামছাটা গায়ে জড়িয়ে এসেছে। তিনকড়ি তাকাল তার দিকে। মনে হ'ল যে, হরিমতীর চোখের কোণে যেন জল টলমল করছে।

ঠিক তাই।

খায় নি হরিমতী। অপেক্ষা করছিল তিনকড়ির জন্য। নন্দলাল আর তার সঙ্গীটি কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যেতেই, বুড়ো এককড়ি বাইরের ঘরে চোখ বুঝতেই তিনকড়ি যখন ভিতরে গেল, হরিমতী তখন সামনে এসে দাঁড়াল। যে চোখের জলকে সে এতক্ষণ পর্য্যন্ত বাঁধ রচনা ক'রে আটকে রেখেছিল, এবার সেই বাঁধগুলো সে ভেঙে ফেললে।

হরিমতীর হাত ধরলে তিনকড়ি। তার চোখের গরম জলের ধারাকে

ডান হাতের তালু দিয়ে মুছবার একবার চেষ্টা ক'রে সে প্রশ্ন করলে, কি হয়েছে বউ?

হরিমতী চুপ ক'রে শুধু ঠোঁটটা মাঝে মাঝে কামড়াতে লাগল।

তিনকড়ির হঠাৎ বিরক্তি বোধ হয়। শ্রাবণ মাস। ক্ষেতে এখন অনেক কাজ। নেহাৎ অতিথিরা এসেছে, নইলে সে আজ সকাল থেকেই সারাদিন ক্ষেতে থাকত। সারা বছরের আশা প্রাণ রয়েছে সেখানে। বিশ্রাম করবার, মেয়েলোকের মান ার সোহাগ মেটানোর সময় নেই তার। দেনার দায়ে মহাজনের কাছে তার প্রতিটি চুল বাঁধা পড়েছে, হাতে গোটা কয়েক টাকা মাত্র রয়েছে, কার্ত্তিক পর্য্যন্ত সংসার চালাতে আরও ধার করতে হবে তাকে। এখন কি কান্না-টান্না ভাল লাগে?

কি হয়েছে ছাই বল না বাবু?

হরিমতী ক্রুদ্ধা সর্পিণীর মত ফোঁস ক'রে উঠল। ছেলেটা মারা যাবার পর থেকেই তার মাথার ঠিক নেই। শান্ত লোকটা মাঝে মাঝে ভয় পাইয়ে দেয় তিনকড়িকে।

কি হয়েছে বুঝতে পারছ না, দেখতে পাচ্ছ না?—সে পাল্টা প্রশ্ন করলে।

কি, কি হয়েছে? না বললে বুঝব ক্যামনে, আমি কি অন্তরযামী নাকি?

তোমার ভাইয়ের সঙ্গী অলপ্পেয়েটা ক্যামন ড্যাবড্যাব ক'রে গিলছিল আমায়, তা দেখ নি?

দেখেছি। মাথা নীচু করলে তিনকড়ি।

তবে বিহিত কর, এর চেয়ে ন্যাংটো হয়ে থাকা যে ভাল।

কি বিহিত করব? বুঝেও বুঝতে চায় না তিনকড়ি। আর বুঝেই বা কি করবে সে?

শাড়ি—শাড়ি! দুই হাত স্বামীর সামনে প্রসারিত ক'রে হরিমতী বললে, শাড়ি, একটা শাড়ি দ্যাও। কবে থেকে বলছি, খেয়াল নেই তোমার? সেই গেল পূজোয় একখানা শাড়ি দিয়েছিলে, একখান জল-জলে শাড়ি, তাতে কি চিরকাল যাবে? কতবার বলি নি তোমায়? আজ নয় কাল দেব, কাল নয় পরশু দেব, আজ দাম বেড়েছে, কাল দাম কমলে

দেব—এও সব ব'লে ব'লে শুধু ফাঁকি দিয়েছ আমায়, আমায় ন্যাংটো ক'রে ফেলেছ তুমি। এবার? এবার যে না হ'লেই নয়, একখানা শাড়ি আন যে ক'রে পার।

হরিমতীর কথার চোটে তিনকড়ির মাথা গুলিয়ে গেল, একটা অকারণ অসহিষ্ণুতায় তার মাথা গরম হয়ে উঠল, তাই বুঝেও যুক্তির ধার দিয়ে না গিয়ে সে হরিমতীরই একটা উক্তি নিয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।

চোখ লাল ক'রে সে প্রশ্ন করলে, আমি তোমায় ন্যাংটো ক'রে রেখেছি?

রেখেছই তো, পুরুষ মানুষ তুমি, একটা শাড়ি আনতে পার না?

না পেলে আনব কোত্থেকে?—তিনকড়ি গর্জ্জন ক'রে উঠল এবার।

যেখান থেকে পার আন, আমার চাই-ই। ইস, কি মুরোদ রে আমার সোয়ামীর, ওই যে বলে না—

ঠাস ক'রে একটা চড় মারল তিনকড়ি হরিমতীর গালে। আর বেশি কথা সে সহ্য করতে পারছে না।

মারলে! আমায় মারলে! হরিমতীর সব তেজ এক মুহূর্ত্তে যেন জল-ঢালা আগুণের মত হুস ক'রে নিবে গেল, শুধু চোখ দিয়ে গলগল ক'রে জল পড়তে লাগল।

হ্যাঁ, মারলাম। দাঁতে দাঁত চেপে তোরঙ্গটা খুলতে বসল তিনকড়ি।

পাশের ঘর থেকে বুড়ো এককড়ির কণ্ঠস্বর ভেসে এল, কি হ'ল রে তোদের, অ্যাঁ?

কিচ্ছু না, তুমি ঘুমোও।—তিনকড়ি ধমকে বললে।

আচ্ছা বাবা। বুড়োর কণ্ঠে অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের করুণ বিলাপের রেশ যেন লেগে আছে।

তোরঙ্গ খুলে একটা ন্যাকড়ায় বাঁধা পুঁটলি বার করলে তিনকড়ি। গোটা সাতেক টাকা আছে, ট্যাঁকে গুঁজল তা। তারপরে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরুল।

কিন্তু বেরিয়েই আর একটা কাণ্ড ক'রে বসল তিনকড়ি।

পুঁটি কলসী কাঁধে উঠোনে এসে দাঁড়াল। কোমর থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত একটা পুরানো গামছা ছাড়া দেহে আর কিছুই নেই।

তাকে দেখেই তিনকড়ির হঠাৎ থেমে-যাওয়া রাগ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

কি দরকার ছিল ছুঁড়ীর জল আনতে যাওয়ার? খালি ফাঁকি, খালি কাজ এড়িয়ে চলা।

পুঁটী!

অ্যাঁ?

ইদিকে আয়।

কলসীটা রান্নাঘরের দাওয়ায় নামিয়ে রেখে পুঁটী কাছে এল। এই গম্ভীর কণ্ঠের আহ্বানের হেতুনির্ণয় সে করতে পারছিল না।

কাছে আসতেই পুঁটীর বাঁ গালে পাঁচটা আঙুলের দাগ এঁকে দিলে তিনকড়ি।

কোথায় গিয়েছিলে হারামজাদী, তোর বউদি না মানা করেছিল, অ্যাঁ? জল আনতে যাওয়া হয়েছিল মিছামিছি, কেন গিয়েছিলি, অ্যাঁ? কেন?

এই অপ্রত্যাশিত চড়ে পুঁটী হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। অভিমানে, বেদনায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। উত্তর দিতে পারল না সে, শুধু পশুর মত দুটো বড় বড় নির্দ্দোষ চোখে তার জল উপচে এল।

জবাব দিল হরিমতী। রাগে কাঁপছিল সে।

না হয় গিয়েই ছিল, তুমি মোড়লি করছ কেন?

করব না কেন?

না, পার না করতে। যদি পারবেই তবে তাকিয়ে দেখ ওর বুকের দিকে।

তিনকড়ি তাকাল। পুঁটী সেই চাহনি দেখে দ্রুতপদে রান্নাঘরে চ'লে গেল।

কিন্তু সেই এক ঝলক চাহনিতেই যে দৃশ্য দেখল তিনকড়ি, যে কথা বুঝতে পারল সে তাতে তার মুখে আর কথা জোগাল না। সে ভুলে গিয়েছিল যে, পুঁটীর বয়স এগার হয়েছে। সে ভুলে গিয়েছিল যে, বাঙালীদের ঘরে এগারো বছরেই নারীদেহে অনেক পরিবর্ত্তন হয়। সে শুধু জানে যে, পুঁটী তার ছোট বোন, এখনও ছোট। কিন্তু তিনকড়ি জানে না যে, তার

ভাইয়ের দৃষ্টি ছাড়াও অন্য দৃষ্টি আছে, যা বহু পোশাকের আবরণকে পর্য্যন্ত ভেদ করে সুতীক্ষ্ণ শায়কের মত, নিরাবরণ হ'লে তো কথাই নেই। সে দৃষ্টির কাছে কম বয়সটা কোনও খাতির পায় না।

হরিমতী চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, ও আর কচি নেই, ও এখন মেয়েলোক হতে চলেছে। নতুন বয়েস, ওর লজ্জা যে আমার চেয়েও বেশি, তা বুঝি জানতে না গো?

জ্যা-মুক্ত তীরের মত ছিটকে বেরিয়ে গেল তিনকড়ি।

হনহন ক'রে অনেকখানি এগিয়ে গেছে তিনকড়ি। কেন, কোন্‌দিকে, তা ভাববারও অবকাশ হয়নি। মাথাটা তার গরম হয়ে গেছে। তার মাথাটা যদি মাটির হ'ত, তবে তার মস্তিষ্কের উত্তপ্ততা-প্রাবল্যে মাটির উপরকার উত্তাপসৃষ্ট অতি সূক্ষ্ম ধোঁয়ার মত ধোঁয়া হয়তো তার মাথার উপর থেকেও কাঁপতে কাঁপতে উপরে উঠত। কিন্তু মাথাটা তার মাটির নয়, এই যা রক্ষে।

কাঁচা সড়কের উপর দিয়ে নিবারণ দত্তের ছেলে মণীশ আসছিল। ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের যুবক, পাঁচ বছর জেল খেটেছে স্বদেশীতে। বছর তিনেক হ'ল গ্রামে ফিরে এসেছে ছাড়া পেয়ে। এখনও স্বদেশীর কাজ করে। খদ্দরের ধুতি মালকোচা দিয়ে পরা, হাফশার্ট গায়ে, কাবুলী জুতো পায়ে। বুকের উপর দিয়ে বেল্টে আঁটা একটা ব্যাগ কোমরের পাশে ঝুলছে, তাতে নানারকমের বই কাগজপত্র থাকে। প্রায়ই তাদের ডেকে আসর জমায়, নানা কথা বলে, তাদের ভালর, কথা স্বদেশীর কথা। গেল দুর্ভিক্ষ আর মড়কের সময় এত ঘটেছে যে বলবার নয়, তা শুধু মনে রাখবার। কাপড়ের ব্যাপার নিয়েও সে এবং তার দলের লোকেরা আন্দোলন চালাচ্ছে, তিনকড়ি জানে সে কথা।

ও মণীশবাবু! – অন্ধকারে যেন আলো খুঁজে পেল তিনকড়ি।

কি খবর ভাই? মণীশ হেসে দাঁড়াল।

তিনকড়ি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল, একটা দরকার আছে।

বল। কিন্তু তার আগে এই গাছের ছায়ায় এস। অনেক দূরে থেকে আসছি কিনা, সেই তোমাদের, কি যেন বলে, হ্যাঁ, নিমডাঙা থেকে।

বটগাছের ছায়ায় দাঁড়াল দুজনে।

কি দরকার, বল?

শাড়ির অভাবে যে আর চলছে না।

মণীশ হাসলে, সে জানি ভাই। সেইজন্যেই তো চারদিকে ঘোরাফেরা করছি। কাল একটা মিছিল বেরুবে, আশপাশের সব গাঁয়ের গরিবেরা দল বেঁধে ছেলেমেয়ে নিয়ে শহরে যাবে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে আবেদন জানাতে। তোমাকেও যেতে হবে কিন্তু।

তিনকড়ি নিজের বক্তব্য জানাবার জন্য অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে, সে তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বললে, যাব, যাব, কিন্তু আমার যে এখুনি দরকার মণীশবাবু।

মণীশ নিরুত্তর তাকাল তিনকড়ির দিকে।

তোমরা স্বদেশী করছ, আর এটুকু পার না?—হতাশায় নিস্তেজ করুণ হয়ে উঠল তিনকড়ির কণ্ঠস্বর।

স্বদেশী! মণীশ হাসল, মৃদুকণ্ঠে বললে, হ্যাঁ, তা করছি বটে, কিন্তু স্বদেশ এখনও স্বদেশ হয় নি তিনকড়ি।

সে যাকগে বাবু, আমার একটা উপকার করুন। করতেই হবে আপনাকে, বিশ্বাস না হয় তো পুঁটীকে আর বউকে একবার দেখে আসুন।

মণীশ বাধা দিল, থাক্, দুঃখ আর লজ্জাকে আর বাড়াতে চাই না ভাই। কিন্তু ব্যাপার কি বল তো, তুমি কি ফকির মিঞার কাছে যাও নি?

ফকির মিঞা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট আর ফুড কমিটির সেক্রেটারি। কাপড়ের পারমিট সেই দেয়।

গিয়েছি অনেকবার, গিয়ে গিয়ে পায়ের চামড়া ক্ষ'য়ে গেছে, কিন্তু পাই নি।

আচ্ছা, তবে এস আমার সঙ্গে, দেখি কি হয়!

চলতে চলতে তিনকড়ি ভাবে যে, একটা হিল্লে এবার হবেই। কারণ সে জানে যে, গ্রামের আর সকলের মত ফকির মিঞাও মণীশকে খুব খাতির করে।

কিন্তু হ'ল না।

ফকির মিঞা মাথা নেড়ে মণীশকে বললে, পারমিট দেবার উপায় নেই, কারণ কাপড় নেই ভাই।

কিছুতেই কি হয় না?—মণীশ হেসে প্রশ্ন করলে।

ফকির মিঞা গড়গড়ার নলে একটা টান দিয়ে বললে, কি ক'রে হবে? শুনলেই বুঝতে পারবে ব্যাপারটা। গ্রামের ৮১৩টি পরিবারের চাহিদা মেটাতে ধুতি-শাড়িতে মিলে মোট কাপড় এসেছে মাত্র পঁয়ষট্টিখানা। বল কাকে রেখে কাকে দিই?

কাকে কাকে দিয়েছেন?

যারা প্রথমে এসেছিল।

এবং যাদের মুরুব্বি ছিল, প্রভাব ছিল, নয় কি?—মৃদু হেসে মোলায়েমভাবে বললে মণীশ।

ফকির মিঞার মুখমণ্ডলে একটু লালচে আভা খেলে গেল। মেহেদী-রঙের হাল্কা ছোপ-লাগানো দাড়িটা একটু চুমড়ে সে বললে, দেখ মণীশ, তোমাকে সত্যি খাতির করি, তাই কথাটাতে রাগলাম না, কিন্তু কথাটা যে সত্যি তাতে সন্দেহ নেই। তাই ঠিক করেছি যে, পরের বারে লোকের দুঃস্থতা ও প্রয়োজন দেখেই কাপড় দেব, গরিবদের কথাই আগে ভাবব। এবার হয়ে উঠল না, কি রকম অসহায় অবস্থা হয়, তা তো জান না।

মণীশ হাসলে, বুঝি সবই। পরের বারে যা করার সদিচ্ছা করেছেন, সেটা যেন বজায় থাকে। সে যাক, আপাতত একটা পারমিট দিন আমায়, কাপড় থাক্ আর নাই থাক্। তিনকড়িকে আমি কথা দিয়েছি, আমার কথাটা রাখতে দিন। তা ছাড়া, তিনকড়ির পরিবারের লজ্জা রক্ষা হওয়া সত্যি দুষ্কর হয়েছে।

ফকির মিঞা একবার মণীশের দিকে, একবার তিনকড়ির দিকে তাকাল। তিনকড়ি বিবর্ণমুখে বিনীতভাবে অপেক্ষা করেছে।

ফকির মিঞা বললে, তোমার কথা রাখব মণীশ। বস, পারমিট লিখে দিচ্ছি।

মণীশ বাড়ি গেল।

পারমিট নিয়ে আশায় আশঙ্কায় দুরুদুরু বুক নিয়ে ছগনলালের দোকানে গিয়ে হাজির হ'ল তিনকড়ি।

ছগনলাল মাড়ওয়ারী এই গ্রামে এসেছে দূর রাজপুতনার মরুভূমি পার হয়ে। ভারতবর্ষের সেই দূরপ্রান্তে ব'সেও সে বাংলা দেশের এক অখ্যাত পল্লীর কাপড়ের চাহিদার কথা জানতে পেরেছিল এবং সেই চাহিদা মেটাবার জন্য প্রায় পনেরো বছর আগে একটা লোটা ও এক গাঁট কাপড় কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছিল। এখানকার আর আশপাশের গ্রামে প্রতি হাটবারে পুরো চার বছর কাপড় ঘাড়ে ক'রে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করেছে সে। তারপর ধীরে ধীরে স্ফীতোদর গজাননের আশীর্ব্বাদে মা লক্ষ্মীর কৃপালাভের সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে এই গ্রামের বাজারের মুখে দোতালা বাড়ি হাঁকিয়ে বসেছে সে—যেমন ক'রে ইংরেজ বণিকেরা এক জাহাজ পণ্যদ্রব্য নেয়ে ব্যবসা করতে এসে ধীরে ধীরে সমুদ্রের ধারে ধারে কেল্লা গ'ড়ে তুলেছিল।

সেই ছগনলাল মধ্যাহ্নের অবকাশে ভুঁড়ির বাঁধন একটু আলগা ক'রে পাশবালিশে ভর দিয়ে গতকল্যকার হিসেবের খাতা দেখাশোনা করছিল।

বিনীতকণ্ঠে তিনকড়ি ডাকলে, শেঠজী!

শেঠজী মুখ তুললে, বললে, কি বুলছ হে?

ভক্ত যেমন ভগবানের চরণে পুষ্প-অর্ঘ্য দান করে, তেমনিভাবে পারমিটটাকে তুলে ধরলে তিনকড়ি।

কি চাই?—শেঠ আবার প্রশ্ন করল।

কাপড়, মানে শাড়ি একখানা—এই পারমিট।

কাপড় নেই।

এই যে পারমিট, ফকির মিঞা দিয়াছে।

ছগনলাল বিরক্তিতে উঠে বসল, মিঞা পারমিট দিইয়েছে তো হইয়েছে কি? কাপড় না থাকলে আমদানি করব কোথা থেকে আমি? যাও আবার সামনের মাসে এসো।

একখানা না হ'লে কিছুতেই চলবে না শেঠজী—একটা দিন।

তুমি কি পাগল হলে গো, অ্যাঁ? নেই, একটাও নেই, দেখছ না আলমারিগুলান যে সব একদম খালি?

দেখছি তো—তবু একটা দিন, বড় উপকার হবে।

তবে কি আমি নেংটা হয়ে আমারটা দিব?

তিনকড়ি চুপ ক'রল। কথা খুঁজে পায় না সে, শুধু চারদিকে তাকায়।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে যে, কতকগুলো রঙিন শাড়ি দড়িতে ঝুলছে।

ওগুলো—ওগুলো কি তাঁতের নাকি ?

হাঁ।

দাম ?

সবচেয়ে কম দাম বারো টাকা চার আনা।

ওর চেয়ে কমে কি হয় না ?

ছগনলাল চ'টে উঠল, যাও যাও, বাড়ি যাও জী—এটা তুমার তরি-তরকারির ডুকান না—যাও।

শাড়ি কেনা আর হ'ল না।

কিছুদূর গিয়ে পথের ধারে, একটা শিমূলগাছের তলায় বসল তিনকড়ি। মাথা তার আবার গরম হয়ে উঠেছে। রোদ্দুরের তেজও বেড়েছে অসম্ভব রকমের।

সেইখানে ব'সে নিরুপায় আক্রোশে, মূল্যহীন পারমিটটাকে কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলল সে। অতি দুঃখেও হাসি পেল তিনকড়ির। হাসাটা তার পক্ষে মোটেই অন্যায় নয়, কারণ রাস্তা দিয়ে যে বাজারের দিকে আসছিল, তাকে দেখে সকলেরই হাসি চাপা অসম্ভব হবে। তবে বিশেষত্ব এই যে, সেই হাসি—হাসি বলতে যা বোঝায় তা নয়—তা কান্নারই একটা হাস্য সংস্করণ বেদনাবিকৃত হাসি।

আসছিল গ্রামের পুরোহিত মহেশ ভটচাজ্জি। গলার মোটা, ময়লা পৈতেটা ঠিকই আছে, মাথার শিখাটাও ব্রাহ্মণ্যগর্বের তাড়নায় মৃদুমন্দ দুলছিল। কিন্তু তার পরনে একটা লুঙ্গি। (অভাব মানুষকে যে কত সহজে নীতি ও রীতিকে ভাঙতে বাধ্য করে, এ তারই নিদর্শন)

ভটচাজ মশায়, পেন্নাম।—তিনকড়ি এগিয়ে গেল।

কল্যাণ হোক বাবা। কি খবর তিনু, ভাল তো ?

ভাল আর কই বাবাঠাকুর! কিন্তু এ কি হয়েছে ভটচাজ মশাই—লুঙ্গি ?

ভটচাজ্জি মাথা নেড়ে হাসল, বিষাদক্লিষ্ট কণ্ঠ তার আবেগে কেঁপে

উঠল, বউয়ের ছেঁড়া শাড়িটা পরার ইচ্ছেই হয়েছিল, কিন্তু বউ বললে, খবরদার মানিকের চেয়েও দামী আমার শাড়ি, ও তোমার জন্যে নয়। অগত্যা এই লজ্জা রক্ষা করতে হবে তো? তাও দাম কম নাকি? মানিক মিঞাকে 'দাদা, বাবা' ব'লে সাড়ে চার টাকায় এটা কিনেছি। আমার এতে কোন দুঃখ নেই তিনু—যে নারায়ণ পঙ্গুকে দিয়ে পর্বত লঙ্ঘান, মূককে বাচাল করেন, তিনিই এই ব্রাহ্মণকে বিধর্মী সাজাচ্ছেন।

তিনকড়ি প্রশ্ন করলে, কেন, পুজোপার্বণে কিছু পান না?

ছাই—মানে কলা। ডান হাতের বুড়ো আঙুলটাকে নাচাল মহেশ ভটচাজ্জি, যাতে শাড়ি কাপড়ের দরকার হয়, এমন পুজো পার্বণ কজন করে আজকাল? করলেও আট আনা, এক টাকা ধ'রে দিয়ে বলে, হেঁ হেঁ, কাপড়ের জন্য নিন পুরুতমশাই।

তিনকড়ি অতি দুঃখেও আবার হাসল।

ভটচাজ্জির সঙ্গে তিনকড়ি চলল কথা বলতে বলতে।

গাঁয়ের একজন মোড়ল—কলিমুদ্দিন সরকার আসছিল বগলের মধ্যে কি একটা গামছামুড়ি দিয়ে চেপে।

কি হে মোড়ল, কোত্থেকে?—ভটচাজ্জি প্রশ্ন করলে।

বাজার থেকে।—হেসে ফেললে কলিমুদ্দিন।

লুঙ্গি পরা দেখে হাসছ? তা হাস। কিন্তু তোমার বগলে কি হে—বড় সযত্নে নিয়ে যাচ্ছ, অ্যাঁ? ভটচাজ্জির চোখ দুটো একটু তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

কলিমুদ্দিন একটু ইতস্তত ক'রে বললে, কাউকে বলবেন না?

না হে, না।

এক জোড়া ধুতি আনলাম মাড়ওয়ারীর কাছ থেকে।

দেখি দেখি।—সাগ্রহে একসঙ্গে ব'লে উঠল ভটচাজ্জি আর তিনকড়ি।

মিলের এক জোড়া মোটা সাধারণ ধুতি।

পারমিটে পেলে নাকি?—ভটচাজ্জি শুধোল।

হুঃ! কলিমুদ্দিন মুখ বিকৃত করলে, পারমিট পকেটেই আছে। এ ব্ল্যাক-মার্কেট। তাও চেনা জানা ব'লে, টাকা দিলেও তো পাওয়া যায় না!

কত নিলে ?

পনরো টাকা। চেয়েছিল কুড়ি।

শালা চোর কোথাকার! ম্লান হয়ে এল ভটচাজ্জির মুখ।

আর মিলের শাড়ির কথা শুনবেন? পঁচিশ ত্রিশ, তাঁতেরও ওই এক দর।

তিনকড়ি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। টাকা থাকলে সব পাওয়া যায়, নিরুপায় অবস্থাতেও উপায় হয়। যার টাকা নেই, তার অনাহার আর নগ্নতাই বিধিলিপি। অন্তত আজকালকার দিনে।

টাকার যোগাড় করতে হবে।

কিন্তু টাকা চাইলেই কি পাওয়া যায় ?

মহাজন রামকান্ত দাস মাথা নাড়ল, দশ টাকা চাইছ, কিন্তু আর কি আছে তোমার বন্ধক রাখার মত ? বকেয়া যা আছে, তার হিসেব মনে আছে তো ? কবে দেবে ?

মনে আছে। পঁচাত্তর টাকা ছ আনা। সুদ ছাড়া।

আরও অনেকের কাছে গেল তিনকড়ি। সবাই রামকান্তের মতই মাথা নেড়ে জানাল, না।

অনুভূতি আর অভিজ্ঞতা দিয়েই মানুষ জীবন-দর্শন গড়ে। তিনকড়ির জীবন-দর্শনে তাই আশা নেই, আছে নিরাশা, সুখ নেই, আছে দুঃখ। তাই তার দর্শন বিয়োগান্ত, মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের তবকে মোড়া।

মণীশ শুনে গম্ভীর হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বললে, এর জন্যই তো কাল মিছিল বেরোবে। আর কিছুদিন ধৈর্য্য ধর ভাই, বিহিত একটা হবেই।

এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে বাকী দিনটা কাটিয়ে দিল তিনকড়ি। সারাটা দিন নিস্ফল হয়ে গেল। ক্ষেতে কাজ ছিল, পণ্ড হ'ল। কালও দুপুর পর্য্যন্ত যেতে পারবে না, মিছিলে যোগ দেবে সে। স্বদেশী ছেলেদের কথাই ঠিক। একা তিনকড়ি আর তার মত অন্যান্য তিনকড়িরা কিছুই করতে পারে না। দরিদ্র আর নির্য্যাতিতের বল একতায়, সম্মিলিত শক্তিতে। হয়তো ফল ফলবে না, দলে যোগ দিয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচালেই

হয়তো তিনকড়ির বউয়ের জন্য একটা শাড়ি জুটবে না। তবু কাজ হবে না কি? সবাই তো জানবে, সবাই তো শুনবে যে, নগ্নতার লজ্জায় তারা, তাদের ঝি-বউয়েরা দিনরাত চোখের জল ফেলছে।

বাড়ি ফিরতে লজ্জা হয় তিনকড়ির। সন্ধ্যে হয়ে গেলে অপরাধীর মত, চোরের মত পা টিপে টিপে সে বাড়ি ঢুকল।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল তিনকড়ি। নন্দলালেরা বিকেলে চ'লে গিয়েছে।

খানিক বাদেই হরিমতী ঘরে এল।

মাথা তোলবার শক্তি নেই তিনকড়ির।

হরিমতী তাকাল তার দিকে, একটু হেসে, শ্লেষতিক্তকণ্ঠে বললে, পেলে না, না? না পেলে, এই ছেঁড়া শাড়িটাকে ভালভাবে পরলে বছরখানিক চ'লে যাবে, নিশ্চয়ই যাবে।

মন্থরগতিতে আবার সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাত্রিবেলায় লজ্জা দুঃখ আরও বেড়ে গেল তিনকড়ির।

দরজা বন্ধ ক'রে, পিদিমটা নিবিয়ে দিয়ে হরিমতী বললে, অন্যদিকে মুখ ফেরাও তো।

কেন?

দরকার আছে।

অন্ধকারে নগ্ন হয়ে দাঁড়াল হরিমতী। শাড়িটাকে অতি সন্তর্পণে, অতি যত্নে বাঁশের আলনাতে ঝুলিয়ে দিয়ে, শ্বশুরের ছেঁড়া গামছাটা দিয়ে কোমর বুক কোনরকমে ঢেকে বিছনায় এল সে।

হরিমতীর গায়ে হাত পড়তেই তিনকড়ি বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করল, কি হ'ল?

হরিমতী গম্ভীরভাবে বললে, ওই ছেঁড়া কাপড়টা প'রে শুলে পরে ওর অবস্থা যে কি হবে, তাও কি বুঝতে পারছ না?

তিনকড়ি ঘেমে উঠল।

ভোর হতেই তিনকড়ি গিয়ে হাজির হ'ল ইস্কুলের মাঠে। সেখানেই সকলের জড় হবার কথা ছিল।

মণীশ এসেছে সেখানে, আর এসেছে গাঁয়ের প্রায় দেড়শো লোক। কয়েকজন বুড়ী আর কয়েকজন ছোট মেয়েও আছে তাদের মধ্যে। বাগদী

জেলে, তিলি, গরিব চাষী প্রায় সবাই আছে—হিন্দু মুসলমান দুইই। কাপড়ের অভাব আর অন্নের অভাব তো ধর্ম্মের জন্য হয়নি।

আরও মিনিট দশেক বাদে তারা রওনা হ'ল। যাবার আগে মণীশ এবং গাঁয়ের আর একটি ছেলে তাদের কয়েকজনের হাতে বাঁশের টুকরোতে লাগানো পিসবোর্ড দিলে। নানা কথা লেখা ছিল সেগুলোর উপর ইংরাজী আর বাংলাতে—কাপড় চাই, মজুতদার, নিপাত যাক, নগ্নতার লজ্জা নিবারণ কর, চোরাবাজার ধ্বংস কর, এমনই নানা কথা।

তারা বেরোল।

মাঝে মাঝে তারা চেঁচায়, কাপড় চাই।

একজন হাঁক দেয়, মজুতদার—

সবাই সে হাঁকের পরিপূরণ করে, নিপাত যাক।

বাজারের মধ্য দিয়ে যাবার সময় তিনকড়ি তাকাল ছগনলালের দোকানের দিকে। দোকান তখনও খোলেনি, কিন্তু অন্যান্য তামাসাপ্রিয় দর্শকদের সঙ্গে ছগনলালও এসে দাঁড়িয়েছে তার দোকানের বারান্দায়। তার ঠোঁটের কোণে অবজ্ঞার মৃদু হাসি। নবীন সূর্য্যের রঙিন আলোয় তার গলার মোটা সোনার হারটা চিকচিক করে, চোখে নেশা ধরায়।

যেতে যেতে আরও দু-তিন গাঁয়ের লোকদের নিয়ে আরও চার-পাঁচজন যুবক এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিলে। সব মিলে প্রায় শ পাঁচেক লোক হ'ল।

শহরে পৌঁছতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগল। তখন আটটা বেজে গেছে। দলবল নিয়ে মণীশ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাংলার সামনে হাজির হ'ল। ফটকের সামনে একজন পুলিস ও একজন দারোয়ান ছিল।

মণীশ বললে, চেঁচাও ভাইসব।

আর কিছু বলার আগে তিনকড়ি হাঁক দিল, কাপড় চাই—

সবাই যোগ দিল।

কাপড় চাই।

মুনফাখোর নিপাত যাক।

চোরা কারবার বন্ধ কর।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, বিহিত কর

কাপড় চাই।

পুলিস আর দারোয়ানটা গর্জ্জন ক'রে কি যেন বললে। কিন্তু ছোট্ট নদীর কল্লোলধ্বনি যেমন সমুদ্রগর্জ্জনের তলায় চাপা প'ড়ে যায়, তেমনই তাদের সেই ক্ষীণকণ্ঠগর্জ্জনও জনতার 'কাপড় চাই' দাবির মধ্যে মিশে হারিয়ে গেল।

জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কার্টার তখন স্ত্রীকন্যা পরিবেষ্টিত হয়ে আন্ত-র্জ্জাতিক রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। বাইরের বিক্ষুব্ধ জনকলাহলের ঢেউ ভেসে এল।

মিসেস কার্টার বললেন, ও কি, ডিয়ার? দেখছি আমি।

কার্টার বললেন, দি ওল্ড ষ্টোরি অফ নেকেড মেন—কাপড় চায়।

সবুজরঙের রেশমী পর্দ্দাটাকে সরিয়ে মিসেস কার্টার সামনের দিকে তাকালেন। কার্টারদের মেয়ে জোয়ানও মায়ের পিছনে এসে দাঁড়াল। সামনের লনের সবুজ ঘাস আর গোলাপ-কুঞ্জের পরে, ফটকের ওধারে একদল নির্লজ্জ নগ্ন লোক ভীড় ক'রে চীৎকার করছে। কি বলছে তারা, তা মিসেস কার্টার ও জোয়ান বুঝলেন না, কেবল জনতার সংখ্যাধিক্য ও চীৎকার করার উন্মত্ত কায়দা দেখে ভীতিবিহ্বল হয়ে উঠলেন।

তাঁরা বললেন, হাউ পিটিয়েব্‌ল!

দারোয়ান রামসিং এসে সেলাম জানাল।

ক্যা বাট হ্যায় রামসিং?—কার্টার প্রশ্ন করলেন।

কাপড় মাংতা হ্যায় হুজৌর।

মিসেস কার্টার চ'টে উঠলেন, ইহা পর কেঁও? ক্যা, ইঁহা কাপড়েকা ডুকান হ্যায়?

জোয়ান বললে, ফাদার তো মাড়োয়ারী কাপড়া ওয়ালা নেহি হ্যায়, ডুকানমে যানে ব'লো।

কার্টার উঠে দাঁড়িয়েছেন। পাইপটাকে ধরিয়ে তিনি বললেন, চলো।

মিসেস কার্টার বাধা দিলেন, ত্রাসে তাঁর দুটো নীল চোখ যেন দুটো ইন্দ্রনীল মনির মত জ্বলছে। ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসের কথা মনে আছে তাঁর।

তিনি বললেন, পিস্তলটা নাও ডার্লিং।

জোয়ানও সায় দিল, ইয়েস, ডু টেক ছ্যাট ড্যাডি।

কার্টার হাসলেন, নন্‌সেন্স। যারা না খেয়ে ম'রে গেলেও একটি হাত তোলে না, তারা কাপড়ের জন্য নিশ্চয়ই আমায় খুন করবে না।

হাসতে হাসতে চ'লে গেলেন মিঃ কার্টার।

মিসেস কার্টার খুসি হলেন। আজকাল আর ইণ্ডিয়ানদের বিশ্বাস নেই। দে আর আপটু এনি লিমিট। কি করা যায়? বাইরের কোলাহল ক্রমেই বাড়ছে।

মা-মা!

ইয়েস।

কল দি পুলিশ প্লীজ।

রাইট, আমিও তাই ভাবছিলাম ডিয়ার।

টেলিফোন তোলার শব্দ হ'ল।

ফটকের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেন মিঃ কার্টার। পাইপ থেকে ঘন ঘন কড়া তামাকের গন্ধ বেরোচ্ছে, বাঁ হাতের মুঠোয় একটা সাদা রুমাল বারংবার নিপীড়িত হচ্ছে। তাঁর ছুদিকে দাঁড়িয়েছে বন্দুকধারী পুলিশ ও দরোয়ান রামসিং তাঁর বডিগার্ডের মত।

জনতা ফেটে পড়ল, যেন আকাশ থেকে বাজ পড়ল—কাপড় চাই।

চোপ রও। মিঃ কার্টার গর্জ্জন ক'রে বললেন, চুপ ক'রে শান্তভাবে বল, কি চাও।

কাপড় চাই, কাপড়ের ব্যবস্থা কর।—আবার সবাই চীৎকার ক'রে উঠল।

বাম চক্ষু একটু কুঞ্চিত ক'রে কার্টার বললেন, হোয়াট! এই, ইধার আও, আও।

সামনেই ছিল তিনকড়ি। প্রাণপণে চীৎকার ক'রে যাচ্ছিল সে। তাকেই ডাকলে কার্টার।

তিনকড়ি এক লাফে ভীড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। ওরে বাপ্‌রে! সায়েব! হাকিম! এগিয়ে গেল মণীশ।

কার্টার তার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ ক'রে প্রশ্ন করলেন, আর ইউ দি লীডার?

লীডার নই, তবে এরা যা বলতে চায়, তা আমি আপনাকে বলব।

বল, দেন সে।—পাইপটা দাঁতের মধ্যে চেপে ধরলেন কার্টার।

ফল কিছুই হ'ল না। অর্থহীন আশ্বাসবাণী দিয়েই কার্টার তাদের বিদায় দিয়েছেন—আবছা আবছা আশ্বাস। ব্যবস্থা হবে একটা। কিন্তু কবে, কি, সে সব বিষয়ে কোন শব্দ নেই।

তিনকড়ি খুশি হ'ল না। এত হাঁটাহাটি, এত চেঁচামেচি ক'রে ফল হ'ল কি? শহরের বড় রাস্তায় আরও ঘণ্টাখানেক ঘুরে শেষে মিছিল ভেঙে গেল। তখন বেলা দশটা।

তিনকড়ি ভাবলে একবার চেষ্টা করা যাক। যদি শহরে এক-আধটা কাপড় সস্তায় পাওয়া যায়।

কিন্তু তা কি হয়? ব্ল্যাক-মার্কেট নামক চোর আর জুয়াচোরদের যে বিরাট আড়ত সৃষ্ট হয়েছে, সেখানে আজকাল অতিপরিচয়ের সার্টিফিকেট না থাকলে কাপড় পাওয়া দুঃসাধ্য। আর যা পাওয়া যায়, তা কেনার মত টাকা নেই তিনকড়ির।

তিনকড়ি বাড়ি ফিরিল।

সন্ধ্যাবেলা পুঁটীর জ্বর এসেছে। ম্যালেরিয়া। কাঁথা মুড়ি দিয়ে মেয়েটা অচৈতন্য হয়ে প'ড়ে আছে।

খাওয়াদাওয়া সেরে তিনকড়ি ক্ষেতে গেল বলদ দুটোকে নিয়ে। বলদ দুটোর চেহারা দেখলে কান্না পায়। রোগা, টিংটিং করেছে, হাড়-গুলো জিরজির করেছে। বেশিদিন বাঁচবে না ওরা। তখন যে কি হবে, তা তিনকড়ির বিধাতাপুরুষও জানে না।

হরিমতী মুশকিলে পড়ল। বাড়িতে জল নেই, বাসনগুলাও মাজতে হবে, এদিকে পুঁটীর জ্বর।

কি আর করা যায়, বাধ্য হয়ে বেরোতে হ'ল।

কাপড় ভালভাবে গায়ে জড়ালেই কি সব ঢাকা পড়ে? নিতম্বের নীচে, বুকের পাশটায় মানুষের চোখ গিয়ে পড়বেই।

পুকুর খুব দূরে নয়।

যে ঘাটে সাধারণত ভীড় হয়, সেখানে গেল না হরিমতী। লজ্জা।

একটু আড়ালে, একটু নির্জ্জনে, জলের ধারে গিয়ে বসল সে। আষাঢ় মাসের শেষের দিকে খুব বৃষ্টি নেমেছিল, ভরা পুকুরের জল থই থই করেছে। হাত বাড়ালেই নাগাল পাওয়া যায়।

বাসনগুলো মেজে প্রায় শেষ ক'রে এনেছে হরিমতী। এমন সময় কে যেন পেছন থেকে শিস দিলে।

হরিমতী চমকে তাকাল। তার দেহের অনাবৃত অংশগুলোকে খাদ্যলোভী কুকুরের মত লেহন করছে গাঁয়ের বখাটে ছোকরা অবিনাশের দুটো চোখ।

ভাল ক'রে শাড়িটা টেনে আর একটু ভব্য হবার চেষ্টা করতেই ফ্যাঁস ক'রে এক জায়গায় পুরোনো পঁচা কাপড়টা ছিঁড়ে গেল।

অবিনাশ হেসে বললে, আহাহা, লজ্জার চোটে শাড়িটা ছিঁড়লে যে!

তোমার ঠ্যাং খোঁড়া করব মুখপোড়া, পুঁটীর দাদা বাড়ীতে আসুক। —বললে হরিমতী।

অবিনাশ আবার হাসল, ছাই করবে। কেন, আমি কি অন্যায় করছি বাবা? তোমায় জাপটেও ধরি নি, খারাপ কিছু বলি নি, কেবল দেখছি। তোমরা দেখবার জিনিস আর ভগবানও চোখ দিয়েছেন দেখবার জন্যে, তাই দেখছি। এতে দোষ কি?

বাসনগুলো তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে, বালতিটা জলে ভ'রে হরিমতী রাস্তা ধরল।

অবিনাশ বললে, তোমার একটা শাড়ীর দরকার, যোগাড় ক'রে দিতে পারি আমি, নেবে? শুনছ?

হরিমতী ছুটতে ছুটতে মনে মনে ডাকলে, ঠাকুর, ঠাকুর!

ঠাকুর নামক প্রাণীটি সাড়া দিল না।

কেঁদে ফেললে হরিমতী আকুলভাবে হাউহাউ ক'রে।

তিনকড়ির শিরাগুলো দপদপ করছে উত্তেজনায়, বললে, চুপ। একটা কথাও না, চুপ।

হরিমতী কান্নার মধ্যেও তুবড়ি-ফাটার মত গর্জ্জে উঠল, চুপ কি? চুপ করব না, শাড়ি দাও এনে যে ক'রে হোক।

কি ক'রে আনব? চুরি করব?

কর।

বেশ, তাই যাচ্ছি।

বেরিয়ে গেল তিনকড়ি। রাত তখন বেশি হয়নি, তাদের খাওয়াও হয় নি। কেবল বুড়ো এককড়ি সন্ধ্যে পড়তেই খেয়ে-দেয়ে শুয়েছে।

সত্যি গেল লোকটা?

চোখ মুছে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে হরিমতী ডাকলে, ওগো কোথায় গেলে? পায়ে পড়ি, খেতে এস, খেতে এস।

তিনকড়ি আর খেতে এল না।

মাঝরাতে ছগনলালের দোকানে, মানে—বাড়িতে একটা শাড়ি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল সে।

হৈ চৈ চেঁচামেচি ক'রে অনেক লোক জড় করল ছগনলাল। কি মারটাই খেল তিনকড়ি! প্রহারে প্রহারে জর্জ্জরিত হয়ে নির্জীব হয়ে পড়ল সে। গ্রামের যারা এসেছিল, লজ্জিত হয়ে মাথা নীচু ক'রে ফিরে গেল তারা। ছগনলালকে মনে মনে তারা সমর্থন করলে না বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে তিনকড়িকে ছাড়াবার সাহস হ'ল না তাদের। হাজার হোক, তিনকড়ি যে চোর হয়ে গেল।

ছগনলালের লোকের শেষরাতে তিনকড়িকে বেঁধে থানায় দিয়ে এল।

হাজতের মধ্যে বাঁধা অবস্থায় প'ড়ে রইল তিনকড়ি। বেদনায় বিক্ষোভে তার চোখের জল শুকিয়ে গেছে। অসহ্য জ্বালায়, দুঃখে সে শুধু মাথার চুল টেনে ছিঁড়বার চেষ্টা করতে লাগল।

মণীশের কানে খবরটা এল বেলা নটা নাগাদ। নিরীহ শান্ত তিনকড়ি নিজেকে সামলাতে পারে নি। গ্রামের দু-একজন তাকে অনুরোধ করলে একটা কিছু করার জন্য।

মণীশের দুঃখ হ'ল। নিজের কাজের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ অনুভব ক'রে সে তাড়াতাড়ি বেরোল। মানুষ চেয়ে চেয়ে না পেলে করবে কি? সহস্র সহস্র বৎসরের সভ্যতায় মানুষ যে শিক্ষা পেয়েছে, আজ এক মুহূর্ত্তে সেই শিক্ষাকে অগ্রাহ্য ক'রে মানুষ কি ক'রে নগ্নতাকে স্বীকার ক'রে নেবে? আর নীতির দিক থেকেই বা কি খারাপ করেছে তিনকড়ি?

পুরোনো নীতিই কি ধ্রুব হয়ে থাকবে? প্রয়োজনের, অভাবের নীতি যে আলাদা।

ছগনলালকে ধরল গিয়ে সে।

ছগনলাল বুঝেও বুঝবে না, সব শুনেও মাথা নাড়ল সে, উসব হবে না মণীশবাবু, শালা চোর ওর জেল হওয়াই উচিত।

মণীশ উঠে দাঁড়াল, চোখ দু'টো তার জ্ব'লে উঠল, উচিত-অনুচিতের বিচার আপনি করবেন না। শেষবারের মত হাতজোড় ক'রে অনুরোধ করছি আপনাকে ছগনলালজী। গরিব মানুষ, যা মার খেয়েছে, তাতেই ওর অপরাধের বড় শাস্তি হয়েছে, জেলে আর পাঠাবেন না ওকে। একটা সংসার নষ্ট করলে কিন্তু আপনারও ভাল হবে না। তা ছাড়া আপনিই এসবের জন্য দায়ী, এ আমি প্রমাণ করতে পারি।

ছগনলাল কথাগুলো শুনে কি যেন ভাবলে মণীশদের দিকে তাকিয়ে রাজনীতির আবর্ত্ত সেও লক্ষ্য করছে, হয়তো দূর থেকে কৌতূহলবশত। তবু লক্ষ্য করছে। সে আজ হঠাৎ অনুভব করলে যে, কালের চাকার ঘর্ঘরধ্বনিতে একদিন যখন ইতিহাসের অমোঘ বাণী ঘোষিত হবে, একদিন যখন তাদের রাজত্ব শেষ হবে, তখন হয়তো এক নিরপেক্ষ বিচারকের কাছে তাকেও হাতজোড় ক'রে দাঁড়াতে হবে। সেদিন এরা শত্রু হয়ে থাকলে ফল ভাল হবে না।

ছগনলালও দাঁড়িয়ে বললে, আপনার কথা মেনে নিলাম মণীশবাবু, শুধু আপনার জন্য ওকে ছেড়ে দেব, চলেন।

থানায় গেল দুজনে।

নেই। তিনকড়িকে আধঘণ্টা আগে সদরে চালান দেওয়া হয়েছে।

ছগনলালকে খুব বুঝিয়ে সদরে নিয়ে গেল মণীশ।

খবর পেয়ে পাশের বাড়ির তারিণীকে হাতে পায়ে ধ'রে সঙ্গে নিয়ে থানায় গিয়েছিল বুড়ো এককড়ি। বুড়ো, অন্ধ মানুষ, লাঠিতে ভর দিয়ে, তারিণীর পেছন পেছন ঠুকঠুক করতে করতে থানায় গিয়ে হাজির হয়েছিল।

দেখাও পেয়েছিল তিনকড়ির। সে একটা কথাও বললে না, শুধু কাঁদলে।

দারোগাবাবু বললে, আমি কি করে ছাড়ি বুড়ো? আসামী যে। তুমি বরং ছগনলালকে ধর গিয়ে।

ছগনলালের দোকানে গেল বুড়ো।

ছগনলাল নেই, সে নাকি এই একটু আগে বেরিয়েছে।

বাড়ি ফিরে দাওয়ার ওপর বসে প্রায়ান্ধ বুড়ো কেঁদে কেঁদে বললে, পারলাম না গো মা, পারলাম না আনতে।

কাঠ হয়ে বসে রইল হরিমতী।

ঘরের ভিতর থেকে পুঁটী ডাকছিল, বউদি, অ বউদি, ক্ষিদে পেয়েছে গো, একমুঠ মুড়ি দে।

জবাব দিল না হরিমতী।

রান্নাঘরে গিয়ে উনুন ধরাবার চেষ্টা করল হরিমতী। পারল না, ধরাল না। ধোঁয়া নেই, অথচ চোখ দিয়ে তার দরদর করে জল পড়ছে।

হরিমতী স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। তিনকড়ির জেল হয়েছে অনেকদিনের জন্য। ঘোর অভাবের সংসারে উপার্জ্জনক্ষম কেউ নেই। বুড়ো শ্বশুর, বাচ্চা ননদ, সে নিঃসম্বল, অসহায়া স্ত্রীলোক। মা বাপ নেই, ভাই নেই, কেউ নেই আর। ছিল স্বামী, গেছে। সব বন্ধক রেখেও পেটের ক্ষিদে মিটবে না, দেহের নগ্নতা দিন দিন বাড়বে, কদর্য্য ইঙ্গিত আর লালসাময় দৃষ্টিতে স্নাত হবে সে অহরহ। মানুষের দুর্দ্দিনে, দুর্দ্দশায় অন্য মানুষের পশু-প্রকৃতি বাড়ে, এই চিরন্তন ইতিহাস। সব কিছুর বিনিময়ে এক গ্রাস অন্ন আর এক ফালি ন্যাকড়ার লোভ দেখিয়ে হয়তো বাঁচবার আমন্ত্রণ জানাবে অনেকে। কি লাভ বেঁচে থেকে?

শুধু তাই নয়। বৃশ্চিকদংশনের মত একটা জ্বালা তার বুক পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে। সে, সে-ই স্বামীকে চুরী করতে বলেছিল। একমাত্র সে-ই দায়ী এই সর্ব্বনাশের জন্য। কি লাভ বেঁচে থেকে?—আবার ভাবে হরিমতী।

সন্ধ্যাবেলায় তিনকড়িকে নিয়ে মণীশ ফিরে এল। তিনকড়িকে মুক্ত করেছে সে।

তিনকড়ির বাড়ির সামনে আসতেই কান্নার শব্দ শোনা গেল, আর কোলাহল।

কি ব্যাপার ?—মণীশ প্রশ্ন করলে।

তিনকড়ি কিছু বুঝতে পারল না. বললে, জানি না তো।

বোধ হয় তোমার জন্যে কাঁদছে।

হবে।

বাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতেই তারা দেখলে যে. উঠানের মাঝখানে হরিমতীর অৰ্দ্ধনগ্ন দেহটা প'ড়ে আছে। তার মৃত চক্ষুৰ্দ্বয় বিস্ফারিত। তাকে ঘিরে দু-তিনজন প্রাচীনবয়স্কা স্ত্রীলোক, পুরুষ ও কয়েকজন ছোকরা। দাওযার ওপর পুঁটী আর এককড়ি।

তারিণীও ছিল, সে বললে, মুখুজ্জেদের বাগানে গলায় দড়ি দিয়েছিল। এক ঘণ্টা আগে গরু চরিয়ে ফেরবার সময় দেখতে পাই, মধুকে থানায় পাঠানো হয়েছে খবর দেবার জন্যে।

মণীশ স্তব্ধ হয়ে গেল।

তিনকড়ি বোধ হয় টলছে।

শত পুত্রের শোকে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র যেমন কেঁদেছিল, একটি পুত্রবধুর জন্য তার চেয়েও বেশী কাদছে বুড়ো এককড়ি। তার লোলচৰ্ম্মের ওপর অশ্রু চকচক করছে।

মণীশ ভাবে। পরাধীন দেশের মানুষেরা কি শেয়াল কুকুর। এত দুর্ব্বল, এত অসহায় তারা—এত অসহায়! এক ফালি লজ্জা-নিবারণের কাপড়ের জন্য এমন বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটে! সে মুখ ফিরিয়ে নিলে। এই সব কান্না, হরিমতার ওই অৰ্দ্ধনগ্ন শবদেহ তাকে লজ্জা দিচ্ছে, তার পৌরুষকে ধিক্কার দিচ্ছে।

একটা হিংস্রতা ঘনিয়ে এল তিনকড়ির চোখে, শত্রুদের সামনে পেলে সৈনিকের চোখে যেমন হিংস্রতা ঘনায়। অনেক, অনেক অদৃশ্য শত্রুরা যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দেহের মাংসপেশীগুলো তার ফুলে উঠল। সেই অদৃশ্য শত্রুদের দু হাতের নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলবার একটা দুর্নিবার পিপাসা যেন তার দশটা আঙুলের দশটা নখের ডগায় এসে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল।

সে কাঁদবে না।

মুখবন্ধ

প্রবোধকুমার সান্যাল

শিবু হঠাৎ এলো গ্রামে। কামারের হাতুড়ির ঘায়ে আগুনের ফুল কি যেমন ছিটকে আসে, তেমনি সহর থেকে শিবু ছিটকে গ্রামে এসে দাঁড়াল। বছর তিনেক আগে কবে যেন সে গ্রাম থেকে চ'লে যায় এবং সে এতই নগণ্য সাধারণ যে, চ'লে যাবার পর কেউ তার খোঁজখবরও করেনি। কোনো প্রয়োজনও ছিল না।

শিবুর সঙ্গে এলো জনচারেক সহকর্মী,—তাদের হাঁকডাকে গ্রামের রাস্তাঘাট দেখতে দেখতে মুখর। শিবুর পৈত্রিক ভিটে ছিল শ্যাওড়া-জঙ্গলে ভরা, রাতারাতি সেটার সংস্কার আরম্ভ হয়ে গেল। সবাই একেবারে অবাক। এ যুদ্ধে লোকের অন্নবস্ত্র জুটছে না, মহামারী রোগে চারদিক শ্মশান হয়ে চলেছে—আর তার মাঝখানে এসে সেই সেনগুপ্তদের শিবু কিনা বাড়ীঘর তুলেছে? তা'র নামে জিনিষপত্র, মাল মসলা আর লোকজন আসে কিনা নৌকাযোগে? গ্রামের লোকেরা অবাক হয়ে শিবুর দিকে চেয়ে থাকে। এ যুদ্ধে সবই সম্ভব।

ছেলেরা একদিন শিবুর কাছ থেকে একশো টাকা চাঁদা চেয়ে নিয়ে এলো তাদের ক্লাবের জন্য! সেই শিবু, যার ভাত জুটতো না তিন বছর আগে, যার লেখাপড়া হোলো না এম্-ই-ইস্কুলে মাসিক আড়াই টাকা মাইনের অভাবে। পরের বাড়ী গতর খাটিয়ে যার বিধবা মা ম'রে গেল এইমাত্র পাঁচ বছর আগে —সেই শিবু! সমগ্র গ্রামে একটা চাপা আলোচনার ঢেউ উঠলো তাকে কেন্দ্রে ক'রে।

গতকাল অপরাহ্নে গ্রামের প্রান্তে ওই সুপারী গাছ ঘেরা দীঘির ধারে এক কাণ্ড ঘ'টে গেল। শিবুর লোকেরা ঘুঘুপাখী শিকার করতে গিয়ে তাদের একজনের বন্দুকের ছররাগুলি গিয়ে লাগে একটি মোরগের গায়ে। মোরগটি মারা যায়। কদু মিঞা এসে তাদের কাছে অনুযোগ জানাতেই শিবু তৎক্ষণাৎ একখানা দশ টাকার নোট তার হাতে গুঁজে দিল। কদু মিঞা হাঁ করে রইলো।

বিস্ময়ের কথা, শিবু ধুতি পরে না; মূল্যবান প্যাণ্টের সঙ্গে পরে সিল্কের শার্ট; এবং তার পায়ে আজকালকার ওই কাবুলি ঘুন্টি-জুতো। সিগারেটের টিন তার হাতে ফেরে। একটি সিগারেটের প্রায় আধখানা সে খায়, বাকিটা পথের পাশে এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলে—ঠিক যেন কাউকে ঢিল ছুড়ে মারলো। শিবুর মুখ সর্বদাই হাসি হাসি।

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এই গ্রামেই থাকেন। তাঁর নাম সাদাৎ আলী চৌধুরী। ইতিমধ্যেই শিবুর সঙ্গে তাঁর এমন ঘনিষ্ঠতা দাঁড়িয়ে গেছে যে, এ-দৃশ্যটি বাস্তবিকই অনেকের পক্ষে ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছে। শিবুর বাবা ওই সাদাৎ আলীর জন্যই একদিন মামলায় হেরে গিয়ে ফতুর হয়। ভদ্রলোক মারাই গেল বছর খানেকের মধ্যে,—এ গ্রামে বলতে গেলে শিবুদের আর কিছুই রইলো না তখন থেকে। লেখাপড়া দূরের কথা,—শিবুদের অন্ন জোটেনি কতদিন! ঠিক সেই সময়টায় যুদ্ধ অরম্ভ হয়।

সাদাৎ আলী চৌধুরীর অধ্যবসায়ে হঠাৎ দেখতে দেখতে ইউনিয়ন বোর্ডের জায়গা জমির ওপর কয়েকখানা পাকা করোগেটের ঘর উঠে দাঁড়ালো; কেবল তাই নয়, চাল ডাল আর কিছু নগদ টাকায় জন্য উজনির ইস্কুল ঘরটা এতদিন বন্ধ ছিল,—সেখানে গ্রামের প্রাইমারী শিক্ষকরা কয়েকজন ছেলেমেয়ে ডেকে ক্লাস বসালো। জনো গেল, ছাত্রছাত্রীরা বই শ্লেট আর জামা কাপড় পাবে। তারপর,—অবাক কাণ্ড! একই গ্রামে পাঁচটা টিউব ওয়েল ব'সে গেল রাতারাতি; নতুন চালাঘরে নরহরি ডাক্তার গুছিয়ে বসলো,—এবং ছয়টা কেরোসিন কাঠের বাক্স বোঝাই ঔষধপত্র একদিন ডাক্তারের ডিসপেন্সারিতে এসে পৌঁছল।

কেউ বললে, নদীর ঘাট থেকে আজুরির হাট পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা হবে, বর্ষায় আর কাদা মাখামাখি করতে হবে না—

কেউ বা বললে, রাখ তোর সাদাৎ আলি...এই যা কিছু সবই শিবুর পয়সা!

একথা সকলেই বিশ্বাস করে। এযুদ্ধে সবই সম্ভব।

শিবু তার লোকজন নিয়ে একদিন হাটতলাটা ঘুরে গেল। তাকে দেখে সবাই আড়ষ্ট। তার দামী প্যাণ্টে কাদার ছিটে, তার ভ্রূক্ষেপ নেই। শার্টের ঘরায় মুক্তোবসানো সোনার বোতাম; হাতে চারটে

বিচিত্র আংটি ; সুগন্ধ সিগারেটে তার বাতাসটি মিষ্ট-মধুর।

কিন্তু বিনয়ের ভারে অবনত তার মুখ। কোথাও তার আত্মাভিমান নেই, আত্মপ্রচার নেই,—সদাহাস্যে সে-মুখ বন্ধুবৎসল। সর্বদাই সেই ভঙ্গীটি যেন প্রকাশ করছে, আমি তোমাদের সেবক, অতি নগণ্য আমি!

তার পরদিন থেকে হাটতলায় লোক লাগলো। পাকা শান-পালিশ ফড়েদের বসবার জায়গা; আলাদা আলাদা ছোট বড় ফোকর, জেলেদের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত; মেয়েদের জন্য আব্রু। দেখতে দেখতে গ্রামের এদিক থেকে ওদিকে কী জনরব! আগামী সপ্তাহ থেকে বিনামূল্যে ঔষধ, দুধ, কণ্ট্রোলের দামে চাল ডাল আর কাপড়! শিবু যেন গ্রামে হঠাৎ সম্রাট হয়ে বসলো; এবং সাদাৎ আলি তার প্রধান মন্ত্রী! এটা হবারই কথা, কেননা এটা শিবুর পৈতৃকভূমি, এখানে সে মানুষ,—এখানকার পথে পথে এই সেদিনও সে না খেয়ে ট্যানা প’রে ঘুরেছে। আজ সেই শিবুর আবির্ভাবে সোনাডাঙ্গা যেন বেঁচে উঠলো। শিবু কেবল যে এগ্রামের ঐশ্বর্য্যই আনলো তাই নয়, সে যেন একটি মিলনের সংবাদও আনলো। এ গ্রামের সেই নগণ্য শিবু।

সে দিন কালীবাড়ীতে ছেলেরা শিবুকে নিমন্ত্রণ ক’রে আনলো। শিবুর সঙ্গে আলাপ সম্ভাষণ করবার জন্য গ্রামের সবাই সেখানে জড়ো হয়েছে। কিন্তু শিবু একা এলো না, সঙ্গে এলো তার দু’জন দেহরক্ষী; তারা খাকি রংয়ের জামাকাপড়-পরা। শিবুর পরণে অতি পরিচ্ছন্ন ধোয়া তাঁতের ধুতি; গিলে-করা আদ্দির পঞ্জাবী, হাতে হীরের আংটি; শিবুর চোখ দুটি সস্নেহ মাদকতায় জড়ানো। তাকে নিরীক্ষণ ক’রে সকলেই স্তব্ধ। সাদাৎ আলী গ্রামের পক্ষ থেকে শিবুকে সাদর-সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, আমাদের শিবেন্দ্র, গ্রামের উজ্জ্বল রত্ন···তাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করার ভাষা আমার নাই।

শিবু তার ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইটের টিন থেকে সিগারেট বা’র ক’রে সবিনয়ে ধরালো। কেবল মিষ্ট কণ্ঠে বললে, আমি সামান্য, তবে আপনাদের স্নেহেই আমি বড় হ’তে পারি।

তার সিগারেট ধরানো দেখে গ্রামের বৃদ্ধ নেতৃস্থানীয় হরেন রায় মহাশয় নির্বাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। শিবুর বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী নয়,—কিন্তু তার মাথা এত উঁচুতে উঠলো কেমন ক'রে, এ সংবাদ কারো জানা নেই। মোট কথা, এ যুদ্ধে সবই সম্ভব।

সেই সভাতেই সাদাৎ আলী প্রকাশ করলেন, শিবেন্দ্র শীঘ্রই কলকাতায় ফিরবেন, তবে এই কালীবাড়ীকে নতুনভাবে তৈরী করার জন্য তিনি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে যাবেন। তাঁর খরচেই দাতব্য চিকিৎসালয, ইস্কুল, অন্নসত্র ইত্যাদি চলবে। তা ছাড়া এ গ্রাম থেকে মহামারী, দারিদ্র্য ও অন্নবস্ত্রের অভাব ঘোচাবার জন্য তিনি নাকি বদ্ধ পরিকর। কলকাতায় চ'লে গেলেও বছরে তিনি একবার অবশ্যই আসবেন। আমাদের মস্ত সৌভাগ্য যে, তিনি এত কষ্ট ক'রে—ইত্যাদি। শিবু সকলের প্রতি আনত হয়ে নমস্কার ক'রে উঠে দাঁড়াল। সভায় সকলের মুখেই সাধুবাদ, ছেলেদের মুখে ধন্য ধন্য। সেই শিবু!

শিবুর জন্য গ্রামের সীমানায় একটি তাঁবু খাটানো হয়েছিল। সেটি অস্থায়ী, কারণ শিবুকে শীঘ্রই চ'লে যেতে হবে, তবু সেই তাঁবুর মধ্যে সাজসরঞ্জামের কোনো ত্রুটি ছিল না। নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা বেশী-দিন সে এখানে আছে,—এজন্য কলকাতা থেকে আরো কয়েকজন লোকজন এসে পৌঁছেছে। শিবুর ক্যাম্পের বাইরে আছে ইলেকট্রিক ডায়নামো,—সুতরাং দিনে পাখা ঘোরে, রাত্রে ইলেকট্রিক আলো জ্বলে। আকাশ ভালো থাকলে রান্না-বান্না বাইরেই হয়। মাছ ধ'রে এনে খাকি পোষাকপরা চাকর-বাকররা মাছ কুটতে বসে, কিম্বা মাংস রাঁধে, কিংবা পোলাও বানায়। আর অদূরে আ'লের কাছে গ্রামের ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে তাঁবুর দিকে তাকিয়ে থাকে।

সেদিন ওই আ'লের ধারের রাস্তাটায় কানা-ফটিকের সঙ্গে শিবুর হঠাৎ দেখা। কানা-ফটিক ভুরু উঁচু ক'রে বললে, পেন্নাম হই, শিববাবু।

শিবু হাসিমুখে বললে, বাবু হলুম কবে থেকে, ফটিক?

কানা-ফটিক বললে, কলকাতার বড়লোক বাবু বৈ কি!

শিবু একটু আত্মীয়তা ক'রে বললে, কেমন আছ? কী কর আজকাল?

আমাদের আর থাকাথাকি। সেই ঘরামির কাজই করি। তবে কাজ কম খড় নেই, দড়ি নেই...যুদ্ধে গেল সব। মনে পড়ে, তুমি আমার সঙ্গে কদ্দিন বেড়া বাঁধতে?

কানা-ফটিকের কণ্ঠে অন্তরঙ্গতার তাপ লক্ষ্য ক'রে শিবু আর কথাটা বাড়াতে চাইলো না। কেবল বললে, মনে হচ্ছে অনেক কালের কথা,—যাকৃগে। ছোট লাহিড়ীদের খবর কি? জানো কিছু?

কানা-ফটিক বললে, ছোটবাবু মারা গেছেন।

মারা গেছেন? শিবু চমকে উঠলো।

হ্যাঁ, মারা গেছেন আজ বছর দেড়েক। হঠাৎ হেসে ফটিক বললে, বেশ মনে পড়ে, ছোটবাবু তোমাকে দুচক্ষে দেখতে পারতো না।

শিবু চুপ করে রইলো কতক্ষণ। অবশ্য এ সব কথা কানে শোনা, এখন তার পক্ষে কিছু মর্যাদাহানিকর। কেবল এক সময় একটু নিশ্বাস ফেলে বললে, খুড়ি মা?

কানা-ফটিক বললে, তিনি আছেন তবে খুবই কষ্ট। বলতে গেলে দিন চলে না। চোরাবাজারে চাল কেনা ..কাপড় কেনা···কোত্থেকে পাবে বলো! বিধবা মানুষ! ছেলেটা নাবালক।

শিবু বললে, আচ্ছা, এসোগে তুমি—

কয়েক পা গিয়ে কানা-ফটিক একবার মুখ ফিরিয়ে শিবুর দিকে চেয়ে হাসলো। বললে, তুমি ওদের অনেক ভাত খেয়েছ শিববাবু -

শিবু কথা বললে না' ওকথাটা তার কানে না ঢোকাই ভালো।

তাঁবুতে ফিরে এসে কানা-ফটিকের কথাটা শিবুর দুই কানে খোঁচাতে লাগলো। ছোট-লাহিড়ী তাকে দুচক্ষে দেখতে পারতো না, তবু শিবু গোপনে গিয়ে ওদের বাড়ীতে ভাত খেতো। ওখানে সে উপকৃত, কৃতজ্ঞ এবং ঋণী—এতে ভুল নেই। কোথায় কোথায় তার ঋণ আর কৃতজ্ঞতা—সে সব জানে, তার স্মৃতিশক্তি জ্বলজ্বলে। ছোট-লাহিড়ী ম'রে গেল, শিবুর অবস্থার পরিবর্তন দেখে গেল না। বেঁচে থাকলে শিবু

তাকে কিনে ফেলতে পারতো,—তার ঘর-খামার, আসবাব-সজ্জা সব সুদ্ধ। শিবু উপেক্ষিত অপমানিত ছিল চিরকাল,—এবার তার জাগ্রত পৌরুষ সবাইকে জয় ক'রে নেবার জন্য ঠিক যেন অশ্বমেধের ঘোড়া ছোটাতে চায়। সে তার দানের অজস্রতায় সকল উপেক্ষা আর অবহেলাকে জয় করবে।

পরদিন সকালে সে ছোট-লাহিড়ীদের উঠানে এসে দাঁড়ালো। খুড়িমা ছিলেন পূজোর ঘরে, তিনি বেরিয়ে এলেন। বললেন, ওমা, শিবু যে?

শিবু তাঁর পায়ের ধুলো নিল। খুড়িমা বললেন, অনেকদিন এসেছিস শুনছি, এতদিনে বুঝি মনে পড়লো রে?

শিবু হাসিমুখে বললে, নানা ঝঞ্ঝাটে কাটছে,—নিরিবিলি তোমার এখানে আবো ভেবেছিলুম।

খুড়িমা বললেন, এখানে থাকবি নাকি?

না খুড়িমা, দু' একদিনের মধ্যেই যেতে হবে—অনেক কাজ, তোমরা কেমন আছ?

অমনি এক রকম, বাছা। দেখতেই পাচ্ছিস, দিনকাল বড় খারাপ। যুদ্ধ কবে থামবে বল্ ত'?

শিবু হাসিমুখে বললে, যুদ্ধ এখন না থামাই ভালো, থামলেই আমাদের লোকসান।

বটে! খুড়িমা বললেন, তোরা না হয় ফেঁপে উঠলি,—আমরা যে তলিয়ে গেলুম রে! আর দিন চলে না।

এমন সময়ে ঘাট থেকে উঠে ভিজা কাপড়ে খুড়িমার মেয়ে লাবণ্য এসে দাঁড়ালো। শিবু মুখ ফিরিয়ে বললে, ভালো ত' লাবণ্য?

লাবণ্য ঘাড় নেড়ে তাড়াতাড়ি ভিতরে চ'লে গেল। শিবু বললে, আমি ভেবেছিলুম লাবণ্যর বিয়ে হয়ে গেছে।

খুড়িমা বললেন, তা আর হোলো কোথায় বাছা। বিয়ের সব ঠিকঠাক, —উনি মারা গেলেন। পাত্তর ভেগে গেল। তারপর এই যুদ্ধের হিড়িক, জাপানীদের ভয়ে কে কোথায় পালাবে তার ঠিক নেই। জিনিষপত্তর পাওয়া যায় না, দেশে দুর্ভিক্ষ আর রোগ। বিয়ের টাকাকড়ি সব খরচ হয়ে গেল। লোকে খেয়েপ'রে বাঁচবে, না ছেলেমেয়ের বিয়ে দেবে বল্ দেখি?

শিবু বললে, এ তোমাদের অন্যায় খুড়িমা,—অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা উচিত। তোমরা কলকাতা গেলে না কেন? সবাই সেখানে যা' হোক দু'পয়সা করছে, তোমরাই শুধু পিছিয়ে রইলে।

খুড়িমা বললেন, ওমা, তুই বলিস কিরে? জানা নেই, শোনা নেই, কলকাতা গিয়ে দাঁড়াবো কোথায়?

শিবু বললে, বাঃ, আমি বুঝি নেই সেখানে? তোমার কাছে একটা খবর পেলে আমি অন্ততঃ চেষ্টাও করতে পারতুম।

খুড়িমা বললেন, তুই ত' সেই তিন বছর আগে গাঁ থেকে বেরিয়ে কাদের সঙ্গে গেলি কলকাতায়। কে যেন বললে, তুই নাকি আসামে; কেউ বললে চাটগাঁয়। তোর এত টাকা হোলো কোত্থেকে বল্ ত?

শিবু নতমুখে বললে, কি যে বলেন খুড়িমা - কী আর সামান্য!

একে তুই সামান্য বলিস? গাঁয়ে এসে তুই নাকি এরই মধ্যে তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করেছিস? এত পেলি কোথায়, শিবু?

শিবু বললে, তোমাদের জন্যে যদি কিছু না করতে পারি, তবে আমার টাকা-পয়সার কোনো দামই নেই, খুড়িমা!

এমন সময় হাসিমুখে লাবণ্য বেরিয়ে এলো। এত অভাব আর অনটনের মধ্যেও তার স্বাস্থ্যশ্রীর দিকে তাকিয়ে শিবু যেন পলকের জন্য একটু উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে পড়লো। লাবণ্য বললে, অনেক টাকা নাকি তোমার শিবুদা···শুনতে পাচ্ছি। আজ বুঝি বাড়ী বয়ে কিছু দান করতে এলে?

শিবু বললে, এতখানি স্পর্ধা আমার নেই, লাবণ্য। এ-বাড়িতে ভাত খেয়ে আমি মানুষ···এখানে টাকার অহঙ্কার দেখাতে আসিনি। তোমরা ভুল বুঝো না।

খুড়িমা বললেন, তুই আমাদের জন্যে কী করতে চাস, বল্?

শিবু বললে তোমরা আমার সঙ্গে চলো।

কোথায় রে?

কলকাতায়। বলু আর লাবণ্যকেও নিয়ে চলো।

কলকাতায় দাঁড়াবো কোথায়?

শিবু বললে, কেন, আমার কুঁড়েঘর কি নেই?

খুড়িমা প্রশ্ন করলেন, তুই বিয়ে করেছিস?

শিবু হেসে ফেললো! বললে, তোমরা বিয়ে ত' দাওনি?

লাবণ্য কটাক্ষ ক'রে বললে, লেখাপড়া ত' শেখোনি একটুও—এবার টাকার জোরে মেয়ে ঘরে আনো।

শিবুর আহত পৌরুষ পলকের জন্য জ্বলে উঠলো, কিন্তু এ-বাড়ীর অন্নে সে মানুষ—কঠিন কঠিন কথা তার মুখে এলো না। কেবল লাবণ্যর দিকে একবার তাকিয়ে খুড়িমাকে বললে, যদি যেতে রাজি থাকো তাহ'লে আমি—

মাঝপথে তাকে থামিয়ে লাবণ্য বললে, দেনাশোধ করা চাই, কেমন শিবুদা? সেখানে নিয়ে গিয়ে আমাদের ভাত-কাপড় দিয়ে পুষবে, এই ত?

খুড়িমা বললেন, তুই কি সেখানে একা থাকিস?

শিবু বললে, আর কে থাকবে বলো? কেবল কাজকর্ম থাকলে বাইরের লোক আসে-যায়।

লাবণ্য বললে, কিন্তু আমরা গিয়ে তোমার ঘাড়ে চাপতে যাবো কেন বলো ত'? বেশ ত'—তুমি দয়ালু, এ আমরা জেনে রাখলুম।

শিবু বললে, তা নয়, আমি তামাসা করতে আসিনি লাবণ্য,—সেখানে গেলে তোমরা সকলেই কাজ পাবে, তাই বলছি।

খুড়িমা বললেন, আমরা কী কাজ করবো, শিবু?

শিবু বললে, আজকাল বাড়ীতে ব'সেও অনেক কাজ করা যায় খুড়িমা। এটা যে যুদ্ধের যুগ। তাছাড়া বলু যত ছেলেমানুষই হোক ওর একটা কাজ ঠিকই জুটে যাবে, আমি বলে রাখছি।

লাবণ্য বক্রোক্তি ক'রে বললে, ভাগ্যি যুদ্ধ বেধেছিল, তাই তুমি মানুষ হ'লে শিবুদা!

শিবু বললে, তুমিও মানুষ হয়ে ওঠো, এই চাচ্ছি।

বাঁকা চোখে চেয়ে লাবণ্য বললে, তোমার আজকাল পয়সা হয়েছে, উপদেশ ছড়াবে বৈকি।—এই ব'লে সে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

খুড়িমা প্রশ্ন করলেন, তুই কবে চ'লে যাবি?

শিবু বললে, ভাবছি কালই যাবো।

কিয়ৎক্ষণ কী যেন চিন্তা ক'রে খুড়িমা বললেন, তুই এত করে বলছিস,—না হয় মাসখানেকের জন্য কলকাতায় যেতে পারি। কিন্তু বাছা, আমাদের পুঁজি কিছু নেই। নৌকোভাড়া রেলভাড়া—এসব ঘর ঠ্যাঙালেও বেরোবে না। ঘরে চাল নেই, নুন নেই, কাঠ নেই। ইস্কুলের মাইনের অভাবে বলুর পড়া বন্ধ হয়ে গেল। একখান কাপড়ের জন্য এত বড় মেয়ে বাইরে বেরোতে পারে না। তা সে যাই হোক, ওই এক মাস,—তারপরেই আমি বাছা ফিরে আসবো। কলকাতায় কত গোলমাল, সেখানে থাকতে আমার ভরসা হয় না, শিবু।

রান্নাঘর থেকে গলা বাড়িয়ে লাবণ্য বললে, শিবুদার বাহাদুরিটা দেখে আসতে তোমার এতই ইচ্ছে মা—

খুড়িমা এবার বললেন, তুই ভারি যা-তা বলিস, লাবণ্য!

লাবণ্য হেসে বললে, বড়মানুষিটা না দেখাতে পারলে বড়লোকরা আবার খুশী থাকে না। কি বলো, শিবুদা?

শিবু বললে, তোমাদের বাড়ীতে এসে দাঁড়িয়েছি, যা খুশি তাই বলতে পারো!

লাবণ্য উঠে এলো। বললে, তোমার বাড়ীতে গেলে তুমিও বুঝি আমাদের যা খুশি তাই বলবে? রক্ষে করো, আমি যাবো না।

শিবুর মুখে খুব একটা কঠিন কথা এসেছিল, কিন্তু সে আপন জিহ্বাকে সংযত করতে গিয়ে হেসে ফেললো। বললে যাঃ কী যে বলো তুমি!—তোমার মেয়ের এখনও জ্ঞান-বুদ্ধি হয়নি, খুড়িমা।

লাবণ্য অবাক হয়ে কিয়ৎক্ষণ শিবুর দিকে তাকালো। তারপর বললে, বাঃ—সেই শিবুদা! বাবা বেঁচে থাকলে ভালো হতো। তা বেশ, তোমার ওখানে গেলে তুমি আমার জ্ঞান-বুদ্ধি একটু পাকিয়ে দিয়ো?

শিবু বললে, খুড়িমা, তবে ওই কথাই রইলো। দুপুরবেলা নৌকা ছাড়বো। আমি নিজে এসে তোমাদের নিয়ে যাবো।

খুড়িমা বললেন, আচ্ছা, আমরা তৈরি হয়ে থাকবো।

শিবু চ'লে গেল। কিন্তু বাইরে এসে সে অনুভব করলো, নিষ্ফল

একটা ক্রুর আক্রোশে তা'র সর্বশরীর কাঁপছে। লাবণ্যের অহঙ্কার অসহ্য! দারিদ্র, হতমান, অনটন,—কিন্তু ছোটলাহিড়ীর সেই মেয়ের কী পর্বতপ্রমাণ আত্মভিমান! সে যত বড় ধনীই হোক, ওরা তাকে মানুষ ব'লে মনে করে না,—ওরা শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, ওরা বংশানুক্রমিক অভিজাত। অভিজাত্যের সেই নীলরক্তের গর্ব ওদের চোখে মুখে মেদমজ্জায়। ঘরে অন্ন নেই, পরণে লজ্জানিবারণের বস্ত্র নেই,—কিন্তু আত্মম্ভরিতায় মেয়েটা অন্ধ। ওর স্বাস্থ্যশ্রীটি পুরুষের পক্ষে লোভনীয়,—কিন্তু শিবু ত' কম নয়! শিবও ত' এতদিন পরে পাত্র হিসাবে কন্যা-জগতে লোভনীয় হয়ে উঠেছে!

শিবু তিন বা'র ক'রে সিগারেট ধরালো। পথ দিয়ে সে চলেছে, কত লোক চেয়ে রয়েছে তার দিকে। কিন্তু ওই ওরা শিবুর কাছে উপকার নিয়ে যেন শিবুকে কৃতার্থ করবে! পথের লোক তাকে মানে; ঘরের লোক তাকে মানে না। বহু জনসাধারণ তাকে মহিমার আসনে বসায়, কিন্তু বহুপরিচিতরা তাকে আমল দেয় না। আর ওই লাবণ্য! লাবণ্য তার ভ্রুভঙ্গিতে যেন শিবুকে জানিয়ে দিল, তুমি এ-বাড়ীর ভাত খেয়ে মানুষ, তুমি এই সেদিনও এ-বাড়ীর আনাচে-কানাচে বয়াটে ছেলের মতন ঘুরে বেড়াতে। টাকা তোমার এ যুদ্ধে যতই হোক, তোমার মর্যাদা কিছু নেই। তুমি লেখাপড়া শিখে মানুষ হওনি, বিদ্যাবুদ্ধিতে মহৎ হওনি,– তুমি যুদ্ধের জুয়ায় কিছু পয়সাকড়ি করেছ, এইমাত্র। এর বেশী তুমি কিছু নও।

শিবু যেন কোথায় নিজেকে আহত অপমানিত ও ক্ষুদ্র মনে করতে লাগলো। তার চোখ দুটো যেন জ্বালা করে উঠেছে কেমন এক-প্রকার আত্মগ্লানিতে। সে যেন লাবণ্যদের ওখানে নিজের মস্ত কিছু একটা দেখাতে গিয়েছিল, কিন্তু লাবণ্য যেন তার কান ম'লে দিয়ে তাকে যথানির্দ্দিষ্ট পথ দেখিয়ে তাড়িয়ে দিল।

সমস্ত দিনটা শিবু অন্যমনস্ক হয়ে রইল। কত লোক এলো কত কাজে। কত লোকের কত আবেদন, কত কর্মপন্থার নির্দেশ। বারোয়ারিতলা, ক্লাব, ইস্কুল, কালীবাড়ী, হাটতলা, ইউনিয়ন বোর্ড,– কত বিষয়ের কত আলোচনা দীর্ঘরাত্রিব্যাপী চললো। কিন্তু সব

কাজকর্ম ও আলাপ-আলোচনার মধ্যে শিবু যেন নগণ্য ক্ষুদ্র ও হতমান হয়ে বিড়ম্বিতের মতো ব'সে রইলো।

* * * *

সমস্ত পথটা লাবণ্য এবং তার মা অনেকটা যেন বিমূঢ়ের মতো বসে ছিল। ট্রেনের ফাস্টক্লাস কামরায় তাদের এই প্রথম, এবং এই যাত্রার আনুষঙ্গিক যা-কিছু থাকা দরকার, সমস্তই রাশি রাশি। সঙ্গে চাকরবাকর, তকমাপরা দারোয়ান, সহকর্মী জন তিনেক। শিবু যেন হঠাৎ ফেঁপে উঠেছে, উপচিয়ে পড়ছে তার টাকাপয়সা, কেবল খরচের উপলক্ষটা পাওয়া,—ব্যস, টাকাকড়ি জলস্রোতের মতন বেরিয়ে পড়ে। মা ও মেয়ে অভিভূত, হতচকিত।

গাড়ী কলকাতায় পৌছলে দেখা গেল, শিবুর জন্য সবাই রয়েছে অপেক্ষা ক'রে। দু'খানা চকচকে মস্ত মস্ত মোটর এসেছে তাকে নিয়ে যাবার জন্য। শিবুর কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কেউ সেলাম জানালে সে সেলাম নেয় না, নমস্কার জানালে প্রত্যুত্তর নেই, আগ্রহ প্রকাশ করলে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। শিবু সবাইকে এড়িয়ে খুড়িমা ও লাবণ্যর সঙ্গে গাড়ীতে গিয়ে উঠলো।

লেক্-রোডে এক প্রকাণ্ড ফটকওয়ালা বাড়ীতে এসে তারা মোটর থেকে নামলো। ফটকের একটি স্তম্ভে এক কাঁচের বাক্সের মধ্যে শিবুর নাম ইংরেজি সংক্ষিপ্ত হরপে লেখা,—এস, এন, সেনগুপ্ত। গাড়ী এসে থামতেই বুড়ি আয়া এসে দাঁড়ালো, তার সঙ্গে এলো ঘরকন্নার আলাদা ঝি-চাকর বোঝা গেল, খুড়িমা ও লাবণ্যর আসার খবর আগেই এসে পৌছেচে। এতক্ষণে লাবণ্যর মুখখানা ক্লান্ত দেখা যায়। লাবণ্যর সমস্ত পরিহাসবুদ্ধি একেবারে অসাড় হয়ে গেছে।

নীচের সামনের অংশে মস্ত অফিস-ঘর। লাবণ্য প্রশ্ন করলো, এটা কিসের আপিস, শিবুদা?

ওটা হিসেবের দপ্তর, এসো তোমরা।—শিবু তাদের নিয়ে অগ্রসর হোলো।

মার্বেল-পাথরের দালান আর সিঁড়ি, অসংখ্য আয়না আর ছবি, অজস্র আসবাব পত্র, ঝাড়লণ্ঠন, কত রকমের টেবল্ ও কুশন্, কত বিচিত্র

ঘড়ি ও তাদের টুংটাং আওয়াজ। একটি ঘরে ঢুকবার আগে খুড়িমা প্রশ্ন করলেন, ঘরে ঢুকবো, ভিতরে কে যেন কথাবার্তা বলছে, শিবু?

শিবু বললে, কেউ নয় খুড়িমা, ওটা রেডিও। এইটিই আপনাদের ঘর। এটায় শোয়া চলতে পারে,—এরই মধ্যে স্নানের ঘর আছে। পাশে আপনাদের বসবার ঘর। আয় বলু, আমার সঙ্গে।

বছর তেরো বয়সের অর্বাচীন ছেলেটি বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে শিবুর সঙ্গে এগিয়ে গেল। কোথায় যেন তখন টেলিফোন বাজছে।

খুড়িমা চেয়ে থাকেন লাবণ্যর দিকে, লাবণ্য সলজ্জভাবে তাকায় মায়ের প্রতি। তাদের হাত-পা আসে না। কলকাতার শ্রেষ্ঠ অভিজাত-পল্লীতে এই প্রাসাদ হলো শিবুর,—শিবু এই সম্পত্তির মালিক। তিন বছর আগের সেই শিবু, যার একবেলা ভাত জুটতো না! মাত্র এই তিন বছর! এ যুদ্ধে কী না সম্ভব?

কিন্তু কিছু তলিয়ে দেখার মতো অবস্থা খুড়িমার ছিল না। তাঁরা বসবেন, কি দাঁড়াবেন, কিম্বা বাইরে আসবেন, অথবা স্নানের আয়োজন করবেন,—কিছুই বুঝতে না পেরে যখন অভিভূতের মতো আড়ষ্ট হয়ে রয়েছেন,—সেই সময় এ বাড়ীর প্রধান পরিচারক এসে দাঁড়ালো। তার হাতে একরাশি তসর ও রেশমের জামা-কাপড়। ব্রাহ্মণ পাচক তার পিছু পিছু এসে বললে, মা, আপনি ভাঁড়ার-ঘরে আসুন—এই নিন চাবির গোছা, বাবু পাঠালেন।

এমন সময় বলু এসে দাঁড়ালো যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাহেববাচ্চার মতো। ইতিমধ্যেই সে সমস্ত বাড়ীটা ঘুরে দেখে এসেছে। তার দিকে তাকিয়ে লাবণ্য সহসা ঝড়ের মতন খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো।

বিকালের দিকে এক সময় খুড়িমা শিবুকে দেখতে পেয়ে বললেন, তোর এখানে তেমন হিঁদুয়ানী নেই বাছা!

শিবু হেসে বললে, তবেই হয়েছে, এটা যে কলকাতা খুড়িমা! ওসব এদিকে নেই!

ওমা, সে কি রে?

শিবু বললে, তোমরা সেকেলে লোক,—কত রকম কুসংস্কার তোমরা আঁকড়ে ধরে থাকো, এ যুগে ওসব চলে না খুড়িমা—

বাইরে মোটরের হর্ন বাজলো। শিবু পুনরায় বললে, তোমাদের গাড়ী এসেছে। কই, লাবণ্য কোথায়?

খুড়িমা বললেন, গাড়ী! গাড়ী কেন রে?

বেড়াতে যাবে না তোমরা? একটু হাওয়া খেয়ে এসো মাঠের দিকে। ওতে মন ভালো হয়!

কার সঙ্গে যাবো বাছা?

শিবু হেসেই খুন। বললে, কোনো দরকার নেই, আমার সোফার আর দারোয়ান সঙ্গে থাকবে। সিনেমায় যাবে খুড়িমা?

না বাছা—

লাবণ্যকে নিয়ে খুড়িমা যখন শিবুর সঙ্গে সঙ্গে বাইরে আসবেন, সেই সময় দু'জন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি ফটকে ঢুকছে। শিবুকে দেখে তারা যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে কাছে এলো। লাবণ্য ও খুড়িমা আড়ষ্ট হয়ে কুঁকড়ে সরে যাবার চেষ্টা করতেই শিবু বললে, এই যে আমার বন্ধুদের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই—

কি যেন একটা কাণ্ড ঘটে গেল এক মিনিটে। ভুল-ইংরাজি ভাষায় শিবু ঝর-ঝর করে কতকগুলো কথা বলে গেল,—লাবণ্য ও খুড়িমা গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলেন। বলু গিয়ে আগেই গাড়ীতে বসলো।

গাড়ীর কাছে এসে শিবু বললে, সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে হয়, এটা কলকাতা! আগেকার সেসব আব্রু আজকাল আর নেই।

লাবণ্য শিবুর দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বললে, লজ্জা-মান খোয়াতে আর কেউ লজ্জা পায় না, এই বলছ ত'?

মোটর ছেড়ে দিল। শিবু সেখানে দাঁড়িয়ে মোটরের দিকে তাকিয়ে রইল চুপ করে। লাহিড়ীরা যত বড় অভিজাতই হোক, কোনোকালে মোটর কেনেনি, এটা শিবু জানে। এ বাড়িখানা তৈরী করতে যত টাকা লেগেছে, লাহিড়ীগোষ্ঠী অত টাকার গল্পও শোনেনি কখনও। লাবণ্যর দম্ভ, লাবণ্যর তেজ। কিন্তু লাবণ্য জানে না, গোটাকয়েক টাকা ফেললে এই কলকাতা সহরের লাখ লাখ লাবণ্যর

যে-কোনো লাবণ্য আজই রাত্রে পায়ের তলায় এসে পড়ে। এই ত লাবণ্যের এত অহংকার,—কিন্তু রেশমী শাড়ী আর জামা হাত পেতে নেবার সময় তার আত্মসম্মানে একটু বাধেনি! কোথায় গেল লাহিড়ী-বংশের পর্বতপ্রমাণ গর্ব, কোথায় রইলো নিষ্ফল আভিজাত্যবোধ? একথা ওদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, যারা যোগ্য—এ যুগে তারাই বাঁচবার অধিকার পায়; অযোগ্যের জায়গা কোথাও নেই!

সেদিন রাত্রে খুড়িমা শিবুকে ধরে বসলেন, তোর অবস্থা কেমন করে ফিরলো, এবার আমাকে বলতে হবে শিবু—

শিবু বললে, খুব সোজা! মিলিটারী কণ্ট্রাক্ট জোগাড় করেছিলুম একটু কষ্ট করে। ঝুড়ি, ঝাঁটা, বুরুশ—এইসব চালান দিই। মুরগী আর পাঁঠা যোগাড় করি। এ ছাড়া কম্বল, চামড়া—এমন কি আলু-পটলও সাপ্লাই করেছি খুড়িমা?

খুড়িমা বললেন, তাইতে এত শিবু?

না—শিবু বললে, আমি গিয়েছিলুম আসাম আর চাটগাঁয়ে। উড়ো-জাহাজ নামবার মাঠ তৈরী হবে—কুলীরা পালাচ্ছে জাপানী বোমার ভয়ে—আমি এদেশ-ওদেশ ঘুরে দু'হাজার কুলী জোগাড় করে এনে দিলুম। তাতে অনেক টাকা। এমন বহুবার জোগাড় করে দিয়েছি।

খুড়িমা তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। শিবু বললে, পাহাড় আর জঙ্গল কেটে রাস্তা বানাতে গেলে লেখা-পড়ার খুব বেশী দরকার হয় না, খুড়িমা। আমি কাজ করতে জানতুম।

খুড়িমা কতক্ষণ পর্যন্ত অবাক হয়ে রইলেন। শিবু বলতে লাগলো, টাকা কেমন করে আসে জানতে পারিনে—কোথা থেকে কেমন করে আসে হঠাৎ হাজার হাজার টাকা। পরিশ্রমের টাকা নয় খুড়িমা, সমস্তটাই যেন জুয়া, জুয়ার টাকা, এতবড় যুদ্ধটা একটা জুয়া ছাড়া আর কিছু নয়? যাদের টাকা নেই, তারা মনে করবে আজগুবি কথা বলছি, কিন্তু টাকা যাদের আছে তারা জানে টাকা আসা কত সহজ!

খুড়িমার মুখে আর একটিও কথা সরলো না। তিনি অলক্ষ্যে অভিনিবেশ সহকারে শিবুকে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

চার পাঁচদিন পরে একদিন সন্ধ্যার পর শিবু ভিতর মহলে এলো খুড়িমাদের খবর নিতে। উপরের খোলা বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়েছিল লাবণ্য। বললে, মা গেছেন রান্নাবাড়ীতে—

শিবু এ সংবাদে তখনই উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললে, রান্না-বাড়ীতে? কেন, দু'জন বামুন রয়েছে, তারা করে কি? এক একজন বামুন কত মাইনে নেয়, জানো লাবণ্য? চল্লিশ টাকা। আমার বাড়ীতে ঝি-চাকরের মাইনে, চুরি আর খাওয়া-পরায় মাসে হাজার টাকা লাগে!

লাবণ্য সহাস্যে চোখ কপালে তুলে বললে হাজার টাকা!

হ্যাঁ, হাজার টাকা! ওরা যদি কাজ করতে না চায়, তোমরা জুতিয়ে কাজ আদায় করে নেবে! দাঁড়াও দেখছি আমি—

লাবণ্য বললে, তুমি ব্যস্ত হয়ো না—মা তোমাকে আজ নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াবেন, তাই গেছেন রান্নাবাড়ীতে—

এমন সময় একজন চাপরাশি একখানা ট্রে তে এক টিন সিগারেট আর দেশলাই এনে দাঁড়ালো। শিবু সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে বললে, খুড়িমা আমাকে খাওয়াবেন, আমার কী ভাগ্যি!

লাবণ্য মুখ ফিরিয়ে বললে, মা গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা করতে গেছেন! আচ্ছা শিবুদা, আমাদের থাকবার জন্যও ত' তোমার অনেক খরচ পড়ছে। হাজার টাকা হয়ত দেড় হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে,—তার চেয়ে আমাদের দেশে পাঠিয়েই দাও—

শিবু একমুখ হেসে বললে, কী আর খরচ! বোঝার ওপর শাকের আঁটি। এর জন্যে তোমরা ব্যস্ত হোয়ো না।

বাড়ীর এদিকের অংশটা নির্জন। এদিক-ওদিক চেয়ে শিবু বললে, তোমার জন্যে একটা জিনিষ এনেছি, লাবণ্য।

কি?

একগাছা জড়োয়া নেকলেস পকেট থেকে বের করে শিবু বললে, তোমাকে এটা উপহার দিতে চাই।

নেকলেসটি দেখে লাবণ্য সোজা শিবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কেন?

শিবু বললে, এমনি—দিতে ইচ্ছে হোলো।

কত টাকা দাম ?

ন'শো টাকা !

লাবণ্য বললে, ন'শো টাকার উপহার আমাকে দিয়ে কেন তুমি টাকা নষ্ট করবে?

শিবু বললে, এটা নষ্ট হবে জানলে দিতুম না। তুমি গলায় পরলে মানাবে, তাই এনেছি।

কলকাতায় অনেক মেয়ে আছে! আমার গলায় নেকলেস ঝুলিয়ে তোমার লাভ কি বলো ত ?

কঠিন শীতল লাবণ্যের কণ্ঠস্বর। তার চাহনি এত পরিষ্কার যে, মুখ তুলে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। শিবু অত্যন্ত ছোট হয়ে গিয়ে বললে, তুমি নেবে না ?

লাবণ্য বললে, মাকে জিজ্ঞেস না করে নিতে পারবো না।

শিবু বললে, তবে যাক্—খুড়িমাকে বলবার দরকার নেই!—এই বলে হার ছড়াটা সে পকেটে পুরে রাখলো।

লাবণ্য বললে, তুমি এখানে বিশ্রাম করো শিবুদা, আমি মাকে একবারটি দেখে আসি।—এই বলে সে চলে গেল।

কেমন একটা কঠিন উত্তেজনা শিবুর দুই চোখে কাঁপতে লাগলো। ওদের বাড়ীতে সে ভাত খেয়ে মানুষ, ওদের চোখে সে অশ্রদ্ধেয়, ওদের সমাজে সে নগণ্য,—এই অপমানজনক ইঙ্গিতটি যেন লাবণ্যের ওই প্রতি-পদক্ষেপে সুস্পষ্ট। এ বাড়ীতে এসে ওরা যেন শিবুকে কৃতার্থ করেছে ওরা শিবুর অন্ন গ্রহণ ক'রে শিবুকে যেন গৌরবমণ্ডিত করেছে।

শিবু কেবল ভাবতে লাগলো কত টাকা খরচ করলে ওদের চিত্তের প্রসন্নতা জয় করা যায়! লাবণ্যর দাম কত টাকা!

* * * * *

এ বাড়ীতে শিবু একা—এ বাড়ী তার নিজস্ব। আপনার লোক বলতে তার কেউ নেই; বিবাহের জন্যও সে ব্যস্ত নয়। বাড়ীর একটা অংশ শুধু বাইরের লোকে পরিপূর্ণ। সাহেবরা এসে চা খায়, ঠোঁট রং-মাখানো মেয়েছেলে মাঝে মাঝে আসে, খাকি পোষাকপরা মেজর ও লেফটেন্যান্টকেও দেখা যায়। এ ছাড়া বন্ধু-বান্ধব,—কিন্তু

তারা বহু রকমের। কেউ ঘোড়-দৌড়ের মাঠের জুয়াড়ী, কেউ দালাল কেউ সাব-কণ্ট্রাক্টর, কেউ মাড়োয়াড়ী-ভাটিয়া। শিবু কিন্তু একা —একা থাকে মরুভূমিতে। তবু তার টাকা যখন আছে, সে সম্রাট। রুই-কাৎলা এখানে যারা আসে, শিবু তাদের দিকে চেয়ে থাকে। তারা আসে টাকার গন্ধে; ভালোবাসার জন্য নয়। শিবু সবাইকে টাকায় শাসন করে।

লাবণ্য এসেছে বটে তার বাড়ীতে। কিন্তু শিবুর কোন উদ্বেগ নেই সেজন্যে। লাবণ্যর প্রতি সে অনুরক্ত,—এ নিয়ে চিন্তাবিলাস করার সময় তার নেই। লাবণ্য সুশ্রী, লাবণ্য স্বাস্থ্যবতী,—তার জন্যে শিবুর রাতজাগা দুশ্চিন্তা নেই। লাবণ্যকে সে যদি না পায়, কিছু যায় আসে না; যদি পায়, এমন কিছু বড় পাওয়া তার হবে না। পেলে মন্দ নয়, না পেলে দুঃখ নেই। মেয়েদেরকে ভালোবাসার এবং তাদের কাছ থেকে ভালো-বাসা পাবার জন্য একটি শোভন স্বভাবের প্রয়োজন,—সেখানে তার দারিদ্র্য স্বীকার করতে হবে। ভালোবাসার জন্য সংস্কৃতি ও মহৎ শিক্ষার দরকার—সেটা কোথায় তার? সে তার জীবনে জানে দুটি জিনিষ— অনটন ও সচ্ছলতা। সে চরম দারিদ্র্য দেখে এসেছে এতকাল, এবার দেখেছে পরম সৌভাগ্যসম্পদ। এর মধ্যে আর কোথায়ও কিছু নেই। কাকে বলে সৌজন্যবোধ আর সমাজ-বুদ্ধি, কাকে বলে বিদ্যা অথবা মহৎ জ্ঞান, কাকে বলে প্রেমের করুন মধুর সাধনা,—ওসব বড় বড় কথা, ওসব পথে সে কোনো কালেই হাঁটেনি! ওসব তলিয়ে ভাববার সময়ও তার নেই।

খুড়িমা সেদিন বললেন, এই ত কতদিন হয়ে গেল, বেশ বেড়িয়ে নিলুম তোমার কলকাতায়, মোটরে চড়ে হাওয়া খেলুম, সিনেমা দেখে এলুম— বেশ কাটলো। এবার কবে আমরা যাবো শিবু, বল ত বাছা?

শিবু হেসে বললে, যাবেন কেমন করে? বলু যে চাকরি করছে?

খুড়িমা বললে, আমার চোখে ধুলো দিসনে শিবু,- ওইটুকু ছেলে কোন কাজই জানে না, তুই ওকে বসিয়ে বসিয়ে টাকা দেবার ফন্দি এঁটেছিস,— সত্যি কিনা বল্ ত?

শিবু বললে, সত্যিই কি যেতে চান খুড়িমা?

ওমা, ছেলের কথা শোনো। ঘর-দোর সব ফেলে রেখে এসেছি, তাড়াতাড়ি না গেলে যে দরজা-জানালাগুলো খুলে নিয়ে যাবে রে!

আমি যদি আপনাদের কলকাতায় থাকার সব ব্যবস্থা করে দিই?

তোর এখানে?

শিবু বললে, না, অন্য বাড়ীতে।

খুড়িমা বললেন, তোর এত আগ্রহ কেন শিবু?

শিবু থতমত খেয়ে কোনো জবাব সহসা খুঁজে পেলো না। একটু সামলে বললে, তোমাদের জন্যেই বলছি খুড়িমা। সেখানে তোমরা যেভাবে থাকো, তাতে ভাবনার কারণ আছে। তা ছাড়া আজকাল পাড়াগাঁয়ের যা অবস্থা! কিছুতেই ভালোভাবে থাকা যায় না।

খুড়িমা তখনকার মতো চুপ করে গেলেন।

শিবু ফিরে আসছিল, বারান্দার সঙ্কীর্ণ একটা পথে লাবণ্যর সঙ্গে দেখা। লাবণ্য হাসিমুখে বললে, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, ওসব কী আনিয়েছ আমার জন্যে?

শিবু হাসিমুখে বললে, ওসব আজকাল সবাই ব্যবহার করে।

লাবণ্য বললে, তাই বলে আমাকেও ঠোঁটে গালে রং মাখতে হবে, মুখখানায় পাউডার ঘষতে হবে—কেমন? এত শিখলে কোথায় শুনি? আমি কিন্তু ওসব মেখে তোমার সঙ্গে বেরোতে পারবো না, তা বলে দিচ্ছি।

শিবু বললে, তোমার বয়স কম হলে মল গড়িয়ে দিতুম।

লাবণ্য বললে, এখন বুঝি পায়ে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতে চাও?

শিবু হেসে বললে, চলো, এরপর টিকিট পাওয়া যাবে না—গাড়ী অপেক্ষা করছে।

চলো, আমি তৈরী।—বলে লাবণ্য প্রস্তুত হলো।

শিবু বললে, না, তা হবে না,—তোমার জন্যে কুড়ি টাকা দিয়ে রেশমী স্লিপার আনিয়েছি, ওটা পায়ে দিয়ে যেতেই হবে।

লাবণ্য কি যেন কতক্ষণ ভাবলো, তারপর বললে, আচ্ছা, তাই হবে—চলো।

শিবু আজ তার ছোট মোটরটি নিজেই হাঁকিয়ে চললো। পাশে বসেছে লাবণ্য। শেষ পর্যন্ত লাবণ্য তার মাকে লুকিয়ে একটুকু খানি টয়লেট করে

এসেছে। অবিশ্যি এটা এমন কিছু অপরাধ নয়। একটা কথা লাবণ্য বুঝতে পেরেছে, শিবুকে অকারণ আহত করাটা তার পক্ষে সঙ্গত নয়। বাস্তবিক, শিবু ত অনেক করেছে তাদের জন্যে। নিঃস্বার্থ এবং নিস্পৃহ ভাবেই করেছে,—তার বিরুদ্ধে কোনো নালিশ করবার কিছু নেই। আর যাই হোক, শিবুর প্রতি অবিচার করায় কোনো আত্মগৌরব নেই।

এক সময়ে লাবণ্য বললে, তোমার নেকলেসটা আমি নিতে পারিনি, তুমি খুব দুঃখ পেয়েছিলে, না শিবুদা ?

শিবু বললে, কই না, সেটা আমি ব্ল্যাক-মার্কেটে বেচে তিনশো টাকা লাভ পেয়েছি। তুমি আর একটা চাও ?

টয়লেট-করা লাবণ্যর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে এলো অপমানে। শুধু বললে, আর তুমি কিছু আমাকে দিয়ো না।

শিবুর কোনো দুঃখ নেই, কারণ তার হৃদয় নেই। লাবণ্য যদি মনে করে থাকে, শিবু তার প্রতি আসক্ত,—লাবণ্য ভুল করেছে। শিবুর মনে কোনো সুদূর অনুরাগও নেই,—প্রণয়মাধুর্যরসে কেউ আনন্দ ও স্বপ্নময় হয়ে ওঠে, এ বস্তু তার কল্পনার অতীত! নারীর সঙ্গে তার জীবনে কোনদিনই বোঝাপড়া নেই। ওটা তার আসে না।

সিনেমায় ঢুকে অন্ধকারে খুঁজে তারা পাশাপাশি দুটো সীটে এসে বসলো। কি ছবি, তা শিবু জানে না, দরকারও নেই। সিনেমায় এসেছে, এই যথেষ্ট। দুজনে বসলো পাশাপাশি—কিন্তু মাঝখানে কি দুস্তর ব্যবধান। দুজনে গায়ে গায়ে, পায়ে পায়ে,—কিন্তু দুইখণ্ড ঠাণ্ডা পাথর! লাবণ্য জানে, এটা ক্ষণস্থায়ী; শিবু জানে, এটা খেয়াল। শিবুর টাকা আছে, দামী সীট কিনেছে, মোটর আছে সঙ্গে, তার সঙ্গে একটি সুসজ্জিতা তরুণী হোলো মানানসই। এই তরুণীটি যদি লাবণ্য না হয়ে মিস্ মলি রায় কিম্বা লীনা স্ট্যানহোপ হোতো -কিছু মাত্র মনোবৈকল্য হোতো না। ওরা যে-কেউ হোলো প্রয়োজনের সামগ্রী ; টাকা, মোটর, টেলিফোন আর স্বাধীন প্রাসাদ হলেই ওরা আসে ; সময়মতো আবার ওরা চলে যায়। শিবু কথনও ভুল করেনি।

অন্ধকারে একখানা হাত উঠে এলো লাবণ্যর ঘাড়ের কাছে। ঘামে তার গ্রীবা সিক্ত এবং শীতল। লাবণ্য চমকে উঠলো, তারপর আস্তে

আস্তে হাত তুলে শিবুর হাতখানা অতি ধীরে সরিয়ে দিল। পুরুষ জানিয়ে দেয়, এই হাতখানা কাঁধে তুলে দেবার তাৎপর্য কি ; নারীও জন্ম থেকে জানে ওই হাতখানার ভাষা! অন্ধকারে আড়ষ্ট হয়ে লাবণ্য নিঃশব্দে ছবি দেখতে লাগলো।

সেদিন ওই পর্যন্ত। কি সিনেমা ভাঙার পর বাইরে আসতেই দুইজন বন্ধুর সঙ্গে শিবুর দেখা। তাদের সঙ্গে একটি মেয়ে। ওদের দেখে শিবুর চেহারা গেল বদলে। অত্যন্ত উৎসাহে সে লাবণ্যর সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিল। লাবণ্য যেন বাঁচলো এবার।

সবাই গেল নিউ মার্কেটে। সকলের পকেটেই তাড়া তাড়া নোট। পছন্দসই সামগ্রী জড়ো হোলো অজস্র। ওদের সকলেই টাকার মানুষ, টাকা খরচ করতে ওরা জানে। তিনটি ছেলে, আর দুটি মেয়ে তাদের সঙ্গে। অতঃপর ঘণ্টা তিনেক ধরে তাদের সঙ্গে নিয়ে শিবু কলকাতার পথে পথে টাকা ছড়াতে লাগলো।

ফিরবার পথে আবার সেই মোটরে দুজন নিঃসঙ্গ। কলকাতার পথে তখন আলোকনিয়ন্ত্রণ-বিধি বলবৎ রয়েছে। এক অন্ধকার থেকে অন্য অন্ধকারে তাদের মোটর চলেছে। লাবণ্য বসে রয়েছে চুপ করে শিবুর পাশে। শিবু সহজ, তার মনে প্রণয়ের ধোঁয়া নেই, রস-কল্পনার প্রলাপ নেই। ছোট লাহিড়ীর এই মেয়েটার স্বাস্থ্যটা সে চায়—এই নধর হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থ্যটা। লাবণ্য সহজ নয়, তার গ্রীবায় শিবুর সেই হাতের স্পর্শ এখনও ফোস্‌কার মতো জ্বালা করছে। ওই হাতখানার বক্তব্য সে কিছু বোঝেনি। যে-অংশটা বুঝতে পারেনি, সেইটির জন্য সে উৎসুক। এক সময়ে সে ডাকলো, শিবুদা?

লাবণ্যর অহঙ্কার অনেকটা কমে এসেছে ; তার আভিজাত্যবোধের উগ্রতা—তাও কোমল হয়ে এসেছে। এটা শিবুর কাছে নতুন নয়, সে এসব জানে—এমনিই হয়। মেয়েদের প্রাথমিক উগ্র অহঙ্কার আর ক্রুদ্ধ প্রতিরোধ এক সময় কমে আসে,—তাদেরকে আত্মসমর্পণ করার সময় দিতে হয়। লাবণ্য ন'শো টাকার নেকলেস গ্রহণ করেনি, এর পর নয় টাকার সেফ্‌টিপিন পেলে আহ্লাদে আটখানা হবে। এটা শিবুর ব্যক্তিগত নারীদর্শন, এখানে সে ভুল করে না। সে স্পষ্ট কণ্ঠে উত্তর দিল, কেন, কি বলছ?

লাবণ্য বললে না, কিছু না—বাড়ী আর কতদূরে ?

এই যে—বলে শিবু ক্যাঁচ করে মোটরের গতি কমিয়ে তার বাড়ীর ফটকের মধ্যে গাড়ী ঢুকিয়ে এক জায়গায় দাঁড় করালো।

দুজনে নামলো, তারপর শিবু ইচ্ছাপূর্বক লাবণ্যর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে জড়িয়ে ভিতরে চললো।

রাত এগারোটা বেজে গেছে। লাবণ্য ভুলে গিয়েছিল পল্লীজননীর উদ্বেগের চেহারাটা। সহসা অন্ধকার বারান্দাপথের একপ্রান্ত থেকে খুড়িমা বলে উঠলেন, এ কি, শিবু, লাবণ্য—এর মানে ?

চকিতে দুজনের হাত ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। লাবণ্য নতমুখে বললে, ফিরতে একটু দেরী হোলো, মা।

হুঁ—খুড়িমা বললেন, শিবু, এই কি তোমার মতলব ছিল ?

শিবু স্পষ্ট উত্তর দিল, কেন, খুড়িমা ?

কেন ? খুড়িমা তীব্র রুক্ষ কণ্ঠে বললেন, তোমার ভয়-ডর নেই, আমার মেয়ের গায়ে তুমি হাত দাও ?

কোনো দোষ করিনি, খুড়িমা !

খুড়িমা রাগে ও উত্তেজনায় কাঁপছিলেন। চেঁচিয়ে বললেন, তোমাকে বিশ্বাস করে 'তোমার বাড়ীতে এসেছিলুম,—মান খোয়াতে আসিনি! খবরদার শিবু,—আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি,—খবরদার—কাল আমরা চলে যাবো তোমার বাড়ী থেকে, কিন্তু যাবার আগে তুমি আমাদের ত্রিসীমানায় আসবে না—

লাবণ্য ঘরে গিয়ে ঢুকে ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছিল এবার তার মা দ্রুতপদে ভিতরে এলেন।

শিবু দাঁড়িয়ে ছিল অন্ধকারে হাসিমুখে। কোন চাঞ্চল্য তার মুখে-চোখে ছিল না। সে কেবল ভাবতে লাগলো, খুড়িমার অসন্তোষের গভীরতা কতখানি এবং কতগুলি টাকা খরচ করলে সেই অসন্তোষ টুকুর ওপর প্রলেপ দেওয়া যায়। এটা তার একটুখানি সাধারণ অভিজ্ঞতা মাত্র, তার কৌশল-বুদ্ধির সামান্য ত্রুটি—আর কিছু নয়। এটাকে অর্থব্যয়ে অতিক্রম করা দরকার, কেননা লাবণ্যর সঙ্গে তার বোঝাপড়া এখনও শেষ হয়নি।

সে রাত্রে শিবুর একটুও ঘুমের ব্যাঘাত হোলো না।

*　　　*　　　*　　　*

পরদিন খুড়িমা চলে যাবেন বটে, কিন্তু দেশে রওনা হবার খরচপত্র ছিল না। সারাদিন তিনি শিবুর অনুগ্রহের জন্য অপেক্ষা করে রইলেন, সন্ধ্যার দিকে বলুকে বাইরের দিকে খবর আনতে পাঠালেন। বলু ফিরে এসে সংবাদ দিল, শিবুদা এইমাত্র ফিরেছে, কিন্তু তার মোটর দুর্ঘটনা হয়েছে, আফিস-বাড়ীর ঘরে তিনি শুয়ে রয়েছেন।

বাঙালী মাতৃহৃদয় একটুখানি কেঁপে উঠলো। তিনি ভাবলেন, তবে কি তাঁর অভিশাপ লাগলো শিবুর? অনুশোচনায় খুড়িমার গলার আওয়াজ প্রসন্ন হয়ে এলো। বললেন, ওমা, জলজ্যান্ত ছেলে,—খুব লাগেনি ত?

বলু বললে, সেখানে অনেক লোক ঘিরে রয়েছে।

লাবণ্য উৎকণ্ঠিত হয়ে এক সময় বললে, বলু তুই মার কাছে থাক, আমি স্নান করে আসি।—এই বলে সে বেরিয়ে গেল।

ঝি দাঁড়িয়ে থাকে বাথরুমের কাছে ফরমাস খাটার জন্য। এদিক ওদিক তাকিয়ে ঝি বললে, দিদিমণি, বাবু আপনাকে একবার ডেকে পাঠালেন। দু'মিনিটের জন্যে।

লাবণ্যর সর্বশরীর রোমাঞ্চ হয়ে উঠলো। সেও এদিক-ওদিক লক্ষ্য করে বললে, চলো।

শিবুর ঘরে যাঁরা দাঁড়িয়েছিল, তারা লাবণ্যকে আসতে দেখে বেরিয়ে গেল। লাবণ্য এসে ঢুকলো শিবুর ঘরে। বিছানায় শুয়ে শিবু হাসিমুখে চুপি চুপি বললে, আমার কিছু হয়নি লাবণ্য, শুধু খুড়িমাকে যেতে দেবো না।

লাবণ্য স্তম্ভিত হয়ে বললে, কেন শিবুদা!

শুধু তোমার জন্যে। বসো এইখানে।

লাবণ্য বললে, কিন্তু মাকে লুকিয়ে আমি এসেছি।

শিবু বললে, তা আমি জানি,—লুকিয়ে তোমাকে আসতেই হবে। সবাই লুকিয়েই আসে।

লাবণ্য তার পাশে বসলো মোহাবিষ্টের মতো। শিবু হাত বাড়িয়ে লাবণ্যর একখানা হাত টেনে নিয়ে বললে, তুমিও যেতে চাও?

লাবণ্য বললে, হ্যাঁ, মা গেলে আমাকেও যেতে হবে। ওকি, হাত ছাড়ো, কেউ এসে পড়বে।

শিবু বললে, কেউ আসবে না তুমি এখানে থাকতে।

লাবণ্য বললে, আমি যে স্নানের নাম করে এসেছি।

শিবু বললে, খুড়িমাকে আমি জানিয়ে দেবো, আমি শয্যাগত। তুমিও চেষ্টা করো আর কয়েকদিন থাকতে—কেমন?

লাবণ্য বললে, আমাদের বেঁধে রাখতে চাও কেন তুমি?

শিবু হাসিমুখে তাকালো লাবণ্যর দিকে। বললে, বরফটা এখনও সম্পূর্ণ গলেনি, তাই জন্যে। তোমার যাবার সময় এখনও হয়নি, লাবণ্য।

লাবণ্য চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়াল। শিবু শেষবারের মতো তার হাতখানা টেনে একটু চাপ দিল। পরমুহূর্তে হাতখানা ছাড়িয়ে লাবণ্য ঘর থেকে বেরিয়ে হন হন করে চলে গেল।

দিন দুই কেটে গেল। খুড়িমা এখনও শিবুর মুখ দর্শন করেননি। কিন্তু তাঁর কানে উঠলো, শিবু খুব অসুস্থ, শয্যাগত—তার বুকে আঘাত লেগেছে, হৃদস্পন্দনের গণ্ডগোল ঘটছে। ডাক্তার আনাগোনা করে।

দিনচারেক পরে খুড়িমা শিবুর ঘরে এসে ডাকলেন, শিবু।

শিবু চোখ মেলে তাকালো, তার চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন। বললে, আমার যাই হোক খুড়িমা—কিন্তু তোমাদের মানসম্ভ্রম, তোমাদের ইজ্জত,—আমার বাড়িখানার চেয়ে অনেক উঁচু। আর লাবণ্য! লাবণ্য যে বংশের মেয়ে, আমি তার পায়ের তলায় থাকারও যোগ্য নয়। লাবণ্য কোন অন্যায় করে নি, করতে পারে না, খুড়িমা। আমি তোমার ভাতে মানুষ, তোমার পায়ের ধুলো—কিন্তু লাবণ্য যেন তোমার চোখে ছোট না হয়।

খুড়িমা বললেন, তুই কেমন আছিস বাবা?

বুকে ভারি ব্যথা, ডাক্তার ভয় পাচ্ছিলেন—তবে—

খুড়িমার মনের মেঘ অনেকটা কেটে গেছে। কাটবে, একথা শিবু জানতো। তিনি এক সময় প্রসন্ন মনে বিদায় নিলেন। তার পিছনদিকে তাকিয়ে শিবু বক্র তীক্ষ্ণ হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে এবার পাশ ফিরে শুলো।

আরও দু-চার দিন পরে বলু সেদিন মায়ের কাছে এসে একরাশি টাকা নামিয়ে দিল। খুড়িমা বললেন কিসের টাকা রে?

বলু বললে, বাঃ আমি যে আজ মাহিনে পেলুম?

মাইনে! এত টাকা? এত টাকা মাইনে পেলি তুই?

খুড়িমা অভিভূত আবিষ্ট হয়ে রইলেন। সেদিন সামান্য কয়টা টাকার জন্য তিনি এ বাড়ী থেকে চলে যেতে পারেননি, কিন্তু আজ বলুর উপার্জন হাতে নিয়ে তাঁকে ভাবতে হোলো, দেশে ফিরে গেলে এ টাকা তাঁর বন্ধ হবে। সেখানে তিনি আত্মসম্মান, আভিজাত্যবোধ এবং নিজের গর্ব নিয়ে অবশ্যই থাকতে পারবেন,—কিন্তু উপবাস করে থাকতে হবে। সেখানে কাপড় নেই, নুন তেল, চাল নেই, ওষুধ নেই,—পল্লীজীবনটা এখন কেবল একটা বিরাট শূন্য! সেটা অন্ধকার পল্লীগ্রাম, সেখানকার যুদ্ধ ইউরোপের ও এসিয়ার যুদ্ধের চেয়ে অনেক বড়, অনেক বিরাট—কারণ সেটা দৈনন্দিন অস্তিত্বরক্ষার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম। তার আদি অন্ত নেই।

এমন সময় একজন চাকর এসে শিবুর হাতের লেখা দু লাইন চিঠি দিয়ে গেল। শিবু লিখেছে, বলু আমার ছোটভাইয়ের মতন, কিন্তু তার জন্য আমি গর্ববোধ করছি। আমি জানি সে বুদ্ধিমান, সে উন্নতি করবে। আপনি কি যাবার দিন স্থির করেছেন, খুড়িমা? কিছুতেই কি আর থাকা সম্ভব নয়?

খুড়িমা স্তব্ধ হয়ে বসে ভাবতে লাগলেন, কোনো জবাব দিলেন না।

লাবণ্য ডাকলো, মা?

মা বললেন, কেন?

লাবণ্য বললে, দেশে যাওয়া মানে ত' সেই না খেয়ে মরা!

ছোট-লাহিড়ীর স্ত্রীর আভিজাত্য বোধ ফণা উঁচিয়ে উঠলো। বললেন, তুই কি এখানে থেকে মানসম্ভ্রম সব খোয়াতে চাস? ধর্ম নেই, ইজ্জত নেই? বংশের নাম নেই?

লাবণ্য শান্তভাবে বললে, সেখানে গিয়ে না খেয়ে মরলে মান বাঁচবে তোমার? একখানা ছেঁড়া কাপড়ও যদি না পাও, ধর্ম বাঁচবে? ভিক্ষেও যদি না জোটে, বংশের নাম রাখতে পারবে?

খুড়িমা লাবণ্যর দিকে একবার তাকালেন। লাবণ্যর পরণে একখানা

ক্রেপ-বেনারসী শাড়ী, গায়ে ব্রোকেডের ব্লাউস, পায়ে রেশমী চটি, দুই কানে পোকরাজের দুল দুলছে ; কিন্তু যাবার সময় শিবুর দেওয়া এ সমস্ত আভরণ আর পরিচ্ছদ ছেড়ে রেখে যেতে হবে। তিনি বললেন, তুই কি বলতে চাস, লাবণ্য ?

লাবণ্য মায়ের দিকে তাকালো। মায়ের পরণে গরদের থান, আর গরদের জামা। মা বসে রয়েছেন একটি কুশনে, মাথার উপরে ঘুরছে ইলেকট্রিক পাখা। এক মাসে মায়ের স্বাস্থ্য ফিরে গেছে। লাবণ্য পলকের জন্য আত্মসম্বরণ করে বললে, ধরো যদি আমি কলকাতায় কোনো একটা কাজ পাই,—তবে ভাই-বোনে চালাতে পারবো না ?

মা বললেন, লাহিড়ী বংশের মেয়ে চাকরি করে পেট চালাবে ?

পেটের দায়ে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে চাকরি করা ভালো। ভিক্ষের চেয়ে ভালো, চুরির চেয়ে ভালো।

তুই কি এই বাড়ীতে থাকার কথা বলছিস ?

না, আমরা ঘর ভাড়া করবো। নিজের মান নিজে রাখতে জানলে খোয়া যায় না, মা !

মা বললেন, কিন্তু দেশে সব পড়ে থাকবে ?

কি আছে সেখানে ? লাবণ্য বললে, ভাঙা দুটো বাক্স, মাটির হাঁড়ি-কলসী, ছেঁড়া কাপড় এক আধখানা, ময়লা দুর্গন্ধ বিছানা। আর বাড়ী ? দুখানা খড়ের চালা,—বৃষ্টি নামলে সমস্ত রাত দাঁড়িয়ে ভিজতে হয় ! বাড়ীর দিকে তাকালে চোরেরাও মুখ বেঁকিয়ে চলে যায়।

শিবু সেরে উঠলো, কেননা ঠিক সময় তাকে সেরে উঠতেই হবে। আর শুয়ে থাকলে তার চলবে না। সে মোটর নিয়ে বেরিয়ে গেল, তার অনেক কাজ। সন্ধ্যার দিকে ফিরে সে গিয়ে খুড়িমার কাছে দাঁড়ালো। বললে, লাবণ্যর জন্যে একটা কাজ সন্ধান করেছি, খুড়ীমা—

খুড়িমা প্রশ্ন করলেন, সেটা কি তোমার আপিসেই ?

না, সেটা সরকারী কাজ। তবে আমাকে সুপারিশ করে দিতে হবে। কাল সকালে লাবণ্য সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে।

কিন্তু লাবণ্য ইংরেজি জানে না।

শিবু বললে, যেটুকু জানে তাতেই চলবে, আমি বলে দেবো।

খুড়িমা বললেন, অত বড় মেয়ে রোজ যাবে চাকরি করতে! সেখানকার সাহেবেরা কেমন লোক, শিবু?

শিবু হাসিমুখে বললে, অন্তত আমার চেয়ে ভালো, খুড়িমা।

যদি লাবণ্যর চাকরি হয়, তবে আমরা গিয়ে অন্ত জায়গায় থাকবো, এ তোমাকে জানিয়ে রাখলাম, শিবু।

শিবু জানিয়ে দিল, আপনি যা স্থির করবেন, তাই হবে খুড়িমা।

খুড়িমা স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন। শিবু আস্তে আস্তে চলে গেল।

পরদিন শিবুর মোটরেই লাবণ্য বেরিয়ে পড়লো। কী একটা ক্রুর উল্লাস শিবুর মুখে-চোখে। লাবণ্যর সেই আত্মাভিমান আর আভিজাত্য বোধ কোথায় গেল? শিবুকে সে আর আঘাত করতে চায় না, শিবুর শিক্ষাহীনতা নিয়ে কঠোর বিদ্রূপ করে না। টাকার কাছে সে আত্মসমর্পণ করেছে, মিলিটারী কন্ট্রাক্টরের কাছে সে নারীর আত্মমর্যাদাকে আনত করেছে—শিবুর কি উল্লাস! ছোটলাহিড়ীর ভাত খেয়ে সে মানুষ,—কী জঘন্য সেই আত্মগ্লানি! যারা তাকে হীন অবজ্ঞাত মনে করত, তাদের কাছে আত্মপ্রতিষ্ঠা করায় কী আনন্দ! অনুগ্রহ প্রকাশ করায় কী গৌরব! দান গ্রহণ করানোয় কী নিবিড় পরিতৃপ্তি!

গাড়ী চলছে। লাবণ্য বললে, কোথায় তোমার সাহেবের আপিস?

শিবু হেসে বললে, আমাকে তুমি এখনও বিশ্বাস করো লাবণ্য?

লাবণ্য তার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললে, মানে?

শিবু বললে, লোকে চাকরি করে কেন, বলতে পারো?

লাবণ্য বললে টাকার জন্যে!

কিন্তু টাকার অভাব যদি তোমার না হয়?

তুমি দান করবে?

দান না ক'রে যদি তোমার দাবী মেটাই?

লাবণ্য প্রশ্ন করলো, তোমার কাছে কিসের দাবী আমার?

শিবু বললে কোন্ দাবীতে তুমি পাঁচশো টাকার দুল্ পরেছ কানে, আড়াইশো টাকার জামা কাপড় পরেছ?

লাবণ্য বললে, তুমি দিয়েছ তাই—

আমি দিইনি, তুমি পেয়েছ। পাবার অধিকার আছে তোমার, এখনও অনেক পাবে। আমার বাড়ীখানার দাম দেড় লক্ষ টাকা, আমার ব্যাঙ্কে আছে বারো লক্ষ, আমার কারবার চলছে দশ লক্ষ টাকার। শিবু একে একে সব বলে ফেললে।

অধীর উত্তেজনায় লাবণ্য কাঁপছে। শিবু যেন চারিদিক থেকে সহস্র বাহু দিয়ে তাকে নিপীড়িত ক'রে বাঁধতে চাইছে। সে যেন ছুটে পালাতে না পারে, যেন আর্তনাদ না করে। লাবণ্যর গলা শুকিয়ে উঠলো। বললে, তুমি আমাকে এত দিতে চাও কেন?

শিবু হঠাৎ হা-হা-হা ক'রে হেসে উঠলো। লাবণ্য কেঁপে উঠলো।

গাড়ীখানা এসে ঢুকলো এক বাগান বাড়ীতে। তখন মধ্যাহ্নকাল।

শিবু বললে, ভয় পেয়ো না, এ বাগানটা সেদিন আমি কিনেছি, সত্তর হাজার টাকায়।

লাবণ্য বললে, কে আছে এখানে?

কেউ নেই। কেবল মালী থাকে ওই আমতলার ওদিকের ঘরে।

আমাকে এখানে আনলে কেন?

শিবু বললে, ওপরতলাটা কেমন সাজিয়েছে তোমায় দেখাবো, নেমে এসো।

দুজনে নেমে বাগান পেরিয়ে দোতালায় উঠে গেল। অদূরে নিমগাছের ডগায় একটা ডাহুক তখন উচ্চ দীর্ঘকণ্ঠে যেন প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

প্রচুর অর্থব্যয়ের চিহ্ন চারিদিকে থরে থরে সাজানো। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় দেখা গেল, দুই পাশে অসংখ্য মূল্যবান ছবি। বিশ্বামিত্র ও উর্বশী, অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদার অরণ্য প্রণয়, শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিনী দল,—ইত্যাদি। দোতালার প্রকাণ্ড হলে ইতালীয় চিত্রাবলী, এডমণ্ড ডুলাকের নামজাদা ছবিগুলো, রাণী ইউজিনির সভাচিত্র, ফ্লোরেন্সের মেয়েরা, মধ্যযুগের নাইট এরাণ্ট, দান্তে ও বিয়াত্রিচে! বিভিন্ন প্রকার রোমাঞ্চকর ছবি ঝুলিয়ে যেন সমস্ত দোতালাটায় নরনারীর মনের একটি বিশেষ বক্তব্যকে প্রকাশ করা হচ্ছে।

লাবণ্য আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। শিবু বললে, কেমন লাগছে?

লাবণ্য ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

সন্ধ্যার সময় দুজনে গাড়ী নিয়ে ফিরে এলো। লাবণ্য অজস্র কথা বলতে বলতে এসেছে সমস্ত পথটায়—অধ্যবসায়ে আর উৎসাহে। ওর মধ্যেই শিবুকে সে উপদেশ দিয়েছে কত রকমের। শিবু যেন অত পরিশ্রম না করে, শিবুর স্বাস্থ্য যেন ভালো থাকে। শিবুর পাশে বসে লাবণ্য কত প্রলাপোক্তি করলো, কতবার তার পিঠে আর ঘাড়ের কাছে লাবণ্য নিজের হাতখানা রাখলো। শিবু মনে মনে হেসেছে। ছোট-লাহিড়ীর সেই আত্মগর্বী মেয়েটা অনেক নীচে এবার নেমে এসে তার পা দুখানা যেন লেহন করছে। শিবুর আর কোনো বক্তব্য নেই।

এবার সাবধানে অনেকখানি দূরত্ব মাঝখানে রেখে শিবু আর লাবণ্য ছোট-লাহিড়ীর আভিজাত্যাভিমানী পরিবারের কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে, খুড়িমা, লাবণ্যর এ চাকরিটা হোলো না।

খুড়িমা বললেন, হোলো না?

না, চাকরি পাওয়া লাবণ্যর পক্ষে সম্ভব নয়!

তা'র গলার আওয়াজ শুনে লাবণ্য একটু চমকে ফিরে তাকালো। শিবু বললে, আমি ভেবে ঠিক করেছি, আসছে কাল আপনাদের দেশেই ফিরে যেতে হবে; এদিকের ব্যবস্থা আমি সব ক'রে দেবো।

খুড়িমা বললেন, তুমি বলছ তোমার এ-বাড়ীতে আমাদের আর থাকা চলবে না?

লাবণ্য সহসা অধীর উত্তেজনায় কাঁপছে। কটাক্ষে তা'র দিকে একবার তাকিয়ে শিবু বললে, আপনি থাকবেন এ আমার সৌভাগ্য, কিন্তু শুনতে পাচ্ছি আপনাদের থাকা নিয়ে নানা কথা উঠেছে।

লাবণ্য আর্তনাদ ক'রে উঠলো, তোমার একথার মানে কি, শিবুদা?

শিবু শান্তকণ্ঠে বললে, বলুও আমার এখানে সুবিধে করতে পাচ্ছে না,—ছেলেমানুষ ত' বটে! ও আর কতটুকু জানে!

খুড়িমা বললেন. সে ত' বটেই। তা হ'লে আমাদের যাওয়াই স্থির হোলো?

শিবু হাসিমুখে বললে, আপনিও যাবো যাবো করছিলেন ক'দিন, —সেই ভালো। তা ছাড়া দেশের বাড়ী খালি পড়ে রয়েছে,—

আপনার শ্বশুরের ভিটেয় সন্ধ্যেয় আলো জ্বলবে না, সেটাও আমার পক্ষে দুঃখের কথা খুড়িমা।

লাবণ্য দুই চোখে আগুন ঠিকরিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, থাক, অনেক হয়েছে। চোরের মুখে ধর্মের কাহিনী শুনতে চাইনে। তুমি মিথ্যেবাদী, জোচ্চোর, প্রতারক! কিন্তু একথাও তোমাকে ব'লে রাখি, কলকাতাটা তোমার একার নয়।

খুড়িমা বললেন, চেঁচাস কেন লাবণ্য? যা বলে শোননা মন দিয়ে?

না, না—তুমি জানো না, মা—একটা অতি সাংঘাতিক বিষক্রিয়ায় লাবণ্যর সর্বাঙ্গটা যেন মুচড়ে দুমড়ে উঠছিল!

শিবু অচঞ্চলকণ্ঠে বললে, তা ছাড়া আর একটা কথা। আপনি অত বড় মেয়ে নিয়ে কলকাতার অজানা কোন্ গলিঘুঁজিতে থাকবেন, সেটা ভালো দেখা যাবে না!

তুমি ঠিক বলেছ, শিবু। আমার দেশে ফিরে যাওয়াই উচিত।

জড়িত অস্পষ্ট স্বরে ও-পাশ থেকে লাবণ্য বললে, বিশ্বাসঘাতক!

খুড়িমা এবার রাগ ক'রে বললেন, লাবণ্য, ছেলেটাকে কেন তুই মিছেমিছি গাল দিস্?

মিছেমিছি? তুমি ঠিক জানো? বেইমানকে তুমি বিশ্বাস করো মা?

শিবু হেসে বললে, মেয়ের চেহারা দেখেছেন, খুড়িমা? ওর দোষ নেই। যুগের হাওয়া, কলকাতার জল! যাক্‌গে, আমি আপনাদের যাবার খরচ একশো টাকা দেবো। আর যদি অনুমতি করেন তবে একটি অনুরোধ—

খুড়িমা বললেন, কি শিবু?

শিবু বললে, লাবণ্যর বিয়ের খরচ স্বরূপ আমি আপনার পায়ের কাছে হাজার পাঁচেক টাকা প্রণামী দিতে চাই!

কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে খুড়িমা বললেন, তুমি যথেষ্টই দিলে বাবা, আর কিছু চাইবার রাখলে না।

এমন সময় একজন চাকর এসে জানালো, আপনাকে ফোনে ডাকছে! শিবু মুখ ফিরিয়ে বললে, কে ডাকছে? কোত্থেকে? চাকরটা বললে, নীলিমা রায়—বালীগঞ্জ থেকে—

শিবু বললে, তবে ওই কথাই রইলো, খুড়িমা। কাল আপনাদের

এখান থেকে যাওয়া, বেলা দুটোর গাড়ী। সকালেই আমি সব টাকা পাঠিয়ে দেবো। তারপর আমাকে যেতে হবে একবার কলকাতার বাইরে।

খুড়িমার পায়ের ধুলো নিয়ে আর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না ক'রে শিবু চ'লে গেল। ওপাশে তখন লাবণ্য পাথরের মতো ব'সে আত্মগ্লানিতে, অনুশোচনায়, ক্লেদক্লিন্নতায় যেন একটা আদি অন্তহীন নরককুণ্ডের মধ্যে প'ড়ে অন্ধের মতো আঁকুপাঁকু করছে!

তেলেনাপোতা আবিষ্কার

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শনি ও মঙ্গলের, মঙ্গলই হবে বোধ হয়, যোগাযোগ হ'লে তেলেনাপোতা আপনারাও একদিন আবিষ্কার করতে পারেন। অর্থাৎ কাজে কর্ম্মে মানুষের ভিড় হাঁফিয়ে ওঠার পর যদি হঠাৎ দু'দিনের জন্যে ছুটি পাওয়া যায়—আর যদি কেউ এসে ফুসলানি দেয় যে কোন এক আশ্চর্য্য সরোবরে—পৃথিবীর সবচেয়ে সরলতম মাছেরা এখনো তাদের জল জীবনের প্রথম বঁড়শিতে হৃদয়বিদ্ধ করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে, আর জীবনে কখনো কয়েকটা পুঁটি ছাড়া অন্য কিছু জল থেকে টেনে তোলার সৌভাগ্য যদি আপনার না হয়ে থাকে, তাহলে হঠাৎ একদিন তেলেনাপোতা আপনিও আবিষ্কার করতে পারেন।

তেলেনাপোতা আবিষ্কার করতে হলে একদিন বিকেলবেলার পড়ন্ত রোদে জিনিষে মানুষে ঠাসাঠাসি একটা বাসে গিয়ে আপনাকে উঠতে হবে, তারপর রাস্তার ঝাঁকানির সঙ্গে মানুষের গুঁতো খেতে খেতে ভাদ্রের গরমে ঘামে, ধূলোয় চটচটে শরীর নিয়ে ঘণ্টা দু'য়েক বাদে রাস্তার মাঝখানে নেবে পড়তে হবে আচমকা। সামনে দেখবেন নীচু একটা জলার মত জায়গার ওপর দিয়ে রাস্তার লম্বা সাঁকো চলে গেছে। তারি ওপর দিয়ে বিচিত্র ঘর্ঘর শব্দে বাসটি চলে গিয়ে ওধারে পথের বাঁকে অদৃশ্য হবার পর দেখবেন সূর্য্য এখনো না ডুবলেও চারিদিক ঘনজঙ্গলে অন্ধকার হয়ে এসেছে। কোন দিকে চেয়ে জনমানব দেখতে পাবেন না। মনে হবে পাখীরাও যেন সভয়ে সে জায়গা পরিত্যাগ ক'রে চলে গেছে। একটা স্যাঁৎসেতে ভিজে ভাপসা আবহাওয়া টের পাবেন। মনে হবে, নীচের জলা থেকে একটা ক্রূর কুণ্ডলিত জলীয় অভিশাপ ধীরে ধীরে অদৃশ্য ফণা তুলে উঠে আসছে।

বড় রাস্তা থেকে নেমে সেই ভিজে জলার কাছেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে আপনাকে। সামনে ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মনে হবে একটা কাদা-জলের নালা কে যেন কেটে রেখেছে। সে নালার মত রেখাও কিছু দূরে গিয়ে দু'ধারে বাঁশ ঝাড় আর বড় বড় ঝাঁকড়া গাছের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কারের জন্যে আরো দু'জন বন্ধু ও সঙ্গী আপনার সঙ্গে থাকা উচিত। তারা হয়ত আপনার মত ঠিক মৎস্যলুব্ধ নয়, তবু এ অভিযানে তারা এসেছে,—কে জানে আর কোন অভিসন্ধিতে।

তিনজনে মিলে তারপর সামনের নালার দিকে উৎসুকভাবে চেয়ে থাকবেন। মাঝে মাঝে পা ঠুকে মশাদের ঘনিষ্ঠতায় বাধা দেবার চেষ্টা করবেন এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে এ ওর মুখের দিকে চাইবেন।

খানিক বাদে পরস্পরের মুখও আর ঘনায়মান অন্ধকারে ভালো করে দেখা যাবে না। মশাদের ঐক্যতান আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে। আবার বড় রাস্তায় উঠে ফিরতি কোন বাসের চেষ্টা করবেন কি না যখন ভাবছেন, তখন হঠাৎ সেই কাদা জলের নালা যেখানে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে, সেখান থেকে অপরূপ একটি শ্রুতিবিস্ময়কর আওয়াজ পাবেন। মনে হবে বোবা জঙ্গল থেকে কে যেন অমানুষিক এক কান্না নিংড়ে নিংড়ে বার করছে।

সে শব্দে আপনারা কিন্তু প্রতীক্ষায় চঞ্চল হয়ে উঠবেন। প্রতীক্ষাও আপনাদের ব্যর্থ হবে না। আবছা অন্ধকারে প্রথমে একটি ক্ষীণ আলো দুলতে দেখা যাবে ও তারপর একটি গরুর গাড়ি জঙ্গলের ভেতর থেকে নালা দিয়ে ধীর মন্থর দোদুল্যমান গতিতে বেরিয়ে আসবে।

যেমন গাড়িটি তেমনি গরুগুলি- মনে হবে পাতালের কোন বামনের দেশ থেকে গরুর গাড়ির এই ক্ষুদ্র সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি বেরিয়ে এসেছে।

বৃথা বাক্য ব্যয় না করে সেই গরুর গাড়ার ছই-এর ভেতর তিনজনে কোন রকমে প্রবেশ করবেন ও তিন জোড়া হাত ও পা এবং তিনটি মাথা নিয়ে স্বল্পতম স্থানে সর্ব্বাধিক বস্তু কি ভাবে সংস্থাপিত করা যায় সে সমস্যার মীমাংসা করবেন।

গরুর গাড়িটি তারপর যে পথে এসেছিল, সেই পথে অথবা নালায়

ফিরে চলতে সুরু করবে। বিস্মিত হয়ে দেখবেন, ঘন অন্ধকার অরণ্য যেন সঙ্কীর্ণ একটু সুড়ঙ্গের মত পথ সামনে একটু একটু করে উন্মোচন করে দিচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হবে কালো অন্ধকারের দেয়াল বুঝি অভেদ্য কিন্তু তবু গরুর গাড়িটি অবিচলিতভাবে ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে যাবে পায়ে পায়ে পথ যেন ছড়িয়ে ছড়িয়ে।

কিছুক্ষণ হাত, পা ও মাথার যথোচিত সংস্থান বিপর্য্যস্ত হবার সম্ভাবনায় বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করবেন। বন্ধুদের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে অনিচ্ছাকৃত সঙ্ঘর্ষ বাধবে, তারপর ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন চারিধারের গাঢ় অন্ধকারে চেতনার শেষ অন্তরীপটিও নিমজ্জিত হয়ে গেছে। মনে হবে পরিচিত পৃথিবীকে দূরে কোথায় ফেলে এসেছেন। অনুভূতিহীন কুয়াশাময় এক জগৎ শুধু আপনার চারিধারে। সময় সেখানে স্তব্ধ, স্রোতহীন।

সময় স্তব্ধ, সুতরাং এ আচ্ছন্নতা কতক্ষণ ধরে যে থাকবে বুঝতে পারবেন না। হঠাৎ এক সময় উৎকট এক বাদ্য-ঝঞ্ঝনায় জেগে উঠে দেখবেন, ছই-এর ভেতর দিয়ে আকাশের তারা দেখা যাচ্ছে এবং গাড়ির গাড়োয়ান থেকে থেকে সোৎসাহে একটি ক্যানেস্তারা বাজাচ্ছে।

কৌতূহলী হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে গাড়োয়ান নিতান্ত নির্ব্বিকার-ভাবে আপনাকে জানাবে,—এজ্ঞে, ওই শালার বাঘ খেদাতে।

ব্যাপারটা ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করার পর, মাত্র ক্যানাস্তারা-নিনাদে ব্যাঘ্র-বিতাড়ন সম্ভব কিনা কম্পিত কণ্ঠে এ প্রশ্ন আপনি উত্থাপন করবার আগেই গাড়োয়ান আপনাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে জানাবে যে, বাঘ মানে চিতাবাঘ মাত্র এবং নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত না হ'লে এই ক্যানাস্তারানিনাদই তাকে তফাৎ রাখবার পক্ষে যথেষ্ট।

মহানগরী থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে ব্যাঘ্র-সঙ্কুল এরকম স্থানের অস্তিত্ব কি করে সম্ভব আপনি যতক্ষণ চিন্তা করবেন ততক্ষণে গরুর গাড়ি বিশাল একটি মাঠ পার হয়ে যাবে। আকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষের বিলম্বিত ক্ষয়িত চাঁদ বোধ হয় উঠে এসেছে। তারই স্তিমিত আলোয় আবছা বিশাল মৌন সব প্রহরী যেন গাড়ীর দু'পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে সরে যাবে। প্রাচীন অট্টালিকার সে সব ধ্বংসাবশেষ,—কোথাও একটা থাম, কোথাও একটা

দেউড়ির খিলান, কোথাও কোনো মন্দিরের ভগ্নাংশ, মহাকালের কাছে সাক্ষ্য দেবার ব্যর্থ আশায় দাঁড়িয়ে আছে।

ওই অবস্থায় যতখানি সম্ভব মাথা তুলে বসে কেমন একটা শিহরণ সারা শরীরে অনুভব করবেন। জীবন্ত পৃথিবী ছাড়িয়ে অতীতের কোন কুজ্মটিকাচ্ছন্ন স্মৃতিলোকে এসে পড়েছেন বলে ধারণা হবে।

রাত তখন কত আপনি জানেন না, কিন্তু মনে হবে এখানে রাত যেন কখনও ফুরোয় না। নিবিড় অনাদি অনন্ত স্তব্ধতায় সব কিছু নিমগ্ন হয়ে আছে; যাদুঘরের নানা প্রাণীদেহ আরকের মধ্যে যেমন থাকে।

দু'তিনবার মোড় ঘুরে গরুর গাড়ি এবার এক জায়গায় এসে থামবে। হাত পাগুলো নানাস্থান থেকে কোন রকমে কুড়িয়ে সংগ্রহ করে কাঠের পুতুলের মত আড়ষ্টভাবে আপনারা একে একে নামবেন। একটা কটু গন্ধ অনেকক্ষণ ধরেই আপনাদের অভ্যর্থনা করছে। বুঝতে পারবেন সেটা পুকুরের পানা পচা গন্ধ। অর্দ্ধস্ফুট চাঁদের আলোয় তেমন একটি নাতিক্ষুদ্র পুকুর সামনেই চোখে পড়বে। তারই পাশে বেশ বিশালায়তন একটি জীর্ণ অট্টালিকা ভাঙ্গা ছাদ, ধ্বসে পড়া দেওয়াল ও চক্ষুহীন কোটরের মত পাল্লাহীন জান্‌লা নিয়ে চাঁদের বিরুদ্ধে দুর্গ-প্রাকারের মত দাঁড়িয়ে আছে।

এই ধ্বংসাবশেষেরই একটি অপেক্ষাকৃত বাসযোগ্য ঘরে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। কোথা থেকে গাড়োয়ান একটি ভাঙ্গা লণ্ঠন নিয়ে এসে ঘরে বসিয়ে দেবে। সেই সঙ্গে এক কলসি জল। ঘরে ঢুকে বুঝতে পারবেন বহুযুগ পরে মনুষ্যজাতির প্রতিনিধি হিসাবে আপনারাই সেখানে প্রথম পদার্পন করেছেন। ঘরের ঝুল, জঞ্জাল ও ধুলো হয়ত কেউ আগে কখন পরিষ্কার করার ব্যর্থ চেষ্টা করে গেছে। ঘরের অধিষ্ঠাত্রী আত্মা যে তাতে ক্ষুব্ধ, একটি অস্পষ্ট ভাপসা গন্ধে তার প্রমাণ পাবেন। সামান্য চলাফেরায় ছাদ ও দেওয়াল থেকে জীর্ণ পলস্তারা সেই রুষ্ট আত্মার অভিশাপের মত থেকে থেকে আপনাদের ওপর বর্ষিত হবে। দু'তিনটি চামচিকা ঘরের অধিকার নিয়ে আপনাদের সঙ্গে সমস্ত রাত বিবাদ করবে।

তেলেনাপোতা অবিষ্কারের জন্যে আপনার দু'টি বন্ধুর একজন পান-

রসিক ও অপরজনের নিদ্রা-বিলাসী কুম্ভকর্ণের দোসর হওয়া দরকার। ঘরে পৌঁছেই, মেঝের ওপর কোনরকমে সতরঞ্চির আবরণ পড়তে না পড়তে একজন তার উপর নিজেকে বিস্তৃত করে নাসিকা ধ্বনি করতে সুরু করবেন, অপরজন পানপাত্রে নিজেকে নিমজ্জিত করে দেবেন।

রাত বাড়বে। ভাঙ্গা লণ্ঠনের কাঁচের চিমনি ক্রমশঃ গাঢ়ভাবে কালিমা-লিপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে যাবে। কোন রহস্যময় বেতার-সঙ্কেতে খবর পেয়ে সে অঞ্চলের সমস্ত সমর্থ সাবালক মশা নবাগতদের অভিনন্দন জানাবে ও তাদের সঙ্গে শোণিত সম্বন্ধ স্থাপন করতে আসবে। আপনি বিচক্ষণ হ'লে দেওয়ালে ও গায়ে বসবার বিশিষ্ট ভঙ্গি দেখে বুঝবেন, তারা মশাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কুলীন,—ম্যালেরিয়া দেবীর অদ্বিতীয় বাহন অ্যানোফিলিস। আপনার দুই বন্ধু তখন দুই কারণে অচেতন। ধীরে ধীরে তাই শয্যা পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়াবেন, তারপর গুমোট গরম থেকে একটু পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে টর্চটি হাতে নিয়ে ভগ্নপ্রায় সিঁড়ি দিয়ে ওপরের ছাদে ওঠবার চেষ্টা করবেন।

প্রতি মুহূর্ত্তে কোথাও ইট বা টালি খসে পড়ে ভূপতিত হওয়ায় বিপদ আপনাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করবে, তবু কোন দুর্ব্বার আকর্ষণে সমস্ত অগ্রাহ্য করে আপনি ওপরে না উঠে পারবেন না।

ছাদে গিয়ে দেখবেন, অধিকাংশ জায়গাতে আলিসা ভেঙ্গে ধূলিসাৎ হয়েছে, ফাটলে ফাটলে অরণ্যের পঞ্চম বাহিনী ষড়যন্ত্রের শিকড় চালিয়ে ভেতর থেকে এ অট্টালিকার ধ্বংসের কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে; তবু কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদের আলোয় সমস্ত কেমন অপরূপ মোহময় মনে হবে। মনে হবে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে এই মৃত্যু সুষুপ্তি মগ্ন মায়াপুরীর কোন গোপন প্রকোষ্ঠে বন্দিনী রাজকুমারী সোনার কাঠি রূপার কাঠি পাশে নিয়ে যুগান্তের গাঢ় তন্দ্রায় অচেতন, তা যেন আপনি টের পাবেন। সেই মুহূর্ত্তে অদূরে সঙ্কীর্ণ রাস্তার ওপারে একটি ভগ্নস্তূপ বলে যা মনে হয়েছিল তারই একটি জানালায় একটি আলোর ক্ষীণ রেখা অপনি হয়তো দেখতে পাবেন। সেই আলোর রেখা আড়াল করে একটি রহস্যময় ছায়ামূর্ত্তি সেখানে এসে দাঁড়াবে। গভীর নিশীথরাত্রে কে যে এই বাতায়নবর্ত্তিনী, কেন যে তার চোখে ঘুম নেই আপনি ভাববার চেষ্টা করবেন, কিন্তু কিছু

বুঝতে পারবেন না। খানিক বাদে মনে হবে সবই বুঝি আপনার চোখের ভ্রম। বাতায়ন থেকে সে ছায়া সরে গেছে, আলোর ক্ষীণ রেখা গেছে মুছে। মনে হবে এই ধ্বংসপুরীর অতল নিদ্রা থেকে একটি স্বপ্নের বুদ্বুদ ক্ষণিকের জন্ম জীবনের জগতে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে গেছে।

আপনি আবার সন্তর্পণে নিচে নেমে আসবেন এবং কখন এক সময়ে দুই বন্ধুর পাশে একটু জায়গা করে ঘুমিয়ে পড়বেন জানতে পারবেন না!

যখন জেগে উঠবেন তখন অবাক হয়ে দেখবেন এই রাত্রির দেশেও সকাল হয়, পাখীর কলরবে চারিদিক ভরে যায়।

আপনার আসল উদ্দেশ্য অপনি নিশ্চয় বিস্মৃত হবেন না। এক সময়ে ষোড়শোপচার আয়োজন নিয়ে মৎস্য আরাধনার জন্যে শ্যাওলা ঢাকা ভাঙ্গা ঘাটের একটি ধারে বসে গুঁড়ি পানায় সবুজ জলের মধ্যে যথোচিত নৈবেদ্য সমেত বঁড়শি নামিয়ে দেবেন।

বেলা বাড়বে। ওপারের ঝুঁকে পড়া একটা বাঁশের ডগা থেকে একটা মাছরাঙা পাখী ক্ষণে ক্ষণে আপনাকে যেন উপহাস করবার জন্যেই বাতাসে রঙের ঝিলিক বুলিয়ে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে ও সার্থক শীকারের উল্লাসে আবার বাঁশের ডগায় ফিরে গিয়ে দুর্বোধ ভাষায় আপনাকে বিদ্রূপ করবে। আপনাকে সন্ত্রস্ত করে একটা মোটা লম্বা সাপ ভাঙ্গা ঘাটের কোন ফাটল থেকে বেরিয়ে ধীর অচঞ্চল গতিতে পুকুরটা সাঁতরে পার হয়ে ওধারে গিয়ে উঠবে, দুটো ফড়িং পাল্লা দিয়ে পাৎলা কাঁচের মত পাখা নেড়ে আপনার ফাৎনাটার ওপর বসবার চেষ্টা করবে ও থেকে থেকে উদাস ঘুঘুর ডাকে আপনি আনমনা হয়ে যাবেন।

তারপর হঠাৎ জলের শব্দে আপনার চমক ভাঙবে। নিথর জলে ঢেউ উঠেছে, আপনার ছিপের ফাৎনা মৃদুমন্দ ভাবে তাতে দুলছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখবেন একটি মেয়ে পেতলের একটি ঝকঝকে ঘড়ায় পুকুরের পানা ঢেউ দিয়ে সরিয়ে জল ভরছে। মেয়েটির চোখে কৌতূহল আছে কিন্তু গতিবিধিতে সলজ্জ আড়ষ্টতা নেই। সোজাসুজি সে আপনার দিকে তাকাবে, আপনার ফাৎনা লক্ষ্য করবে, তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে ঘড়াটা কোমরে তুলে নেবে।

মেয়েটি কোন্ বয়সের আপনি বুঝতে পারবেন না। তার মুখের শান্ত করুণ গাম্ভীর্য্য দেখে মনে হবে জীবনের সুদীর্ঘ নির্ম্মম পথ সে পার হয়ে এসেছে, তার ক্ষীণ দীর্ঘ অপুষ্ট শরীর দেখলে মনে হবে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়া তার যেন স্থগিত হয়ে আছে।

কলসি নিয়ে চলে যেতে যেতে ফিরে তাকিয়ে মেয়েটি হঠাৎ বলবে, "বসে আছেন কেন? টান দিন।"

সে কণ্ঠ এমন শান্ত মধুর ও গম্ভীর যে এভাবে আপনা থেকে অপরিচিতের সঙ্গে কথা বলা আপনার মোটেই অস্বাভাবিক ঠেকবে না। শুধু আকস্মিক চমকের দরুণ বিহ্বল হয়ে ছিপে টান দিতে আপনি ভুলে যাবেন। তারপর ডুবে যাওয়া ফাৎনা আবার ভেসে ওঠবার পর ছিপ তুলে দেখবেন বঁড়শিতে টোপ আর নেই। একটু অপ্রস্তত ভাবে মেয়েটির দিকে আপনাকে একবার তাকাতেই হবে। সেও মুখ ফিরিয়ে শান্ত ধীরে পদে ঘাট ছেড়ে যাবে, কিন্তু মনে হবে মুখ ফেরাবার চকিত মুহূর্ত্তে একটু যেন দীপ্ত হাসির আভাস সেই শান্ত করুণ মুখে খেলে গেছে।

পুকুরের ঘাটের নির্জ্জনতা আর ভঙ্গ হবে না তারপর। ওপারের মাছরাঙাটা আপনাকে লজ্জা দেবার নিষ্ফল চেষ্টা ত্যাগ করে অনেক আগেই উড়ে গেছে। মাছেরা আপনার শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে গভীর অবজ্ঞা নিয়েই বোধ হয় আর দ্বিতীয়বার প্রতিযোগিতায় নামতে চাইবে না। খানিক আগের ঘটনাটা আপনার কাছে অবাস্তব বলে মনে হবে। এই জনহীন ঘুমের দেশে সত্যি ওরকম মেয়ে কোথাও আছে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না।

এক সময় হতাশ হয়ে আপনাকে সাজসরাঞ্জাম নিয়ে উঠে পড়তে হবে। ফিরে গিয়ে হয়ত দেখবেন আপনার মৎস্যশিকার নৈপুণ্যের বৃত্তান্ত ইতিমধ্যে কেমন করে আপনার বন্ধুদের কর্ণগোচর হয়েছে। তাদের পরিহাসে ক্ষুণ্ণ হয়ে এ কাহিনী কোথায় তারা শুনল, জিজ্ঞাসা করে হয়ত আপনার পান-রসিক বন্ধুর কাছে শুনবেন,—"কে আবার বলবে! এই মাত্র যামিনী নিজের চোখে দেখে এল যে!

আপনাকে কৌতূহলী হয়ে যামিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই হবে। তখন হয়ত জানতে পারবেন যে, পুকুর ঘাটের সেই অবাস্তব করুণনয়না

মেয়েটি আপনার পান রসিক বন্ধুটিরই জ্ঞাতিস্থানীয়া। সেই সঙ্গে আরো শুনবেন যে, দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থাটা সেদিনকার মত তাদের ওখানেই হয়েছে।

যে ভগ্নস্তূপে গত রাত্রে ক্ষণিকের জন্তে একটি ছায়ামূর্ত্তি আপনার বিস্ময় উৎপাদন করেছিল, দিনের রূঢ় আলোয় তার শ্রীহীন জীর্ণতা আপনাকে অত্যন্ত পীড়িত করবে। রাত্রির মায়াবরণ সরে গিয়ে তার নগ্ন ধ্বংস মূর্ত্তি এত কুৎসিত হয়ে উঠতে পারে আপনি ভাবতে পারেন নি।

এইটিই যামিনীদের বাড়ী জেনে আপনি অবাক হবেন। এই বাড়িরই একটি ঘরে আপনাদের হয়ত আহারের ব্যবস্থা হয়েছে। আয়োজন যৎসামান্ত, হয়ত যামিনী নিজেই পরিবেশন করছে। মেয়েটির অনাবশ্যক লজ্জা বা আড়ষ্টতা যে নেই আপনি আগেই লক্ষ্য করেছেন, শুধু কাছে থেকে তার মুখের করুণ গাম্ভীর্য্য আরো বেশী করে আপনার চোখে পড়বে। এই পরিত্যক্ত বিস্মৃত জনহীন লোকালয়ের সমস্ত মৌন বেদনা যেন তার মুখে ছায়া ফেলেছে। সব কিছু দেখেও তার দৃষ্টি যেন গভীর এক ক্লান্তির অতলতায় নিমগ্ন! একদিন যেন এই ধ্বংসস্তূপেই ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবে।

আপনাদের পরিবেশন করতে করতে দু'চারবার তাকে তবু চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে আপনি দেখবেন। ওপর তলার কোন ঘর থেকে ক্ষীণ একটা কণ্ঠ যেন কাকে ডাকছে। যামিনী ব্যস্ত হয়ে বাইরে চলে যাবে। প্রত্যেকবার ফিরে আসবার সঙ্গে তার মুখে বেদনার ছায়া যেন আরো গভীর হয়ে উঠেছে মনে হবে—সেই সঙ্গে কেমন একটা অসহায় অস্থিরতা তার চোখে।

খাওয়া শেষ করে আপনারা তখন একটু বিশ্রাম করতে পারেন। অত্যন্ত দ্বিধাভরে কয়েকবার ইতস্ততঃ করে সে যেন শেষে মরিয়া হয়ে দরজা থেকে ডাকবে, "একটু এখানে শুনে যাও মণিদা।"

মণিদা আপনার সেই পান-রসিক বন্ধু। তিনি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পর যে আলাপটুকু হবে তা এমন নিম্নস্বরে নয় যে, আপনারা শুনতে পাবেন না।

শুনবেন, যামিনী অত্যন্ত কাতর স্বরে বিপন্নভাবে বলছে, "মা'ত কিছুতেই শুনছেন না। তোমাদের আসার খবর পাওয়া অবধি কি যে অস্থির হয়ে উঠেছেন কি বলব।"

মণি একটু বিরক্তির স্বরে বলবে, "ওঃ সেই খেয়াল এখনো! নিরঞ্জন এসেছে, ভাবছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ, কেবলই বলছেন,—'সে নিশ্চয় এসেছে। শুধু লজ্জায় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারছে না, আমি জানি। তাকে ডেকে দে। কেন তুই আমার কাছে লুকোচ্ছিস!' কি যে আমি করব ভেবে পাচ্ছি না। অন্ধ হয়ে যাবার পর থেকে আজকাল এত অধৈর্য্য বেড়েছে যে, কোন কথা বুঝোলে বোঝেন না, রেগে মাথা খুঁড়ে এমন কাণ্ড করেন যে তখন ওঁর প্রাণ বাঁচান দায় হয়ে ওঠে!"

"হুঁ, এ'ত বড় মুস্কিল দেখছি। চোখ থাকলেও না হয় দেখিয়ে দিতাম যে যারা এসেছে তাদের কেউ নিরঞ্জন নয়।"

ওপর থেকে দুর্ব্বল অথচ তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধ কণ্ঠের ডাকটা এবার আপনারাও শুনতে পাবেন। যামিনী এবার কাতর কণ্ঠে অনুনয় করবে, "তুমি একবারটি চল মণিদা, যদি একটু বুঝিয়ে শুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পার।"

"আচ্ছা তুই যা, আমি আসছি।"—মণি এবার ঘরে ঢুকে নিজের মনেই বলবে, "এ এক আচ্ছা জ্বালা হয়েছে যা হোক। বুড়ির হাত পা পড়ে গেছে, চোখ নেই তবু বুড়ি পণ করে বসে আছে কিছুতেই মরবে না।"

ব্যাপারটা কি এবার আপনারা হয়ত জানতে চাইবেন। মণি বিরক্তির স্বরে বলবে, "ব্যাপার আর কি! নিরঞ্জন বলে ওঁর দূর সম্পর্কের এক বোনপোর সঙ্গে ছেলেবেলায় যামিনীর সম্বন্ধ উনি ঠিক করেছিলেন। বছর চারেক আগেও সে ছোকরা এসে ওঁকে বলে গেছল বিদেশের চাকরী থেকে ফিরে ওঁর মেয়েকে সে বিয়ে করবে। সেই থেকে বুড়ি এই অজগর পুরীর ভেতর বসে সেই আশায় দিন গুণছে।"

আপনি নিজে থেকে এবার জিজ্ঞাসা না করে পারবেন না, "নিরঞ্জন কি এখনো বিদেশ থেকে ফেরে নি?"

"আরে সে বিদেশে গেছল কবে যে ফিরবে! নেহাৎ বুড়ি নাছোড়বান্দা

বলে তাঁকে এই ধাপ্পা দিয়ে গেছল। এমন ঘুঁটেকুড়ুনির মেয়েকে উদ্ধার করতে তার দায় পড়েছে। সে কবে বিয়ে থা করে দিব্যি সংসার করছে। কিন্তু সে কথা ওঁকে বলে কে? বল্লে বিশ্বাসই করবেন না, আর বিশ্বাস যদি করেন তা হ'লে এখুনি ত দম ছুটে অক্কা! কে মিছিমিছি পাতকের ভাগী হবে?"

"যামিনী নিরঞ্জনের কথা জানে?"

"তা আর জানে না! কিন্তু মার কাছে বলবার উপায় ত নেই। যাই, কর্ম্মভোগ সেরে আসি!" ব'লে মণি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াবে।

সেই মুহূর্ত্তে নিজের অজ্ঞাতসারেই আপনাকে হয়ত উঠে দাঁড়াতে হবে। হঠাৎ হয়ত বলে ফেলবেন, "চল, আমিও যাব।"

"তুমি যাবে!" মণি ফিরে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে নিশ্চয় আপনার দিকে তাকাবে।

"হ্যাঁ, কোন আপত্তি আছে গেলে?"

"না, আপত্তি কিসের!" বলে বেশ বিমূঢ়ভাবেই মণি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

সঙ্কীর্ণ অন্ধকার ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে যে ঘরটিতে আপনি পৌছোবেন, মনে হবে, ওপরে নয়, মাটির তলার সুড়ঙ্গেই বুঝি তার স্থান। একটি মাত্র জানালা, তাও বন্ধ, বাইরের আলো থেকে এসে প্রথমে আপনার চোখে সবই ঝাপসা ঠেকবে, তারপর টের পাবেন, প্রায় ঘরজোড়া একটি ভাঙা তক্তাপোষে ছিন্ন কন্থা জড়িত একটি শীর্ণ কঙ্কালসার মূর্ত্তি শুয়ে আছে। তক্তাপোষের একপাশে যামিনী পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে।

আপনাদের পদশব্দ শুনে সেই কঙ্কালের মধ্যেও যেন চাঞ্চল্য দেখা দেবে: "কে, নিরঞ্জন এলি? অভাগী মাসিকে এতদিনে মনে পড়ল, বাবা তুই আসবি বলে প্রাণটা যে আমার কণ্ঠায় এসে আটকে আছে। কিছুতেই যে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারছিলাম না। এবার ত আর অমন করে পালাবি না?"

মণি কি যেন বলতে যাবে, তাকে বাধা দিয়ে আপনি অকস্মাৎ বলবেন, "না মাসিমা, আর পালাব না।"

মুখ না তুলেও মণির বিমূঢ়তা ও আর একটি স্থাণুর মত মেয়ের মুখে

স্তম্ভিত বিস্ময় আপনি যেন অনুভব করতে পারবেন। কিন্তু কোনদিকে তাকাবার অবসর আপনার থাকবে না। দৃষ্টিহীন দুটি চোখের কোটরের দিকে আপনি তখন নিস্পন্দ হয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে চেয়ে আছেন। মনে হবে সেই শূন্য কোটরের ভেতর থেকে অন্ধকারের দুটি কালো শিখা বেরিয়ে এসে যেন আপনার সর্ব্বাঙ্গ লেহন করে পরীক্ষা করছে। ক'টি স্তব্ধ মুহূর্ত্ত ধীরে ধীরে সময়ের সাগরে শিশির বিন্দুর মত ঝরে পড়ছে আপনি অনুভব করবেন। তারপর শুনতে পাবেন, "আমি জানতাম তুই না এসে পারবি না বাবা। তাইত এমন করে এই প্রেতপুরী পাহারা দিয়ে দিন গুণছি।"

বৃদ্ধা এতগুলি কথা বলে হাঁপাবেন; চকিতে একবার যামিনীর ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আপনার মনে হবে বাইরের কঠিন মুখোসের অন্তরালে তার মধ্যেও কোথায় যেন কি ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে—ভাগ্য ও জীবনের বিরুদ্ধে, গভীর হতাশার উপাদানে তৈরী এক সুদৃঢ় শপথের ভিত্তি আলগা হয়ে যেতে আর বুঝি দেরী নেই।

বৃদ্ধা আবার বলবেন, "যামিনীকে নিয়ে তুই সুখী হবি বাবা। আমার পেটে হয়েছে বলে বলছি না, এমন মেয়ে হয় না। শোকে-তাপে বুড়ো হয়ে মাথার ঠিক নেই, রাতদিন খিটখিট করে মেয়েটাকে যে কত যন্ত্রণা দিই—তা কি আমি জানি না! তবুও মুখের ওর রা নেই। এই শ্মশানের দেশ—দশটা বাড়ী খুঁজলে একটা পুরুষ মেলে না। আমার মত ঘাটের মড়ারা শুধু ভাঙা ইঁট আঁকড়ে এখানে সেখানে ধুঁকছে, এরই মধ্যে একাধারে মেয়ে পুরুষ হয়ে ও কিনা করছে!"

একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও চোখ তুলে একটিবার তাকাতে আপনার সাহস হবে না। আপনার নিজর চোখের জলে বুঝি আর গোপন রাখা যাবে না।

বৃদ্ধা ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন, "যামিনীকে তুই নিবি ত বাবা! তোর শেষ কথা না পেলে আমি মরেও শান্তি পাব না।"

ধরা গলায় আপনি তখন শুধু বলতে পারবেন, "আমি তোমায় কথা দিচ্ছি মাসিমা। আমার কথার নড়চড় হবে না।"

তারপর বিকালে আবার গরুর গাড়ী দরজায় এসে দাঁড়াবে। আপনারা তিনজনে একে একে তাতে উঠবেন। যাবার মুহূর্ত্তে গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে আপনার দিকে সেই করুণ দুটি চোখ তুলে যামিনী শুধু বলবে,—"আপনার ছিপটিপ যে পড়ে রইল!"

আপনি হেসে বললেন, "থাক্ না। এবারে পারিনি বলে, তেলেনা-পোতার মাছ কি বার বার ফাঁকি দিতে পারবে!"

যামিনী মুখ ফিরিয়ে নেবে না। ঠোঁট থেকে নয়, মনে হবে, তার চোখের ভেতর থেকে মধুর একটি সকৃতজ্ঞ হাসি শরতের শুভ্র মেঘের মত আপনার হৃদয়ের দিগন্ত স্নিগ্ধ করে ভেসে যাচ্ছে।

গাড়ী চলবে। কবে একশ না দেড়শ বছর আগে প্রথম ম্যালেরিয়ায় মড়কের এক দুর্ব্বার বন্যা তেলেনাপোতাকে চলমান জীবন্ত জগতের এই বিস্মৃতিবিলীন প্রান্তে ভাসিয়ে এনে ফেলে রেখে গিয়েছিল আপনার বন্ধুরা হয়ত সেই আলোচনা করবেন। সে সব কথা ভালো করে আপনার কাণে যাবে না। গাড়ীর সঙ্কীর্ণতা আর আপনাকে পীড়িত করবে না, তার চাকার একঘেয়ে কাঁদুনি আর আপনার কাছে কর্কশ লাগবে না। আপনি শুধু নিজের হৃদস্পন্দনে একটি কথাই বার বার ধ্বনিত হচ্ছে, শুনবেন,—"ফিরে আসব, ফিরে আসব।"

মহানগরের জনাকীর্ণ আলোকোজ্জ্বল রাজপথে যখন এসে পৌঁছোবেন তখনও আপনার মনে তেলেনাপোতার স্মৃতি সুদূর অথচ অতিরঙ্গ একটি তারার মত উজ্জ্বল হয়ে আছে। ছোটখাট বাধা বিড়ম্বিত কটি দিন কেটে যাবে। মনের আকাশে একটু করে কুয়াসা জমছে কিনা আপনি টের পাবেন না। তারপর যেদিন সমস্ত বাধা অপসারিত করে তেলেনাপোতায় ফিরে যাবার জন্য আপনি প্রস্তুত হবেন সেদিন হঠাৎ মাথার যন্ত্রণায় ও কম্প দেওয়া শীতে, লেপ তোষক মুড়ি দিয়ে আপনাকে শুতে হ'বে। থার্ম্মো-মিটারের পারা জানাবে এক শত পাঁচ ডিগ্রী. ডাক্তার এসে বলবে, "ম্যালেরিয়াটী কোথা থেকে বাগালেন?" আপনি শুনতে শুনতে জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে যাবেন।

বহুদিন বাদে অত্যন্ত দুর্ব্বল শরীর নিয়ে যখন বাইরের আলো হাওয়ায় কম্পিত পদে এসে বসবেন, তখন দেখবেন নিজের অজ্ঞাতসারে দেহ ও মনের অনেক ধোয়া-মোছা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। অস্ত যাওয়ার তারার মত তেলেনাপোতার স্মৃতি আপনার কাছে ঝাপসা একটা স্বপ্ন বলে মনে হবে। মনে হবে তেলেনাপোতা বলে কোথায় কিছু সত্যি নেই। গম্ভীর কঠিন যার মুখ আর দৃষ্টি যার সুদূর ও করুণ, ধ্বংসপুরীর ছায়ার মত সেই মেয়েটি হয়ত আপনার কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের অবাস্তব কুয়াসার কল্পনা মাত্র।

একবার ক্ষণিকের জন্য আবিষ্কৃত হয়ে তেলেনাপোতা আবার চিরন্তন রাত্রির অমলতায় নিমগ্ন হয়ে যাবে।

গড়ের বাদ্যি

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

একটি প্রায় সত্তর বৎসরের বৃদ্ধা দোড়গোড়ায় আসিয়াছিল, আমি সামনে গিয়া পড়িতেই অর্ধেক ঘোমটা টানিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। স্বরূপ মণ্ডল আমাকে দেখিতে পাইয়াই চরখার হাতটা থামাইয়া অভ্যর্থনা করিল—"আসুন দাদাঠাকুর, পাতঃপেন্নাম হই। এবারে অনেকদিন বাদ দিয়ে এলে মস্‌নেতে।"

বলিলাম—"সে ছিল বোমার ভয় স্বরূপ, পালিয়ে পালিয়ে আসতে হোত। নৈলে কলকাতার লোকের বাইরে আসা যে কী শক্ত বুঝবে না তো। আমরা এক আলাদা জীবই হয়ে দাঁড়াই যে।"

মোড়ার উপর গিয়া বসিলাম, স্বরূপ নাতিকে তামাক আনিতে বলিয়া আলাদা জীবের কথায় একটু হাসিয়া হাতটা চালাইতে চালাইতে বলিল—"তারপর খবর কি কন শুনি।"

বলিলাম—"খবর তো দেখতেই পাচ্ছ? যারা ম'ল এখন তাদের কথা ভেবে হিংসে হ'চ্ছে, তবু কোমরে একখানা করে কাপড় সুদ্ধ্য মানে মানে সরে পড়েছে, এখন চালের এক রকম ব্যবস্থা হয়েছে, বাঁচতেই হবে, কিন্তু......"

স্বরূপ 'কিন্তু'-র পরের অবস্থাটা কল্পনা করিয়া লইয়া একটু হাসিয়া আবার হাতটা থামাইয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"গদার মাকে তো এতক্ষণ সেই কথা বলছিলুম দাদাঠাকুর, বলি দেখে রাখ—এত বড় কারবারটা চালাচ্ছে তার ভোজবাজিটা একবার দেখে রাখ—গোড়ায় চরখা, তাঁতীর তাঁত; তারপর দিনকতক বিলিতী কলের কাপড় এলাহি কাণ্ড, কে কত পরবি পর; তারপর ঢো উঠল আগুনে দে ওগুনোকে; তারপর স্বদেশী কল, আবার নেও কত কাপড় নেবে; তারপর এখন এক কথায় বাজার ফরসা; আবার ডাক তাঁতীকে, নে আয় চরখা।...... চারকুড়ি বয়েস হতে চলল, অনেক......"

এমন সময় খানিকটা দূরে কোথায় ঝমঝম করিয়া ব্যাণ্ডের আওয়াজ উঠিল। স্বরূপ উচ্ছ্বসিতই হইযা উঠিতেছিল, ও-প্রসঙ্গটাই ছাড়িয়া দিয়া স্বরটা খাদে নামাইয়া বলিল- "গড়ের বাদ্যি!"

একটু যেন ব্যঙ্গ হাস্য করিয়া আবার চরখা চালাইতে সুরু করিয়া দিল।

স্বরূপের এই সব অতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, হাসির টুক্‌রা প্রভৃতির অন্তরালে বড় বড় গল্প লুকাইয়া থাকে, প্রশ্ন করিলাম—"হাসলে যে মোড়লের পো?"

স্বরূপ বলিল—"এই চারকুড়ি বয়সের মধ্যে মসনেতে শুদু একটি বার বাদ্যি শুনেছেনু দাদাঠাকুর, হ্যাঁ, যাকে গড়ের বাদ্যি বলতে হয! আর একি ছেলেখেলা! মেয়েরা ঐদিকে উলু দিচ্ছে আর ঢাক আর দুটো পেতলের বাঁশি নিয়ে—ভ্যাঁপো ভ্যাঁপো, ভ্যাঁপো—ভ্যাঁপো কি না? মিত্তিরদের মেয়ের বিয়েতে গড়ের বাদ্যি হচ্চে! বাজনাটার জাত মেরে দিলে বেটারা দাদাঠাকুর, হাসি কি সাদে আসে? অনেক দুঃখে।"

স্বরূপের নাতি তামাক লইয়া আসিল। হুঁকাটা হাতে লইয়া বলিলাম—"একটু অন্য জায়গায় বরাৎ ছিল, তা একটু বসে শুনেই যাই খাঁটি গড়ের বাদ্যির ব্যাপারটা কি। নাও, শুরু করো।"

স্বরূপ বলিল—"তা বৈকি দাদাঠাকুর, গড়ের বাদ্যি একবার শুনে যদি জীবন ভোর না মনে গেঁতে বসে রৈল তো তাকে আবার গড়ের বাদ্যি বলতে হবে?······তা হলে দিন একটু পেসাদ পেয়ে নি।"

বাঁ হাত দিয়া ডান হাতটা স্পর্শ করিয়া স্বরূপ কলিকাটা তুলিয়া লইল, কয়েক টান দিয়া আবার সেইভাবে বসাইয়া রাখিয়া বলিল—"আমার বযেস তখন কতই বা হবে,—এই ধরুন দশ, তার বেশি নয়; সেই সময়কার কথা। চৌধুরী বাড়ির কত্তা ত্যাখন দামোদর চৌধুরী। মানুষটো যে কেমন ছেল তা কি করে বোঝাই আপুনিকে? সে ধরণের মানুষই যে নোপাট হয়ে গেল ধরাতল থেকে। ইয়া গোঁফ, ইয়া গালপাট্টা, এই টানা চোখ, এই টানা ভুরু; এদিকে যেমনি লম্বায় তেমনি আড়ে। গলার আওয়াজ ছিল তেমনি, একটা যদি হাঁক দিলেন তো সদর থেকে অন্দর পর্য্যন্ত ঐ অত বড় দেউড়িখানা যে গম গম করতে থাকত। ঐ যে বলনু দাদাঠাকুর? সে ধরণের মানুষ নোপাট হয়ে গেল ধরাতল থেকে তো আপুনিকে বোঝাই কি করে?

দোষ কি ছেল না? ছেল। অবিশ্যি এখনকার হিসেবে বলছি, ত্যাখনকার দিনে জমিদারের মধ্যে সেগুলো দোষের মধ্যে ধরবার রেওয়াজ ছেল না। তা, না ধরলেই যে দোষের হবে না এমন কথা তো নয় দাদাঠাকুর। চৌধুরীদের বংশটাই একটু কি যে বলে, ইয়ে ছিল; তার মধ্যে আবার দামোদর চৌধুরীর দাপট পূর্বের সবাইকেই গেছল ছাড়িয়ে। ঘর জ্বলিয়ে দেওয়া, কি, মানুষকে মানুষ গুম করে ফেলা এগুনো তো ধত্তব্যের মধ্যেই ছেল না, ডাকাতি করে গাঁ কে গাঁ লুটে নিয়ে আসা পজ্জন্ত নিত্যিকার ব্যাপার ছেল। তবে নিজের জমিদারিতে নয়। তুমি পাশের জমিদার, মাথা তোলবার চেষ্টা করচ, সমস্ত জমিদারী তচনচ করে এমন ঠাণ্ডা করে দিলে যে আর দু'পুরুষ ধরে মাথা তোলবার জো রইল না। তা, একেবারে ঠাণ্ডা তো করা যেত না, কেন না সবারই নিজের নিজের নেটেড়ার দল ছেল, তাই অষ্টপহরই দাঙ্গা ফেসাদ লেগে থাকত দাদাঠাকুর, দেশটা এমন জুড়িয়ে যায়নি। আজ দামোদর চৌধুরীর দল কার্তিকপুরের রায়েদের জমিদারীতে পড়ল তো কাল রায়েদের দল মসনের আশে পাশে এসে হানা দিলে, কিছু মাথা নিয়ে গেল, কিছু মাথা রেখে গেল, এইরকম। এই আপনি আমি রেয়ৎ, কিছু খোয়ালুম, না হয় দু'একজন জানই দিলুম, কিন্তু সমস্ত ধকলটা তো ওনাদেরই সামলাতে হোত দাদাঠাকুর? তা, ঠাণ্ডা মেজাজে তো সে হবার জো নেই তাই একটু একটু করে নেশাপত্তর এসে পড়তই, দামোদর চৌধুরীর ওপর ধকলটা ছিল বেশি, তাই নেশারও একটু বাড়াবাড়ি ছেল; শাদা চোখে তানাকে বড় কম দেখেছি দাদাঠাকুর। ঐ যে পদ্ম পলাস লোচনের মতন দুটি চোখ, সর্বদাই রক্ত জবার মতন রাঙা টকটক করতো। শুধু দু'টি মাস ছেল শাদা, একদিন দু'দিন করে গোনাগুনতি দুটি মাস তাইতেই চারিদিকে সামাল সামাল রব উঠে গেছল।"

মন্তব্যটা একটু নূতন ধরণের হওয়ায় হুঁকা থেকে মুখ সরাইয়া বলিলাম—"বুঝলাম না স্বরূপ।

স্বরূপ বলিল—"সবটা না শুনলে বুঝবেন না।"

তুলা ফুরাইয়া গিয়াছিল, নূতন খানিকটা লইয়া আবার সুতা কাটা চালু করিয়া বলিতে লাগিল—"ময়নাগাছির চিন্তামণি ঠাকুর ছিলেন দামোদর

চৌধুরীর বোনাই। ওঁনাদের পদ্ধবি রায়-রায়ান। নবাবী আমলে মস্ত বড় তালুক ছেল, এদিকে এসে মাত্তোর কয়েক খানা গ্রামে ঠেকেছিল। তা বিষয় সম্পত্তি তো পদ্মপত্রের জল দাদাঠাকুর, সব সময় সমান থাকে না; তবে চিন্তামণি ঠাকুর নিজে বড় ধড়িবাজ লোক ছিলেন, আর সুমুন্দির ওপর তাঁর দাবটা ছিল খুব বেশি রকম। লোকে বলত দামোদর চৌধুরীর মাথায় যত রকম কু'মতলব খেলত তার বারো আনা চিন্তামণি ঠাকুরের। মসনে থেকে ময়নাগাছি বেশি দূরেও নয়, যাওয়া আসাটা লেগেই ছেল। নেশার দোষটা ওনার আবার একটু বেশি ছেল, বোনাই সুমুন্দি একত্তর হলে বেশ একটু বাড়াবাড়ি হোত।

একদিন পাল্কি থেকে নেমে চিন্তামণি ঠাকুর বললেন—"দামোদর, ভেবে দেখলুম সংসারটা কিছুই নয়, আমরা হীরে ফেলে কাচে গেরো দিয়েছি। বড়ই অনুতাপ হচ্ছে মনে।"

অন্য এক পাল্কিতে একজন বোষ্টম বাবাজী বসে ছেল। দামোদর চৌধুরীর দাপটের কথা শুনে নামতে হেম্মৎ পাচ্ছেল না; চিন্তামণি ঠাকুর নিজে গিয়ে তাঁকে ডেকে নিয়ে এলেন। তিনজনে গিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলেন।

কি মন্তর ঝাড়লে নারায়ণ জানেন দাদাঠাকুর, তারপর দিন থেকেই দামোদর চৌধুরী একেবারে অন্য মানুষ। আমার বাবা ছেল চৌধুরী মশায়ের খানসামা, হুকুম হোল নেশাপত্রের যা কিছু সরঞ্জাম সব বড় পুকুরের একেবারে মাঝখানে গিয়ে ডুবিয়ে দিতে হবে। দলের যে সব নেটেড়া ছেল সবার লাঠি একত্তর করে দেউড়ির সামনে খোলখত্তাল বাজিয়ে জ্বালানো হোল; কালীমন্দিরে রোজ জোড়া পাঁঠা পড়ত, তার জায়গায় চারটে করে চালকুমড়োর ব্যবস্থা হোল। হপ্তাখানেক থেকে, বেশ মোটারকম বিদেয় নিয়ে বোষ্টম-বাবাজী বিন্দাবন চলে গেল; চিন্তামণি ঠাকুর সঙ্গে রইল, উনি আবার বেশি করে ভিড়ে গেছল কিনা, সংসার একরকম ত্যাগ করেই ল্যাঠা চুকিয়ে এসেছিল।

পাঁঠার স্থলে কুমড়ো বলি হোক, তাতে এমন কিছু যায় আসে না দাদাঠাকুর, কাল হোল, এর সঙ্গে ঝোঁক চাপল লোকের ভালো করবার। রাস্তা থেকে টেনে নিয়ে এসে ভালো করবার ঘটায় লোকের পথ চলা

দায় হয়ে উঠল দাদাঠাকুর। দান, ধ্যান, পুকুর খোঁড়ানো, ঘটা করে মন্তর দেওয়ানো এইসব নানান কাণ্ডয় হুহু করে টাকা বেরিয়ে যেতে লাগল। আগে লুট তরাজে মা লক্ষ্মীর কিরপেয় একটা নিত্যিকার আয় ছেল, এখন সুদ্ধু খরচের পালা—দিন কতকের মধ্যেই তহবিল ফাঁক হয়ে এল। ওদিকে রাণীমা, এদিকে দাওয়ানজী বুঝুতে লাগলেন, কিন্তু কে কার কথা শোনে? মাথায় সেঁধে বসে গেছে চিরকাল পাপ করে এলুম এবারে নুণ আদা খেয়ে পুণ্যি করতে হবে। আর বিষয় সম্পত্তি নিয়েই তো যত পাপ? ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলবার জন্যে হাঁপিয়ে উঠলেন দামোদর চৌধুরী।

ক্রমে কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ল: দামোদর চৌধুরী মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাইয়ের হাতে বিষয় সম্পত্তি সঁপে বিন্দাবনে গিয়ে বাস করবেন। এত বড় জমিদারি, এমন সম্পত্তি, আর ওয়ারিশ মাত্র ঐ মেয়ে, অনেকের নোলাতেই জল এল, চারিদিক থেকে ঘটকের আমদানি হতে লাগল। আর সব সম্বন্ধ যা এল তা এল, একটা সম্বন্ধ এল কুসমির জমিদারের বাড়ি থেকে। সবার ধড়ে যেন প্রাণ এল।

প্রশ্ন করিলাম—"খুব ভালো বংশ বুঝি?"

"অতবড় পাজি জমিদার বংশ এ তল্লাটের মধ্যে আর ছিল না দাদা-ঠাকুর: তার ওপর মসনের এনাদের সঙ্গে সাতপুরুষের আড়া-আড়ি। মসনের এনারা যদি উত্তর দিকে যায়, কুসমির ওনারা যাবে দক্ষিণ দিকে; কুসমি যদি মসনের সং বের করে তো মসনে কুসমির বাবুদের নিয়ে যাত্রার পালাকে পালা বেঁধে ফেলে; এর ওপর দাঙ্গা-ফ্যাসাদ তো বছরে দুতিনটে লেগেই আছে। তবে যে বললুম ধড়ে প্রাণ এল, তার হেতু হচ্ছে—সবাই ভাবলে কুসমির ওখান থেকে বিয়ের সম্বন্ধ, দামোদর চৌধুরী গালমন্দ করে জবাব দেবে, ওদিক থেকেও ওতোর গাইবে, আবার রক্ত গরম হয়ে উঠবে দামোদর চৌধুরীর, আবার আগেকার দিন ফিরে আসবে, রক্ত ঠাণ্ডা হয়েই যত সব অনথ হতে লেগেছে তো? কিন্তু বোষ্টম বাবাজী দামোদর চৌধুরীর আর কিছু বস্তু রেখে যায়নি দাদাঠাকুর। ঘটক এল সকালে, দাওয়ানজী নিজে গিয়ে এত্তালা দিলেন, কিছু কিছু কান-ভাঙানিও যে না দিলেন এমন নয়, তখুনি তখুনি উত্তর না দেওয়ায় সবাই আশা করলেন

দিন বুঝি ফিরল, বাগ্দিপাড়ায় দলের যারা কত্তার হুকুমে লাঠি ছেড়ে খোল-কত্তালে হাত পাকাচ্ছেন তারা পর্য্যন্ত লোতুন লাঠির জোগাড়ে বেরুল, বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল ভেতরে ভেতরে; এমনকি এও আশা করলে অনেকে যে বৌনিটা বুঝি ঘটকের ওপর দিয়েই হবে, তানাকে আর আস্ত ফিরতে হবে না মসনে থেকে।

বিকেল বেলা বৈঠকখামায় ঘটকের ডাক পড়ল। দামোদর চৌধুরী নিজে উঠে তানাকে খাতির করে বসালেন। বোষ্টমদের আবার একটা আইন আছে না দাদাঠাকুর যে ঘাসের চেয়েও নিচু হয়ে থাকতে হবে লোকের কাছে? সেইভাবে কত নিচু হয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে বললে— 'কুসমির সঙ্গে সম্বন্ধ সেতো আমার পরম সৌভাগ্যি, আমার বংশের সৌভাগ্যি, আমার মেয়ের কি এত কপালের জোর যে কুসমির দেউড়ির এককোণে তার ঠাঁই হবে? মানে, সত্যি কথাটা বলব না মনে মনে পাকা করে নিলে লোকে যত বাড়িয়ে বলতে পারে আর কি। আসল কথা, ভালো হবার বাই জেগেছে কিনা, তা যে যত বড় শত্রু তার সঙ্গে তত বেশি আত্তিস্থ না দেখালে তো ভালো হওয়া হবে না, তাই সমস্ত দিন ভেবেচিন্তে ঐ সাব্যস্ত হয়েছে, মানুষের সঙ্গে বৈরী ভাব একেবারে মিটিয়ে ফেলতে হবে কিনা, বোষ্টম বাবাজী যে কানে মন্ত্র ফুকে দিয়ে গেছে। ঘটক একখানা রূপোর থালা, একটা রূপোর বাটি আর একটা রূপোর গেলাস বিদেয় নিয়ে ফিরে গেল। একেবারে অনেক আশা করেছেল, মসনের লোক যেন একেবারে মুশড়ে পড়ল। ঠিক এক মাস তের দিন পরে বিয়ের দিন ধাজ্জ হোল।...পেসাদ আছে দাদাঠাকুর?"

হুঁকাটা বাড়াইয়া ধরিতে কলিকাটা তুলিয়া লইয়া স্বরূপ বেশ সযত্নে কয়েকটি টান দিল, তাহাতে সব সত্ত্বটুকু নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় নাতিকে ডাকিয়া আবার নূতন করিয়া কলিকাটা সাজিয়া আনিতে বলিয়া আবার চরখার সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীটা আরম্ভ করিল—"এক মাস তের দিন পরে বিয়ের দিন ধাজ্জ হোল। দেউড়িতে তো হাহাকার পড়ে গেল দাদাঠাকুর। চৌধুরী মশাইয়ের মেয়ের নাম ছিল দুগ্‌গা। তা অমন চেহারা মিলিয়ে নাম এপজ্জন্ত কেউ রাখতে পারে নি, ঠিক যেন সেরা কুমোরের হাতে গড়া প্রিতিমেটি: যেমন চোখ, তেমনি নাক, তেমনি কপাল, তেমনি

মুখের আদল, আর তেমনি চুলের ঢাল। স্বভাবটিও কি সেই রকম ?—মুখে একটি উঁচু কথা নেই, আর সেই এতটুকু থেকে নিয়ে এত বড় পজ্জন্ত সব্বার ওপর সমদিষ্টি ; কে বলবে ঐ বাপের ঐ মেয়ে! তার সম্বন্ধ ঠিক হোল এক জরদ্‌গবের সঙ্গে দাদাঠাকুর! যেমন মোটা, তেমনি খাড়াই, তেমনি কুচ্ছিত, তেমনি কালো, বয়েস য্যাথনকার কথা বলচি ত্যাখন তার প্রায় তিরিশ হবে। এক ছেলে, একটি পরিবার হজম করে বেলল্লা হয়ে বেড়াচ্ছে। হেন কুকাজ নেই যা কুস্‌মির কুমার করেনি বা করতে পারে না। বিয়ে করতে চায়না, বলে একেবারে ডানাকাটা পরি না হোলে বিয়ে করব না। এদিকে নিজে তো ময়ুরছাড়া কাত্তিক, কোন মেয়ের বাপই যেযাত চায় না।

বলবেন তবে চৌধুরী মশাই ঝপ করে রাজি হোলেন কেন ? সেথানেও ঐ সব্বনেশে ভালো হওয়ার নেশা দাদাঠাকুর। ভালো হওয়া মানে দাঁড়িয়ে গেল তো নিজের ভালো না করা, তা য্যাত বেশি মন্দ হয় নিজের ত্যাতই ওদিকে ভালোর পাল্লা ঝুকবে না ?—ত্যাতই বেশি পাপ ক্ষ্যায় হবে না ? যাদের সঙ্গে সাতপুরুষের আড়াআড়ি তাদের পায়ে যদি মাথা পেতে দিতে না পারলুন, একেবারে একটা ডাহা অখাদ্যের হাতে যদি সোনার কমল না ভাসিয়ে দিতে পারলুম তো আর ভালো হলাম কৈ ?... কথাটা এইদিক থেকে দেখতে হবে দাদাঠাকুর, তবে এর মর্মগেরণ হবে।

দেউড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। নিজে হার মেনে রাণীমা আত্মীয়-স্বজন যে যেথানে ছেল চুপি চুপি চিঠি নিকিয়ে সবাইকে াকিয়ে আনালে—দুই ননদ, এক খুড়-শাশুড়ি, দুই পিসশাশুড়ি—সবাই এসে যথাসাদ্দি বোঝালে, কান্নাকাটি করলে, অন্নজল বন্ধ করলে ; উঁহু, সেই যে কোট ধরে রইলেন, নড়ায় কার সাদ্দি।"

বলিলাম—"কিন্তু এই বলচ, এত ভাল মানুষ হয়ে গেছেন, এত দয়া সবার ওপর, অত লোকের অত কান্নাকাটিতেও মন টলল না ? তা ভিন্ন গুরুজনরাও এসে ধরে পড়লেন বলছ..."

স্বরূপ হাত থামাইয়া আমার পানে চাহিল, একটু হাসিয়া বলিল—"এ সামান্ত কথাটা আর বুঝলেন না দাদাঠাকুর ? দয়া য্যাতক্ষণ পরের ওপর, নিজের পরিবার, ছেলেমেয়ে—তাদের ওপর দয়া তো আর দয়া হোল না।

তেমনি ভক্তি,—য্যাতক্ষণ সে পরের ওপর, নিজের বাপ্‌মা, খুড়ি, পিসি,—এদের ওপর ভক্তি, এদের বাধ্য হওয়া সে তো ঘরোয়া ব্যাপার, তার মধ্যে আর মজ্জেদাই বা কোথায়, পুণ্যিই বা কোথায়? বাইরে দয়া, ধর্ম, নিচু ভাব—যাই বলুন, তা বলে, মেয়ের মুখ চাইতে হবে, পরিবারের বুক চাপড়ানি গেরাহ্যি করতে হবে, খুড়ি-পিসির কথায় কান দিতে হবে—তাহলেই তো কম্ম করা হয়েছে মানুষের ; কথাটা বুঝলেন না?

বলিলাম—"তারপর কি হোল বল।"

"বিয়ের জন্তে হুলুস্থুলু পড়ে গেল। এই শেষ কাজ, এর পরেই বিন্দাবন যাবেন, আয়োজনের আর কোন হিসেব রইল না। যেখানকার যা নাম করা সেরা জিনিস—বাইজী থেকে নিয়ে রংতামসা, বাজনাবাদ্যি—সব জোগাড় করবার জন্তে চারিদিকে লোক ছুটল—কোথায় কাশী, কোথায় ঢাকা, কোথায় মুর্শিদাবাদ, কোথায় কলকাতা—ত্যাখন রেল হয়নি ডাকের ব্যাপার, একটা হৈহৈ পড়ে গেল।

দিন যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল রাণীমা ততই যেন পাগলের মতন হয়ে উঠতে লাগল, পেটে ধরেচে তো? তার ওপর ঐ রকম মেয়ে, দেবকন্তে বললে হয়। শেষে য্যাখন কুল্যে তিনটি দিন বাকি, আর কোন রাস্তা না দেখে আমার বাবাকে ডেকে পাঠালেন। কর্তা নেশা-ভাঙ্‌ ছেড়ে দেওয়ায় বাবার সন্ধেবেলায় আর এদানি কোন কাজ ছেল না; মনমরা হয়ে বসে থাকত, বেশ মনে পড়ে রাণীমার খাস দাসী সৈরভী এসে চুপি চুপি ডেকে নিয়ে গেল।

সামনে বেরুত না, দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে সামনে এগিয়ে দিয়ে রাণীমা চোখের জল মুছতে মুছতে অনেক কথা বললে বাবাকে "—শিবদাস"—বাবার নাম ছেল শিবদাস—বললে, "শিবদাস আপ্তহত্যে মহাপাপ, নৈলে মেয়েটাকে বুকে করে কুয়োর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তুম। আর তো কোন উপায় নেই, তুমি পুরণ চাকর—শুদু পুরণই নয়, বংশগত চাকর কত পুরুষ ধরে তোমাদের বংশে এ বাড়ির অন্নজল খেয়েছে—আর কোন উপায় না দেখে মেয়েটাকে তোমার হাতে সঁপে দিলুম। তুমি মসনের চৌধুরী বংশের নাম ডুবতে দিও না। কিছু একটা উপায় করো, না পারো, বিয়ের

দিন সন্দের সময় আমার কাছে এসে বলো—পারলুম না রাণীমা—আমি মেয়েটাকে তোমার হাতে তুলে দেব, নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিও। আমি কোথায় রাজপুরের মুকুজ্জেদের ছেলেটিকে মনে মনে এঁকে রেখেছিলুম—যেমন নিকষ কুলিনের বংশ, তেমনি কাছে পিঠেও হোত।··· তা, ভাসিয়ে দিয়ে এসো পোড়কপালীকে।”

কম কথা নয় তো দাদাঠাকুর, কিই বা খ্যামতা বাবার? অথচ স্বয়ং রাণীমা নিজে ডেকে বললেন অমন কাতরে কাতরে। পরের দিন আর বাবাকে কেউ দাঁতে কুটোটি কাটাতে পারলেন না, যখনই দেখ নিঝুম হয়ে বসে ভাবচেই—ভাবচেই—ভাবচেই। সন্দের সময় গিয়ে হঠাৎ ঝেড়ে ঝুড়ে উঠল, মাকে বললে—রূপোর মা—বাবা আমায় রূপো বলে ডাকতো—বলল, রূপোর মা, বেশ একটু তোয়াজ করে রান্নাটা কর্ দিকিন, জাল ফেলে একটা মাছও তুলে চিচ্ছি। মা বললে—সমস্ত দিন উপোসের পর হঠাৎ রান্নার আদর, বলি ব্যাপারখানা কি? বাবা বললে—তুই কর তো জোগাড়, আজ ফাঁসির খাওয়া খেয়ে নিতে হবে।
···মা সুদোলে—বলি ব্যাপারখানা কি আগে তাই কও—এমন অমঙ্গুলে কথা. · বাবা বললে—ঐ তো বললুম, আজ ফাঁসির খাওয়া খেয়ে নিতে হবে, কাল এসপার কি ওসপার; তোর সিঁদুরের জোর থাকে ফিরে পাবি, নৈলে থান কাপড় বরাদ্দ।······ এর বেশি আর ভাঙলে না।”

সুতোয় কি রকম একটু জোট পাকাইয়া গেছে; স্বরূপ সেটা ঠিক করিয়া লইয়া আবার আরম্ভ করিল—“মসনের ঠিক বাইরে সরস্বতীর ধারে তাঁবু ফেলে বরযাত্রীরা এসে উঠল। এমন প্রায় পাঁচশ লোক হবে। মসনতে বিয়ের এমন আয়োজন এর আগে কেউ দেখে নি দাদাঠাকুর, যেমন এদিকে ঘটা তেমনি ওদিকে ঘটা। হাতী, ঘোড়া, পাল্‌কি, তাঞ্জাম গাড়ি, জুড়ি, বাজনা-বাদ্যি। একটা গুজব উঠল, কুসমির ওনারা নাকি আবার গড়ের-বাদ্যির ব্যবস্থা করেচে, কোলকাতার কেল্লা থেকে নাকি গোরার দল এসে সেই বাজনা বাজাবে। ত্যাখন গড়ের-বাদ্যি এমন হ্যালা-ফ্যালার জিনিস হয়নি দাদাঠাকুর; গোরাও এ রকম বাঁশতলায়, ডোবার ধারে হ্যাংলার মতন ঘুরে বেড়াত না; আমরা সবাই দেখতে ছুটলুম। ভেতরের তাঁবুগুলোর দিকে যাওয়া গেল না, কাজেই চোখে

দেখাটা আর হয়ে উঠল না কারুর। নানা রকম গুজব উঠল; কেউ বললে বাবুদের তাঁবুর পাশেই তাদের আস্তনা, কেউ বললে এখনও এসে পৌঁচোয়নি, সন্দের সময় ঠিক মোগাড়ায় এসে হাজির হবে; কেউ বললে গোরা নয়, গোরার সাজপরা মোছলমান বাজনদারের দল। হাজার রকমের গুজব। ব্যবস্থা হল, বরযাত্রির দল মসনেয় ঢুকে আদ্ধেকটা পথ নিজেরা আসবে—রতন দিঘীর জোড়া মন্দির পজ্জন্ত, সেখান থেকে কন্যেযাত্রীর দল তানাদের অভ্যথনা করে নিয়ে আসবে, কত্তা একটু এগিয়ে দেউড়ির সামনেতে গিয়ে অভ্যথনা করবেন।...দামোদর চৌধুরীর মেয়ের বিয়ে নিয়ে অনেক গল্প চলিত আছে মসনের দাদাঠাকুর, ওরকম আয়োজন আর তার পূর্ব্বে এখানে হয়নি কি না: একটা শুনবেন—বরযাত্রীদের জন্যে—রতনদিঘী থেকে সারা পথটা মখমল দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল। অতটা বিশ্বেস করবেন না, তবে হ্যাঁ, যা হয়েছিল তা এ তল্লাটে কোনখানেই কোন কালে হয়নি—এক রামায়ণ-মহাভারতেই শোনা যায়।

সন্দের আগে তিনবার ডেকে পাঠালেন রাণীমা। প্রেথম পহরেই লগ্ন, শেষবার ডেকে আর কাকুতি-মিনতি নয়, একেবারে শাপমন্যি—'তোমরা পুরুষানুক্রমে এঁদের নেমক খেয়ে এসে, লক্ষ্মীপিতিমে চোখের সামনে ভেসে যেতে দেখেও কিছু করলে না, নির্বংশ হবে, সমস্ত মসনে শ্মশান হয়ে যাবে, এই আমি পাতব্বাক্যে বলচি'—এইরকম কত কথা, একেবারে পাগলের মতন হয়ে গেছেন কিনা। বাবা মুখটি বুজে শুনে গেল, একটা মতলব ঠাউরেচে, কিন্তু লাগবে কি না লাগবে তার তো ঠিক নেই। শুধু বললে—'মা, চেষ্টার কসুর করচি না, তবে সবই তো মা জগদম্বার হাতে। কাল হয়েচে তিনি অসি ছেড়ে বাঁশী ধরেচে, নৈলে মসনের লক্ষ্মীপ্রিতিমের দিকে কিনা কুসমির কালপেঁচায় নজর দেয়? তবু করচি চেষ্টা, আপনি রাজাপুরের ওনাদের আনিয়ে রেখো চুপিচুপি; না পারি আশীর্ব্বাদ করো তোমার শাপমন্যিগুনো যেন আমার বরে দাঁড়ায়, এ অঘটন চোখে দেখবার আগেই যেন শিবকে চোখ বুজতে হয়।

সেই রকম ব্যবস্থাই করেছেল কিনা বাবা, দাদাঠাকুর। ঐ যে আগের রাত্তিরে মাকে বললে, এসপার কি ওসপার হবে ফাঁসির খাওয়া খাচ্চি, তার অর্থটা কি? কুমড়ো বলি দিয়ে যখন মা'র পূজো হচ্চে, চুপি চুপি

পুরুতমশাইয়ের হাতে একটি এক নম্বর খাঁটির বোতল তুলে দিয়ে বললে —"পুরুতঠাকুর, কত্তার হুকুমে এসব তো ছেড়ে দিয়েচি, তবে আজ নাকি বড় সুখের দিন; সুদু এক রাত্তিরের জন্ত লঙ্ঘন করব কত্তার হুকুম। আপনি বেদ, পুরাণ, তন্ত্র; আগমে যত মন্ত্র আছে, সব এই বোতলটির মধ্যে ঠেসে খুব কড়া গোছের 'কারণ' করে দিন, যেন এক চুমুকেই জন্ম পালটে যায়।

তাই গেলোও দাদাঠাকুর, সেকথা পরে বলচি।

সন্দের একটু আগে তোড়জোড় করে বরযাত্রী বেরিয়ে পড়ল। মিনিটে মিনিটে কত্তার কাচে লোক পৌছুতে লাগল—কতদূর এগুল, কি বৃত্তান্ত এই সব খবর নিয়ে। সন্দের একটু পরে গা-ঢাকা হতে বরযাত্রীরা রতন-দীঘির জোড়ামন্দিরের সামনে এসে পৌচুল। এখান থেকে এনাদের এলাকা, ছুদলের বাজনা বাদ্যি, নোক-নস্কর গুছিয়ে একত্তর করে নিয়ে আবার এগুবে। কি ভেবে বাবা আমায় সমস্তদিন দেউড়ীতে নিজের কাচে আটকে রেখেছে। কাণপেতে রয়েছি গড়ের বাদ্যি বাজবে কখন, ও জিনিস তো শুনিনি আগে কখনও। বাবাকে একবার সুদোলাম, বাবা বললে—'সময় হলেই বাজবে, তুই ঠাণ্ডা হয়ে বোস তো।"

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি দাদাঠাকুর, আসল কথাটাই। দামোদর চৌধুরীর বোনায়ের কথা বলেচি না—সেই যে গোড়াতেই যিনি বোষ্টম বাবাজীকে ডেকে এনে অনিষ্ট ঘটিয়ে বিন্দাবনে চলে গেছল। আজ বিয়ের আগের দিন বৈকালে তিনি হঠাৎ এসে হাজির। চেহারার সেই জলুস নেই, কেমন একটা যেন মরা মরা ভাব; কিছু অবিশ্যি ভেঙে বললে না নিজের মুখে, তবে আমার মন বললে যেন ওসব বোষ্টম-বাবাজী টাবাজী কিছু নয়, কোন এক জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছেল—ফোপরা করে ছেড়ে দিয়েচে। যাই হোক, তিনিও হাজির ছেল, ওদিক থেকে বরযাত্রী দেউড়ীতে এসে পৌচুবে আর শালাভগ্নীপতে নেমে গিয়ে অভ্যথনা করবে।

সন্দে উৎরে গিয়ে বেশ গা-ঢাকা গোছের হয়েচে, দলটা এইবার জোড়ামন্দির ছাড়বে হৈ-চৈটা বেড়ে উঠেচে, এমন সময় বাবা যাথপদ্ধতি

গলায় গামছা জড়িয়ে এসে সুদোলে—হুজুরের সরবৎটা কি এখনই খেয়ে নেবেন আজ? এর পরে আর ফুরসৎ থাকবে না কিনা—তাই জেনে নিচ্ছি।'

আহারের পূর্ব্বে যে সময়টা আগের নেশার ব্যাপার চলত, সে সময় এখন শ্বেতপাথরের জয়পুরী গেলাসে করে এক গেলাস সরবৎ খাওয়ার রেওয়াজ করেছিলেন চৌধুরী মশাই, বাবাই তোয়ের করত, বাবাই এনে দিত। চৌধুরী মশাই বললে—তা তুই মন্দ বলিস নি, দোরে বরযাত্রী এসে গেল, আর কি ফুরসৎ পাবো? —জোগাড় করগে।'

এক গেলাসের বেশি খেতেন না, মালটানা মুখে মিছরীর সরবৎ ভালো লাগবে কেন? নেহাৎ মনকে চোখঠারা বৈতো নয়। বেশি খেতেন না কিন্তু তোয়াজ ছেল, সেইরকম শ্বেতপাথরের গোলটেবিলের সামনে কৌচে বসে, একটু একটু করে চাখতে চাখতে, গপ্প করতে করতে খাওয়া চলত। বাবা তোয়ের করতে গেল।''······স্বরূপ সতৃষ্ণনয়নে বারদুয়েক কলিকাটার পানে চাহিল, হুকাটা বাড়াইয়া বলিলাম—"নাও, দুটো টান দিয়ে নাও স্বরূপ।"

একটু দম করিয়া লইয়া কলিকাটি হুঁকার মাথায় বসাইয়া দিয়া স্বরূপ বলিতে লাগিল—"সরবৎ দিয়েই দোরের আড়াল হয়ে বাবা তো কাঁপতে কাঁপতে ইষ্টিমন্ত্র জপ সুরু করে দিলে। সরবতটা কি বুঝেচেন তো দাদাঠাকুর? সেই কারণকরা এক নম্বর বিলিতি মাল, নির্জ্জলা খাঁটি একেবারে। তাই ইদিকে দু'মাসের উপোসী, একটা চুমুক দিলেই একেবারে বেহ্মতলে গিয়ে উঠবে।······বাবা তো বাঁশপাতার মতন কাঁপতে লাগল দাদাঠাকুর। তারপরেই সেই সিংহি ডাক—'শিবে!'···বাবা তো দুগ্গানাম স্মরণ করে গলায় গামছা দিয়ে সামনে এসে হাজির হোলো! চিন্তামণি ঠাকুর ত্যাখনও চুমুক দিচ্চে, চৌধুরী মশাইয়ের গেলাস খালি। বাবার মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, চোখ রাঙা হয়ে রয়েচে, গা ঈষৎ 'দুলচে; জিগ্যেস করলে—'সরবৎ তুই নিজের হাতে তোয়ের করেচিস? বাবা হাতজোড় করে বললে—'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।'······'খাসা বানিয়েচিস তো; আর আচে?' বাবা বললে—'আজ মেহনৎ পড়বে হুজুরের, তাই একটু বেশি করেই বানিয়েছি।'···'লে আও, রায়মশাই

আপনারও চাইতো ?' রায়মশাই বললে—'তা দিক্, বিন্দাবন ছেড়ে ইস্তক এ রকম সরবৎ কৈ দেখিনি তো। তারপরেই স্রেফ লে আও, আর লে আও···বাবা সব ব্যবস্থাই করে রেখেছেল, দেখতে দেখতে চারটি বোতল খালি হয়ে গেল। এমন সময় গড়ের বাদ্যি বেজে উঠল, মানে জোড়ামন্দির তলা থেকে বরযাত্রী কণেযাত্রী মিলে আবার এগুতে সুরু করলে আর কি। চৌধুরীমশাই জবার মতন টকটকে চোখ ছুটো তুলে সুধোলে—বাজনা কিসের ?'

ওই জন্যই ব্যবস্থাটা করা কিনা আবার, মানে একটু পড়লে চৌধুরী-মশাইয়ের আর আগেকার কথা কিছু মনে থাকত না, বাবা ভাবলে, বিয়ে রদ করতে হলে সেই সাবেকের চৌধুরী মশাইকে ফিরিয়ে আনতে হবে, আর সাবেকের চৌধুরীমশাইকে ফেরাবার ঐ একটি মাত্র মন্তর আচে। বাবার শুধু ভয় ছেল উল্ট না হয়ে যায়, এমন ব্যাপারটা তো হয়নি ছু'মাসের মধ্যে।···বললে—'আজ্ঞে, ছুগ্গা-মাকে বিয়ে করে নিতে এসেচে—কুসমি থেকে।'···চৌধুরীমশাই টলতে টলতে একেবারে দাঁড়িয়ে উঠল; এক চুমুকেই জ্ঞান থাকে না—আর এ প্রায় ছু'পাঁট সফা হয়ে গেছে; রাগটাকে যেন চাপবার চেষ্টা করে সুদোলে—কার হুকুমে ?···রায়মশাই, আপনি হুকুম দিয়েচেন ?···রায়মশাই বললে—'আমি! কুসমিকে। তা ভেন্ন এ তো বিয়ের সানাই নয়, গড়ের বাদ্যি,· লুটে নিয়ে যাবার ব্যাপার দেখচি যে।'···আর যাবে কোথায় ? দেউড়ী কাঁপিয়ে সেই পুরণ গলা বরযাত্রীর বাজনার ওপর গিয়ে উঠল—'কোই হ্যায় ? কুসমির শালারা এসে আমার ঘর থেকে আমার মেয়ে লুটে নিয়ে যাবে ? গড়ের বাদ্যি বাজিয়ে ? বাগ্দিপাড়ার বেটারা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্চে ? লে আও আমার বন্দুক, একাই লড়েঙ্গা।'

আর বলতে আচে ? বাবা আন্দাজে আন্দাজে সব ব্যবস্থাই করে রেখেছেল, ছুটে বাগ্দির দল রে-রে করে গিয়ে একেবারে বরযাত্রীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপরে সে যুদ্ধ।···কথাটা বুঝলেম না দাদাঠাকুর ? কুসমির বাবুরাও একটু ধাঁধার মধ্যে পড়ে গিয়ে ভেতরে 'ভেতরে তোয়ের হয়ে এসেছিল কতকটা—ভাবলে, ভালো রে ভালো, এক কথাতেই মেয়ে দিতে রাজী হয়ে গেল,—মসনের দামোদর চৌধুরী,

ব্যাপারখানা কি!···মোছলমানও না, অন্ত জাতও নয়, গোরার দলই গড়ের-বাদ্যি বাজাচ্ছেল দাদাঠকুর, কুসমির বাবুদের সরকারে খুব খাতির ছেল তো? বলে-কয়ে কি করে জোগাড় করেছেল। চৌধুরীমশাইয়ের হুকুমে তাদের ঘেরে-ঘুরে এনে দেউড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে। তারা ভাবলে, এ শ্রাদ্ধের বুঝি এই রীত—তায় মদ গিলে আছে—গলা ফাটিয়ে লড়াইয়ের বাদ্যি শুরু করে দিলে।

লড়াই আর কি হবে দাদাঠাকুর? একদিকে সমস্ত গ্রাম আর এক দিকে গোটাকতক বরযাত্রী—সমস্ত রাত শুধু খোঁজ—খোঁজ, মার মার শব্দ, আর তার সঙ্গে গড়ের বাদ্যি। বরযাত্রীদের কত লোক থানায় পড়ল, কত লোক ডোবায় ফেলে হাঁড়ি মাথায় দিয়ে কাটালে, আবার কত লোক সরস্বতী পেরিয়ে পালাতে গিয়ে একেবারে বৈতরিণীর পারে গিয়ে উঠল। শেষরাত্তির পর্যন্ত শব্দ যদি কমল, বাদ্যি আর থামে না। গোরা, রক্ত গরম হয়ে গেছে কিনা দাদাঠাকুর। বাজিয়ে চলেচে তো বাজিয়েই চলেচে—ঝমোর ঝমোর ঝম্—ঝমোর ঝমোর ঝম্······

তাই বলছিলুম—গড়ের বাদ্যি শুনেছিলুম সেই একবার। আজকাল তো হুট বলতে গড়ের বাদ্যি, জাতই মেরে দিলে জিনিসটার।”

রাজমুকুট

শ্রীমনোজ বসু

মহকুমা শহর। তিনটে পাকা রাস্তা। আলো সর্বসাকুল্যে গোটা দশেক—তা-ও জ্বালা যাচ্ছে না সম্প্রতি কেরোসিন তেলের অভাবে। শিশির রায় এই জায়গায় বদলি হয়ে এল। স্ত্রী চন্দ্রা—বয়স কম বলে হাকিম গিন্নির যে রকম মন-মেজাজ হওয়া উচিত, তার তা মোটেই নয়।

পাড়াটা ভাল। পাশে সরকারি ডাক্তারখানা। থানা আর কিছু এগিয়ে। কাল সন্ধ্যায় পৌঁচেছে, সকালবেলা সবাই এসে আলাপ পরিচয় করে যাচ্ছেন। সকলের শেষে এলেন সেরেস্তাদার বাবু।

শিশির বলে, অনেককাল তো রয়েছেন এখানে। কি কি দেখবার আছে—চন্দ্রাকে নিয়ে দেখে বেড়াই এক একটা ছুটির দিনে। খুব ওর উৎসাহ ঘোরাঘুরির ব্যাপারে।

সেরেস্তাদার বললেন, ধাপধাড়া গোবিন্দপুর জায়গা হুজুর, এখানে আবার দেখবার জিনিষ! বউডুবির বিল আছে, দেদার ধানক্ষেত রয়েছে, দেখুনগে যান। ক্ষেতে বসে নিড়ানি দিচ্ছে পেট মোটা পিলেরোগা চাষাভুষোর দল—উঠতে গেলে মাথা ঘুরে পড়ে যায়।

চন্দ্রা রহস্যভরা চোখে চেয়ে বলে, আছে আছে একটি দেখবার। আপনি বলছেন না, আমি খবর রাখি।

আছে—কি আছে? সেরেস্তাদার একটু ভেবে নিয়ে বললেন, ওঃ—চণ্ডেশ্বর মন্দিরের কথা বলছেন, কিন্তু মন্দির নয় এখন তো—ইটের স্তূপ। কেউ যায় না। বিছুটি আর কাঁটা বিটকের জঙ্গল বাবাকে ঘিরে ফেলেছে, গোখরো সাপ ছা-বাচ্ছা নিয়ে ঘরকন্না করছে তার ভিতর।

চন্দ্রা বলে, মন্দির-টন্দির দেখতে কি মন আসে এখন? সে বয়সের দেরি আছে, কি বলো?

বলে হেসে সে শিশিরের দিকে চাইল।

সেরেস্তাদার বললেন, আর এক আছে খালের উপরে নতুন পুল।

তা-ও-তো শেষ হয়নি, কাজ চলছে। আগে কালভার্ট ছিল, বিলের জল নিকাশ হত না। আপনার আগে যিনি ছিলেন হুজুর, তাঁকে ধরে অনেক লেখালেখির পর এদ্দিনে রেল কোম্পানীর টনক নড়েছে।

চন্দ্রা মিটিমিটি হাসছে দেখে মনে মনে একটু গরম হয়েই তিনি বললেন, দেখবার জিনিষ আর কিছু নেই, আমিই হলপ করে বলছি মা-লক্ষ্মী।

জিনিষ নয় সেরেস্তাদার বাবু, মানুষ। হাসি থামিয়ে শান্ত শ্রদ্ধা-স্মিত মুখে চন্দ্রা বলল, গঙ্গেশচন্দ্র পাল থাকেন না এখানে? কাগজে পড়েছি এখানেই তো তাঁর বাড়ি।

বুড়ো সেরেস্তাদার ঘাড় নাড়লেন। গঙ্গেশ—কই গঙ্গেশচন্দ্র বলে তো কেউ······কি করে বলুন তো লোকটা?

আর্মেনিটোলার এক ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে রিভলভার ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালিয়েছিলেন। দু-বছর পরে ধরল তাঁকে। স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যালে বিচার হল—

না, না মা-লক্ষ্মী, ভুল হয়েছে আপনার। সে সব এ জায়গায় নয়। ছা-পোষা মানুষ, শাক-চচ্চড়ি ভাত খায়—ম্যালেরিয়ায় ভোগে, রিবেলভার ছোঁড়াছুঁড়ির তাকত নেই কারো এখানে।

ঘাড় নেড়ে অধীরভাবে চন্দ্রা বলে, আছেন, আছেন। আমার বাবা ছিলেন সেই ট্রাইবুন্যালের মধ্যে। ঠেসে দিয়েছিলেন অবশ্য আট বছর, কিন্তু আমার কাছে কত প্রশংসা যে করেছেন! বাড়ি তাঁর এখানেই।

সেরেস্তাদার বাবু উর্ধমুখী হয়ে আকাশ-পাতাল হাতড়াতে লাগলেন।

মনে পড়ল না? ভেবে দেখুন, তিন বছর হল জেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন—

তিন বচ্ছর-না? হয়েছে। হঠাৎ তিনি যেন অকুল সমুদ্রে কূল দেখতে পেলেন।

হয়েছে, হয়েছে। মুলো গঙ্গুর কথা বলছেন মা-লক্ষ্মী। তা কি করে জানব বলুন যে, খবরের কাগজে ওর নাম হয়েছে গঙ্গেশচন্দ্র—ঐ লোক এত কাণ্ড করে এসেছে কোনখানে। জেল ফেরত না জেল ফেরত—কতই তো

জেল থেকে বেরুচ্ছে! কার দায় পড়েছে, কে মুখস্থ করে বসে থাকে বলুন দাগিগুলোর নাম?

চন্দ্রার করুণা হয় আদালতজীবী এই এঁদের উপর। শুধু নথি আর ফাইল, আরজি আর সামলান-খরচা। বাঁ হাতখানা স্বয়ংক্রিয় নিখুঁত এক যন্ত্র বিশেষ। চেয়ারের হাতার তল দিয়ে পাতাই আছে। সিকি-আধুলি কিছু পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সেটা মুঠো হয়ে এসে পকেটে ঢোকে। আবার তখনি ফিরে এসে যথাস্থানে প্রসারিত হয়। কি-ই বা খবর রাখেন, এদের কাছে কি প্রত্যাশা করা যায় এই ছাড়া?

দিন চারেক পরে। সন্ধ্যার একটু আগে শিশির কোর্ট থেকে ফিরল। গাড়ি গ্যারেজে নিয়ে যেতে বলে ফটকের সামনে নেমে পড়েছে। হেঁটে আসছে এইটুকু। কম্পাউণ্ডে ঢুকে ড্রয়িং রুম অবধি দু-ধারে ফুলবাগান। মালি ফুল জড় করে তোড়া বাঁধছে, আর একটা লোক বিড়ি টানছে তার পাশে উঁবু হয়ে বসে। শিশিরকে দেখে লোকটা বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়াল। মালী এসে একটা তোড়া দু'হাতে সসম্ভ্রমে এগিয়ে ধরল। একবার-দু'বার গন্ধ শুঁকে প্রসন্ন মনে শিশির চলেছে। চন্দ্রাকে তোড়াটা দেবে। কাজ কর্মের অবসর এবার। চায়ের টেবিল সাজিয়ে দিয়ে খানসামা সরে যায়, চা খায় এই সময় দুটিতে বসে বসে। চন্দ্রার প্রদীপ্ত যৌবন ঝিকমিকিয়ে ওঠে প্রসাধন-মাজিত সঙ্গহিল্লোলে, মুখের হাসিতে, বেশভূষায়, চা দেবার সময় চুড়ির মৃদু শিঞ্জিনীতে। এর আগের এস, ডি, ও, ক্লাবে টেনিস খেলতে যেতেন, শিশির বেরোয় না। বারাণ্ডায় উঠে শিশির টের পেল, বিড়িখাওয়া সেই লোকটা তার পিছন পিছন এসেছে।

কি চাই তোমার?

হুজুর আমাকে দেখতে চান, শুনলাম—

তোমাকে? কে তুমি?

আমার নাম—

বিরক্ত দৃষ্টিতে শিশির তাকিয়ে আছে দেখে সে থতমত খেয়ে গেল,

তারপর মরিয়া হয়ে যেন বলে ফেলল, আমার নাম শ্রীযুক্ত গঙ্গেশচন্দ্র পাল—

ফিরে দাঁড়াল শিশির, আপাদ-মস্তক তাকিয়ে দেখল। ঝুলে-পড়া ঠোঁটের পাশ দিয়ে কয়েকটা দাঁত বেরিয়ে এসেছে—পানের ছোপে রাঙা। কিন্তু বাহার আছে লোকটির। গিলে করা পাঞ্জাবি চাদর চড়িয়েছে তার উপর। চুল ফাঁপিয়ে এলবার্ট টেড়ি কাটা। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো—ছেঁড়া জুতো কিন্তু টাটকা খড়ি মাখানো। মুখেও পাউডার জাতীয় কি মেখে এসেছে, সাদা সাদা গুঁড়ো উড়ছে ছাইয়ের মতো। ঘোর বিনয়ীও বটে—এত ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে যে মুখ দেখা যায় না ভাল মতো—

শিশির বলল, গঙ্গেশচন্দ্র অর্থাৎ—অর্থ শোনবার অপেক্ষায় না থেকে লোকটা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি—আমিই। সেরেস্তাদার বাবু বললেন যে আমাকে।

এই লোকের প্রশংসা নাকি চন্দ্রার বাপের মুখে ধরে না! নিঃসংশয় হবার জন্য তবু শিশির জিজ্ঞাসা করে, আর্মেনিটোলার কেসে পড়েছিলেন—আপনিই?

ভয়ে লজ্জায় কেমন হয়ে পড়ল গঙ্গু। বলে, কাঁচাবয়স তখন হুজুর। যে যেমন বোঝাত, তাতেই নেচে উঠতাম। বললে, ইংরেজ তাড়াতে হবে—লেগে গেলাম। তার প্রায়শ্চিত্তও হয়েছে। তবু তো রক্ষে, হাতে-কলমে কোন কিছু করে বসবার আগেই ধরা পড়লাম। নয় তো ঝুলিয়ে দিত, আর বেরিয়ে আসতে হত না।

সাড়া পেয়ে চন্দ্রা পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়াল। শিশির বলে, এই যে ইনিই হলেন তোমার গঙ্গেশ মহারাজ। মিষ্টি-মিঠাই কি খাওয়াবে খাওয়াও। ফুলের মালা দিতে চাও তো বলে পাঠাও মালীকে। বলে পোষাক ছাড়তে সে চলে গেল।

আপনি? চন্দ্রা আশ্চর্য হয়ে তাকাল। আজ্ঞে। বড্ড কষ্টের মধ্যে আছি। জেল থেকে মার্কা-মারা হয়ে এসেছি, চাকরি-বাকরি কেউ দেয় না। রেলের পুল হচ্ছে, সেখানে লেবার-সুপারভাইজারের কাজ করছি। পঁয়ত্রিশ টাকা করে পাই। কিন্তু সে আর ক'দিন—

দু-মাস কি আড়াই মাস বড় জোর। আপনি স্মরণ করেছেন শুনে বড্ড আশা করে এসেছি।

কাতর দৃষ্টি তুলে অসহায়ভাবে সে চন্দ্রার দিকে চাইল। বলতে লাগল, সেরেস্তাদার বাবু খবর দিলেন—মহাফেজখানায় একটা কি কাজ খালি আছে। আপনি যদি হুজুরকে একটু বলে কয়ে দেন—

সত্যি কথাই সেদিন সেরেস্তাদার বলেছিলেত। গঙ্গেশ নয়—এই গঙ্গু আছে, নুলো বাঁ হাতখানা সন্তর্পণে চাদর-ঢাকা দিয়ে এসেছে।

চন্দ্রা বলে, আপনার ঐ হাত নাকি শুনতে পাই—পুলিশে মুচড়ে দিয়েছিল?

এদিক-ওদিক চেয়ে সভয়ে গঙ্গু বলল, সে কি কথা? কে বলল? আমি তো কখনো বলিনি। ওঁরা মোচড়াতে যাবেন কেন? ছাত থেকে পড়ে ভেঙে যায়, শেষটা কেটে ফেলতে হল।

যাবার সময়—হাত জোড় করবার ক্ষমতা নেই, নুলো হাত এনে যুক্ত করের ভঙ্গিতে বলল, চাকরিটা পাই যেন, দেখবেন—

আগষ্ট, ১৯৪২। হঠাৎ যেন মানুষ বদলে গেল। চারিদিকে রহস্যময় থমথমে ভাব। উদ্বেগে শিশির সারারাত ঘুমুতে পারে না।

চন্দ্রা প্রবোধ দেয়, দূর—কি যে অত ভাবো, এ জায়গায় কিচ্ছু হবে না। খবরের কাগজটাই পড়ে না এখানকার কেউ। গঙ্গেশকে দেখলে তো—সেই মানুষের ঐ অবস্থা, আর সবাই কি রকম বুঝে নাও ওর থেকে—

শিশির বলে, উঁহু, খবর পাচ্ছি যে বেয়াড়াগোছের—

কি?

ফিসফিস করে শিশির বলল, আট টাকা করে চালের মণ—তার উপর চাল বাইরে চালান হয়ে যাচ্ছে। ভিতরে ভিতরে এই নিয়ে শলা-পরামর্শ চলেছে নাকি খুব—

চন্দ্রা নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলে, হোকগে। চাষাভুষা তো—নির্বিষ ঢোঁড়া। আটের জায়গায় আশি হলেও না খেয়ে শুকিয়ে মরবে, ফণা তুলে কেউ দাঁড়াবে না, তুমি দেখো

সেরেস্তাদার বাবু সন্ধ্যার পর চুপি চুপি এসে আবার মুলো গন্ধুর নামটাও বলে গেলেন। ভেবে চিন্তে শিশির পরদিন কোর্টে যাবার মুখে গঙ্গেশের বাড়ি গিয়ে উঠল।

রমেশ গঙ্গেশের ছোট ভাই—মাইনর ইস্কুলে মাষ্টারি করে। বেলা হয়ে গেছে, খেতে বসছিল—মোটরের হর্ণ শুনে মুখ বাড়িয়ে দেখল। দেখে ছুটতে ছুটতে এল। মাইনর ইস্কুলেরও প্রেসিডেণ্ট শিশির। এমন বিশ পঁচিশটা প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেণ্ট হতে হয়েছে তাকে, হরিসভা থেকে সাহিত্য সভা পর্যন্ত। মহকুমা শহরের এই রেওয়াজ।

গঙ্গেশ কাজে যায়নি, নিবিষ্ট হয়ে তাস খেলছিল একা একা। চার-জনের তাস ভাগে ভাগে রেখেছে, কত কি হিসাবপত্র করে ফেলছে এক একখানা। রমেশ ডাকল, এস, ডি, ও, এসেছেন দাদা—

মুখ না তুলে গঙ্গেশ বলে, কোথায়?

বারান্দায় মোড়া পেতে বসিয়েছি। তাড়াতাড়ি আছে তাঁর—

হুঁ—বলে গঙ্গেশ সমস্ত তাস তুলে আবার ভাঁজতে লাগল—।

দেরি কোরো না—বলে আবার বাইরে ছুটল রমেশ। তার হয়েছে বিষম জ্বালা।

শিশির জিজ্ঞাসা করে, কি বললেন?

এক্ষুনি আসছেন। বললেন, কোনরকম অসুবিধা না হয় স্যারের। সিগারেট নেই এ বাড়িতে, গড়গড়া চলবে কি স্যার?

শিশির ঘাড় নাড়ল। হাতঘড়ি দেখে বলে, ইস—দশটা সাতাস—

এসে যাবেন এইবার। মানে, আমার মেয়ের টাইফয়েড চলছে, সমস্ত রাত দাদা জেগেছেন তাকে নিয়ে। এখন বেদানার রস খাওয়াচ্ছেন। মেয়েটা আবার ওঁর বড্ড নেওটা কিনা—

অপ্রতিভ হয়ে শিশির বলে, অসময়ে এসে পড়েছি, বলুন গে একটা কথা বলেই আমি উঠব। কথাটা জরুরি।

ভিতরে গিয়ে রমেশ কাতর হয়ে ডাকে, ও দাদা!

এখন গঙ্গেশ তেল মাখছে। মৃদু হেসে বলল, যাচ্ছিরে ভাই—

তামাক সেজে কলকেটা যেই গড়গড়ার মাথায় তুলেছে, ছোঁ মেরে

গঙ্গেশ কেড়ে নিল গড়গড়টা। ভুড়ুক-ভুড়ুক ক'রে ক'টা টান দিয়ে গড়গড়া হাতে সে বাইরে চলল।

যাক্, কথাবার্তা বলুন গে এবার—নিশ্চিন্ত হয়ে রমেশ রান্নাঘরে খেতে বসল।

খেয়ে দেয়ে কাপড় চোপড় পরে রমেশ ইস্কুলে যাচ্ছে, দেখে, শিশির তখনো একা একা চুপচাপ বসে।

দাদা যে এলেন এইদিকে—

শিশির বলে, একজন কাকে দেখলাম বটে গড়গড়া হাতে চলে গেলেন। গঙ্গেশ বাবুই হয়তো—

সর্বনাশ! দাদা ভেবেছেন, নাটমণ্ডপে এসে বসেছেন আপনি। সেখানে চলে গেছেন।

শিশির ডাকে, শুনুন—এইটে তাঁকে দিনগে। আর বলুন, একটা কথা মাত্তোর, মিনিটখানেক বড় জোর লাগবে।

কাগজখানা হাতে নিয়ে রমেশ দ্রুত চলল। কৈফিয়তটা নিজের কানেই অদ্ভুত লাগছিল, শিশিরের সামনে থেকে সে পালিয়ে বাঁচল। ডেপুটি বাবুর খোঁজে নাটমণ্ডপেই গিয়ে থাকে যদি, এই আধঘণ্টা ধরে কি করছে সেখানে? তা' ছাড়া মণ্ডপ পড়ে মরুক, একটা খোড়োঘরও নেই যে ওদিকটায়। একটানা উলুক্ষেত।

উলুক্ষেতের ধারে পুকুর। গিয়ে দেখে, বাঁধানো চাতালের উপর গড়গড়া—মহানন্দে গঙ্গেশ সাঁতার কাটছে।

বিরক্ত কণ্ঠে রমেশ বলল, চান করতে করতে তামাক খাচ্ছ নাকি?

নয়তো গড়গড়া নিয়ে দিতিস তো ডেপুটিকে? আমার গড়গড়ায় যে সে তামাক খাবে, আমি পছন্দ করিনে।

মন্দ কাজ করতে আসেন নি উনি। চাকরি চেয়েছিলে—নিজে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার নিয়ে এসেছেন, এই দেখ। আর কি কথা আছে বলছেন—

ভুস করে ডুব দিল গঙ্গেশ। ডুব সাঁতার দিয়ে অনেক দূরে গিয়ে ভেসে উঠল।

ঐ উলুবন ভেঙেই রমেশ ইস্কুলের পথে নামল। শিশিরের মুখোমুখি পড়ে গেলে মিথ্যে একটা কিছু বানিয়ে বলারও আর পথ নেই।

সেই রাত্রে এক কাণ্ড হল। ঘুণাক্ষরে কেউ ভাবেনি, এমন হতে পারে এ জায়গায়। পুল হচ্ছে। খালের ভিতর থেকে থাম গেঁথে গেঁথে তোলা হচ্ছে। কাঠ ও বাঁশ ঠেকানো দিয়ে লাইন উঁচু করে রাখা হয়েছে, মিটার-গেজের গাড়ি ওর ওপর দিয়ে সামাল হয়ে চলাচল করে। জল আটকাবার জন্য অস্থায়ী বাঁধ দেওয়া হয়েছে। বর্ষায় এখন এ অঞ্চলের সমস্ত জল এসে চাপ দিচ্ছে বাঁধের গায়ে। এপাশে খালের মধ্যে বড় জোর এক কোমর জল, আর ওদিকে জল জমে বাঁধের কানায় কানায় উঠেছে। জল ক্রমেই বাড়ছে, মাটি ফেলে ফেলে রোজই উঁচু বাঁধ আরও উঁচু করা হচ্ছে।

দিনে যারা কুলির কাজ করে তাদেরই জন কয়েক বর্ষারাত্রে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বাঁধের উপর এসেছে। কোদাল পাড়ছে অতি সন্তর্পণে। বেশি নয়, হাত দুই গভীর—এমনি পাঁচ সাতটা নালা কেটে দিতে পারলেই, ব্যাস। তারও দরকার হল না—মাঝামাঝি গোটা দুই মাত্র হয়ে যেতেই জলের তীব্র বেগ নতুন মাটি ভেঙে বিস্তীর্ণ পথ করে নিল। পুলের কাঠ বাঁশ ঠেলে ভাসিয়ে বিপর্যয় ঘটাল এক মুহূর্তে। রেলের পাটি আলগা হয়ে শূন্যে ঝুলতে লাগল।

রাত্রি তিনটে সাতাশে একখানা মালগাড়ি যায়। ধান চালান যাচ্ছে বলে এই গাড়ির সঙ্গে নাকি আরও বাড়তি ওয়াগন জুড়ে দেওয়া হচ্ছে আজকাল। সারা অঞ্চলের মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, তাদের মুখের অন্ন সেই সময় চলে যায় দেশ-দেশান্তরে। ড্রাইভার দেখল, দুটো লাল আলো কে দোলাচ্ছে লাইনের উপর। ব্রেক কষে ইঞ্জিন থামাল, লণ্ঠন ফেলে লোকটাও অমনি লাইন থেকে লাফিয়ে পড়ল রাস্তায়। পালাতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে গেল জলকাদায়। হুলো গঙ্গু। হেরিকেনের কাচে লাল কাগজ এঁটে দিয়েছে। ভাঙা পুলের উপর গাড়ি উলটে মানুষ জন মারা না পড়ে,—সেকালের রিভলভার-ধারী গঙ্গেশ তাই হুলো বাঁ হাতের কনুয়ে ঝুলিয়ে নিয়েছিল একটা হেরিকেন, আর একটা নিয়েছিল ডান হাতে—আলো দুলিয়ে দুলিয়ে গাড়ি থামাবার সঙ্কেত জানাচ্ছিল ড্রাইভারকে।

পুলিশ-লাইনে খবর গেল, হৈ-হৈ পড়ে গেল। এ জায়গার ইতিহাসে খণ্ড প্রলয়ের ব্যাপার। খবর চলে গেল শিশিরের বাংলোয়, স্বদেশি-ওয়ালারা রেললাইন ভেঙে দিয়েছে, ধরা পড়েছে তাদের একটা।

ঘুম থেকে উঠে শিশির রওনা হতে যাচ্ছে, পুলিশ-ইনস্পেক্টর নিজে চলে এলেন। শুকনো মুখে বললেন, আসামিকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে।

হাসপাতালে কেন?

অজ্ঞান হয়ে গেছে। পাবলিক বড্ড উত্তেজিত হয়েছিল কিনা!

মুখ কালো করে শিশির বলে, বাড়া-বাড়ি করেন আপনারা। আইন-আদালত রয়েছে, শাস্তির ভার আপনারা নেন কেন? আইন দিয়ে কংগ্রেসকে মেরে ফেলা হয়েছে বলে ভাবছেন বুঝি, আপনারাই থাকবেন আর কংগ্রেস মরে থাকবে চিরকাল?

হাসপাতালে গিয়ে দেখে আঘাত গুরুতর—গঙ্গেশ অচেতন তখনো। তারপর গেল পুলের অবস্থা দেখতে। এমন কিছু নয়—বাঁশ-কাঠগুলো কেবল খসে গেছে, এক বেলার মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে, বিকালের গাড়ি স্বচ্ছন্দে চলতে পারে বলে মনে হয়। বাঁধ কেটে অবশ্য অন্যায় করেছে এরা, কিন্তু জলের চাপেও তো নতুন মাটির বাঁধ ভেঙে যেতে পারত! দোষ রেল-কোম্পানির—এমন শামুকের গতিতে কাজ চালায় কেন? দোষ গবর্ণমেণ্টের—চালের দাম বেড়েছে, তবু কেন গাদা গাদা ধান চালান হয়ে যায়? দোষ তো আমেরি-কোম্পানির, কংগ্রেস কি করে না দেখেই কেন এত পারতাঁরা কষতে গেল,—কোটি কোটি মানুষের এত বড় দেশকে এই দুঃসময়ে কোন সাহসে চ্যালেঞ্জ করল?

সকাল হয়েছে। হাসপাতাল থেকে এসে খবর দিল, গঙ্গেশের জ্ঞান ফিরেছে। কিন্তু বিষম বেয়াড়াপনা করছে, জেলখানার গাড়িতে সে উঠবে না।

পাশেই হাসপাতাল। শিশির, চন্দ্রা দু-জনে চলল। তাদের দেখে দু-খানা বেতের চেয়ার তাড়াতাড়ি এনে দিল হাসপাতালের বারাণ্ডায়। গঙ্গু দাঁড়িয়ে তখন চিৎকার করছে, যেতে হয়, হেঁটে যাব। চোর না ডাকাত—কেন আমি ঢুকব কয়েদির গাড়ীতে? মারবে? কায়দায়

পেয়ে গেছ, ছাড়বে কেন? এতক্ষণ তো দেখলে, খুসি না হয়ে থাকো, মারো আবার যতক্ষণ পার।

মাথায় প্রকাণ্ড ব্যাণ্ডেজ। পোষাক-আঁটা পুলিশদল মস্‌মস করে বেড়াচ্ছে। গঙ্গুর কণ্ঠস্বর একটু কাঁপে না, মুখের ভাববিকৃতি নেই—যেন ইস্পাতে তৈরী মুখ, যেন বুলেট বেরিয়ে আসছে ইস্পাতের মুখগহ্বর থেকে। চন্দ্রার বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে ওঠে। চেয়ার ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল।

ট'লছেন—পড়ে যাবেন যে! বসুন।

কিন্তু সে বসল না। লাঠির মতো খাড়া সে দাঁড়িয়ে রইল। শিশির জিজ্ঞাসা করে, দলটার সেনাপতি কে?

গঙ্গু থাবা দিয়ে গঙ্গু বলে, আমি—আমিই—

তুমি? তবেই হয়েছে। কদর বোঝা গেল তোমাদের রেজিমেণ্টের—

কি করা যাবে? উপরে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের ধরে ফেলেছে। আমায় এসে ঠেকেছে। কাজ তো বন্ধ থাকতে পারে না তা বলে?

শিশির বলে, কিন্তু তোমাদের নেতারা কখনো এসব পছন্দ করতেন না।

গঙ্গু হেসে বলে, বেশ তো, ছেড়ে দিন তাঁদের, পছন্দ না করেন, তক্ষুণি তোবা করব সকলে। কি করতেন না করতেন, আপনার কথা মেনে নিতে পারিনা তো।

চন্দ্রা দেখছে গঙ্গেশকে। বাপ শত কণ্ঠে যার কথা বলতেন।

পাঁচ পাঁচটা চার্জ সত্ত্বেও আদালতে মাথা নীচু হয়নি যার। অন্যায় তার নয়, তারই উপর অন্যায় হচ্ছে—এমনি একটা ভাব চলনে-বলনে। সেই মানুষটাকে চোখে দেখবে বলে কত লোলুপ হয়েছিল সে মনে মনে! তাদের বাংলোয় গিয়েছিল সে দিন আর কোন লোক—আজকে হাসপাতালে এই প্রথম তাকে দেখছে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায়। এরা সেই ক্ষ্যাপার দল—দু'শ বছরের পরাধীনতা মনের সঙ্গে যারা মানান করে নিতে পারল না। দিব্যি খাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে, চাকরির জন্য করজোড়ে দরবার করে বেড়াচ্ছে—সাধারণ সময়ে দীনাতিদীন অতি-বিনম্র মানুষ। হঠাৎ ঝড় ওঠে এক-একটা, ডাক এসে যায়। পায়ের ধুলো ঝেড়ে মেতে ওঠে অমনি, প্রাণ যেন হাতের মুঠোয় করে ছুঁড়ে ফেলতে এগিয়ে ছুটে যায়।

পুরুষ-পুরুষান্তর ধরে চলছে—ঢেউ উঠছে, উত্তাল জন-প্রবাহ। জব্দ করা গেল না এদের কিছুতে, বংশ বেড়েই চলেছে। বাইরের চেহারায় বুঝবার জো নেই, মনে মনে সবাই পাগল, সকলে কবি—স্বপ্নে মসগুল হয়ে আছে ঐ শিশির পর্য্যন্ত। ভাগ্যিস সরকার বাহাদুর পরম অনুগতদের বুকের ভিতরটা দেখতে পান না!

বিমুগ্ধচোখে চন্দ্রা গঙ্গেশের দিকে চেয়ে আছে। সকালের প্রসন্ন আলোয় রাজাধিরাজকে দেখছে যেন। চাকরির নিয়োগচিঠি ছেঁড়া কাগজের সামিল এর কাছে, মহকুমা হাকিম তুচ্ছাতিতুচ্ছ লোক। কত লম্বা দেখাচ্ছে আজ। যে মাথা সেদিন নুয়েছিল, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে উঁচু হয়ে গেছে সে মাথা। ব্যাণ্ডেজ যেন রাজমুকুট।

বেড়া

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাড়ীর ঠিক মাঝখানে উঁচু চাঁচের বেড়া। খুব লম্বা মানুষের মাথা ছাড়িয়েও হাত খানেক উঁচু হবে। বেড়া ডিঙ্গিয়ে কারো নজর চলবে না, অবশ্য যদি উঁচু কিছুর উপর দাঁড়িয়ে নজর চালানো না হয়। অন্য উপায়ও আছে। ফুটোতে চোখ পাতা।

বাড়ীটাকে সমান দু'ভাগে ভাগ ক'রেছে বেড়াটা, পশ্চিমের ভিটার লম্বা দাওয়া ভাগ ক'রে, উঠান ভাগ ক'রে সদরের বেড়ার চার হাত ফাঁকের ঠিক মাঝখান দিয়ে খানিক এগিয়ে বাড়ীতে ঢুকবার এই ফাঁক আড়াল ক'রতে দাঁড় করানো সামনের পর্দ্দা বেড়ার ঠিক মাঝখানে ঠেকেছে।

আগে, প্রায় সাত বছর আগে, গোবর্দ্ধন ও জনার্দ্দনের বাপ অনন্ত হাতী যখন বেঁচে ছিল, তখন বাড়ীতে ঢুকবার পথ ছিল একটা, দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। এই পথের সামনেও বসানো ছিল একটা আড়াল করা পর্দ্দা-বেড়া। ভাগের সময় পথটা পড়েছিল জনার্দ্দনের ভাগে। সদরের বেড়ার আরেক প্রান্তে, অর্থাৎ উত্তর-পূব কোণে বেড়া কেটে নতুন একটা প্রবেশ-পথ করে নিতে অত্যন্ত অসুবিধা থাকায় গোল বেধেছিল। ঢুকবার বেরোবার পথই যদি না থাকল, বাড়ীর এমন ভাগ দিয়ে সে কি করবে, গোবর্দ্ধন প্রতিবাদ জানিয়েছিল। মালিকদের মানতে হ'য়েছিল যে তার আপত্তি সঙ্গত। অনেক মাথা ঘামিয়ে তারপর সালিশরা, যাদের প্রধান ছিলেন সদরের সেরাস্তাদারের বাবা প্রাণধন চক্রবর্ত্তী জ্যোতির্বিদ্যাভূষণ, ব্যবস্থা দিয়েছিলেন ভাগের বেড়ার দু'পাশে সদর বেড়া দু'হাত ক'রে কেটে দুই অংশের ঢুকবার বেরোবার পথ করা হোক, আর পুরাণো পর্দ্দা-বেড়া তুলে এনে স্থাপন করা হোক এই বিভক্ত পথের সামনে; কারণ, ও বেড়াটাও দু'ভায়ের বাপের সম্পত্তি। এতএব দু'জনের ওতে সমান অধিকার।

জনার্দ্দন আপত্তি ক'রে বলেছিল, আড়াল করা বেড়া সরালে সদর বেড়ার কোণের পুরাণো পথের ফাঁকে রাস্তার লোক যে তার বাড়ীর বৌ-ঝিদের দেখতে পাবে, তার কি হবে? সে এমন কি অপরাধ ক'রেছে যে, গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে তাকে বন্ধ ক'রতে হবে বেড়ার ফাঁক! রীতিমত সমস্যার কথা। সালিশরা যখন মীমাংসা খুঁজতে মাথা ঘামাচ্ছেন, গোবর্দ্ধন উদার ও উদাসভাবে বলেছিল, তিনহাত বেড়ার ফাঁক-বন্ধ করার পয়সা খরচ করতে যদি জনার্দ্দনের আপত্তি থাকে, সে এদিকের অংশ নিক্। সদর বেড়ার ফাঁকের অসুবিধা ভোগ করতে গোবর্দ্ধন রাজী আছে।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সালিশরা হঠাৎ সমস্যাটার চমৎকার মীমাংসা আবিষ্কার করেন। কেন, দু'পাশে দু'হাত করে পথ ক'রতে সদর বেড়ার মাঝখানে চারহাত অংশ তো কাটতেই হবে, তাই দিয়ে অনায়াসে বন্ধ করা যাবে জনার্দ্দনের অংশের সদর বেড়ার পুরাণো ফাঁক।

এমনি দুর্য্যোধনী জেদি হিংসার চুলচেরা ভাগাভাগির প্রতীক হ'য়ে ভাগের বেড়াটি দাঁড়িয়ে আছে সাত বছর। অনন্ত হাতীর শ্রাদ্ধের দশ দিন পরে বেড়াটা উঠেছিল। আদালত কুরুক্ষেত্রে তারপর যত লড়াই হ'য়ে গেছে দু'ভায়ের মধ্যে জমিজমা নিয়ে, যত হাতাহাতি, গালাগালি হ'য়ে গেছে বাগানের ফল, পুকুরের ঘাট, গাছের মরা ডালের ভাগ নিয়ে তারও যেন প্রতীক হ'য়ে আছে এই বেড়াটিই। জীর্ণ হ'য়ে এসেছে বেড়াটা, এখানে ওখানে মেরামত হ'য়েছে, আর এখানে পড়েছে মাটির চাপড়া, ওখানে গোঁজা হ'য়েছে ন্যাকড়া, সেখানে সাঁটা হ'য়েছে কাগজ।

বেড়ার ফুটোয় চোখ পেতে উঁকি মারা চলত—দু'পাশ থেকেই। হঠাৎ গোরবগোলা জল বেড়া ডিঙ্গিয়ে এসে পড়ত গায়ে। গোবর্দ্ধনের মেয়ে পরাবালা একদিন চোখ পেতে আছে বেড়ার ফুটোয়, জনার্দ্দনের মেয়ে তাকে তাকে থেকে একটা কঞ্চি সেই ফুটো দিয়ে চালান ক'রে দিল তার চোখের মধ্যে। চোখ যায় যায় হল পরীবালার, মাথা ফাটে ফাটে হল গোবর্দ্ধন ও জনার্দ্দন দু'ভায়ের, ক'দিন পাড়ায় কাণপাতা গেল না দু'বাড়ার মেয়েদের গলাবাজিতে। বেড়ায় কাঁথা-কাপড় শুকোতে দিলে অদৃশ্য হ'য়ে যেত। এঁটো কাঁটা, নোংরা ছেলেমেয়ের মল বেড়া

ডিঙ্গিয়ে পড়ত একপাশ থেকে অন্যপাশে। এ-পাশের পুঁই-বেড়া বেয়ে উঠে ওপাশের আয়ত্তে একটি ডগা একটু বাড়ালেই টেনে যতটা পারা যায় ছিঁড়ে নেওয়া হত। বেড়া ডিঙ্গিয়ে অহরহ আসা যাওয়া করত সমালোচনা, মন্তব্য, গালাগালি, অভিশাপ। চেরা বাঁশের বেড়াটাকে মাঝে রেখে এমন একটানা শত্রুতা চলত দু'পাশের দু'টি পরিবারের মধ্যে যে, সময় সময় মনে হত কবে বুঝি ও পাশের চালা পুড়িয়ে দেবার ঝোঁক সামলাতে না পেরে এপাশে নিজের চালায় আগুন ধরিয়ে দেয়।

গোলমাল এখনো চলে, বিদ্বেষ এখনো বজায় আছে পুরো মাত্রায়। তবে গোড়ার দিকের মত খুঁটিনাটি, তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে অহরহ হাঙ্গামা চলে না, গায়ে পড়ে সহজে কেউ ঝগড়া বাধায় না। ঢিলটি মারলে যে পাটকেলটি খেতে হবে দু'পাশের মানুষগুলি সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে সংযম অভ্যাস ক'রতে বাধ্য হ'য়েছে। আক্রমণাত্মক হিংসা কমে এসে এখন দাঁড়িয়েছে ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অবহেলাত্মক মনোভাবে। খোঁচাবার ও গায়ের ঝাল ঝাড়বার প্রক্রিয়াও ক্রমে ক্রমে বেশ কৌশলময় ও মার্জ্জিত হ'য়ে উঠেছে। এ-পাশের ছেলেমানুষ কানাই মাঝের বেড়ার মাহাত্ম্য ভুলে ও-পাশে সমবয়সী বলাইয়ের সঙ্গে খেলতে গেলে, শত্রুপক্ষের ছেলেকে আয়ত্তে পেয়েও ও-পাশের কেউ তাকে ধরে পিটিয়ে দেয় না, আচ্ছা ক'রে মার দেওয়া হয় বলাইকে! এ-পাশ থেকে হাঁক ওঠে, কানাই! কানাই এলে তাকে চড়চাপড় মেরে উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করা হয়, ও-বাড়ী মরতে গেছিলি কেনরে, বেহায়া পাজী বজ্জাত? ও-পাশ থেকে জবাব আসে বলাই-এর প্রতি আরও জোর গলায় শাসানোতে, ফের যদি ও-বাড়ীর কারো সাথে তুই খেলিস্ হারামজাদা নচ্ছার......

দু'পাশেই ছেলেমেয়ে আছে, হাজার বলে তাদের বোঝানও যায় না যে, বেড়ার ও-পাশে যেতে নেই। ছেলেমেয়েরা তাই নিরাপদ থাকে। তবে কুকুর বেড়ালের রেগাই নেই। এপাশের বেড়াল ও-পাশে হাঁড়ি খেতে গেলে তার রক্ষা থাকে না।

দু'পাশের হাঁড়িই যখন প্রায় শূন্য থাকছে দুর্ভিক্ষের দিনে, জনার্দ্দনের ছেলে চন্দ্রকুমারের বৌ রাণীবালার মাদুরে বিড়ালটা মেউ মেউ ক'রে বেড়াচ্ছে খিদের কাতর হ'য়ে। গোবর্দ্ধন একদিন কোথা থেকে যোগাড় ক'রে

নিয়ে এল আধসেরি একটা রুইমাছ। মাছ দেখে খুসী হ'য়ে হাসি ফুটল সবার মুখে, দু'মুঠো চাল সেদিন বেশী নেওয়া হল এই উপলক্ষে। গোবর্দ্ধনের ছেলে সূর্য্যকান্তের বৌ লক্ষ্মীরাণী আঁশবঁটি পেতে কুটতে বসল মাছ।

মাছ কাটা শেষ হ'য়েছে, কাছে দাঁড়িয়ে সূর্য্যকান্ত বৌয়ের দিকে গোড়ায় যেমন তাকাত প্রায় সেই রকম সপ্রেম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাছের দিকে, রাণীবালার আদুরে বিড়াল এসে একটুকরো মাছ মুখে তুলে নিল। মাছ কাটা বঁটিটা তুলেই সূর্য্যকান্ত বসিয়ে দিল এক কোপ। রাণীবালার আদুরে বিড়াল একটা আওয়াজ পর্য্যন্ত না ক'রে মরে গেল। মাছের টুকরোটা মুখ থেকে খসে পড়ায় লক্ষ্মীরাণী সেটা তুলে রাখল চুপড়িতে।

পথের ধার থেকে মরা বিড়াল নিয়ে গেল চণ্ডী বসাক। চাল ছিল না কিন্তু ঘরে তার একটু নুন আর একটু হলুদ-লঙ্কা ছিল। ঘুরে ঘুরে হত্যা দিয়ে দু'টি খুদকুড়ো চণ্ডী যোগাড় ক'রে নিয়ে এল। ঝাল ঝাল বিড়ালের মাংস দিয়ে সে-দিন সে দু'বেলা ভোজ খেল সপরিবারে।

হত্যাকাণ্ডের খবরটা রাণীবালা পেল পাঁচুর মার কাছে। ও-বাড়ীতে দু'টি চালের জন্য গিয়েছিল, পায়নি। নিজের চোখে সে ঘটনাটা দেখেছে আগাগোড়া। এ কি কাণ্ড মা, ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করিস, হিংসে করে মা ষষ্ঠির বাহনকে মারলি একাদশীর দিন, এত শত্রুতা!

'দু'টি চাল দিবি বৌ? দেমা, দু'টি চাল। বিড়াল ছানা দেব তোকে একটা, তোর পায়ে ধরি খুদকুড়ো যা'হোক দুটি দে।'

'কোথা পাব গো? চাল বাড়ন্ত। খুদকুড়ো শাউড়ী আগলে আছে।'

বলে বিড়ালের শোকে রাণীবালা কাঁদতে থাকে, সামলাতে না পেরে ডুকরে কেঁদে উঠে অভিশাপও দিয়ে বসে ও-পাশের খুনেদের। ছেলেবেলা থেকে রাণীবালা বিড়াল পুষতে ভালবাসে, কত পোষা বিড়াল তার মরে আর হারিয়ে গেছে। ও-বাড়ীর লোক হত্যা না ক'রলে হয়তো বিড়ালটার জন্য এত শোক তার হত না।

কিন্তু এমনি অবাক কাণ্ড, এই নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধানোর বদলে

জনার্দ্দন তাকেই ধমক দিয়ে বলল, আঃ চুপ্ কর বাছা। বাড়াবাড়ি কোরো না।'

চন্দ্রকান্তও প্রায় ধমকের সুরে বলল, 'তোমার বিড়াল যায় কেন চুরি ক'রে খেতে?'

রাণীবালা হকচকিয়ে যায়, ভেবে পায় না ব্যাপারখানা কি। রাগে অভিমানে তার গা জ্বালা করে, ভাবে না খেয়ে শুয়ে থাকবে কিন্তু ভরসা পায় না। কারো পেট দু'টি ফেনভাত আর কলমী সিদ্ধ খেয়ে ভরে না; কেউ যদি তাকে খাওয়ার জন্য সাধাসাধি না করে সে না খেয়ে গোসা ক'রে শুয়ে থাকলেও!

চন্দ্রকান্ত তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়—পুলপারে জমিটা না বেচে আর উপায় নেই। গোবর্দ্ধন ও জনার্দ্দন দু'জনে মিলে না বেচলে জমিটা বেচবারও উপায় নেই। কাল দু'জনে পরামর্শ ক'রে ঠিক ক'রেছে প্রাণধন চক্রবর্ত্তীকে জমিটা বেচে দেবে। এখন কোন কারণে গোবর্দ্ধন বিগড়ে গিয়ে বেঁকে বসলে মুস্কিল হবে। 'ঝগড়াঝাটি কোরো না খবর্দ্দার, ক'দিন মুখ বুজে থাকো।'

বিড়াল মারার সময় গোবর্দ্ধন উপস্থিত ছিল না। ফিরে এসে ব্যাপার শুনে সেও অসন্তুষ্ট হয়ে সূর্য্যকে বলে, 'একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই তোদের? এমনি করে ফ্যাকড়া বাধাও, ব্যস, জমি বেচাও খতম। খেয়ো কচুপোড়া সিদ্ধ ক'রে। খবর্দ্দার, কেউ ঝগড়া করবে না ওদের সাথে। মুখ বুজে থাকো ক'দিন।'

সাত বছরের শত্রুতা স্বার্থের খাতিরে একদিনে হঠাৎ স্থগিত হয়ে গেল। দু'পারেই কটু কথা যদি বা কিছু বলা হল, হল চুপি চুপি, চাপা গলায়, নিজেদের মধ্যে। এপার কথা বলল না বটে ওপারের সঙ্গে সোজাসুজি কিন্তু ওপারকে শোনাবার জন্যই এপার চেঁচালো: 'ও কানাই, ওদের বেগুন্ ক্ষেতে গরু ঢুকেছেরে!' ওপারও চেঁচালো এপারকে শুনিয়ে: 'ও বলাই, ওদের পুঁটু পুকুর পাড়ে একলা গেছে-রে!' আমতলায় কানাই-বলাইকে খেলতে দেখে কোন পার কিছু বলল না। এপারে ছেলে ওপারে যাওয়ায় ওপারের ছেলে চড় খেল না। লক্ষীরাণীর বিড়াল প্রায় সারাটা দুপুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রইল ওপারের দাওয়ার কোণে

জড়ো করা ছেঁড়া চটে। হাতটা মনটা বার বার নিসপিস করে উঠলেও রাণীবালা পর্য্যন্ত তাকে কিছু বললো না। ওপারের পুই গাছের 'সতেজ ডগাটি লক লক ক'রে বাতাসে দুলতে লাগলো এপারের এলাকায়।

কথা যা বলাবলি হল তিনদিনে দু'পারের মধ্যে, তা শুধু গোবর্দ্ধন আর জনার্দ্দনের জমি বিক্রি নিয়ে গম্ভীর নৈর্ব্যক্তিক কথা, তবু এ-ভাবেও তো সাতবছর তারা কথা বলে নি।

দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়ে টাকা পাবার দিন সকালে বেড়ার এপার থেকেই গোবর্দ্ধন বলে, 'কখন রওনা হবে, জনা ?'

'এই খানিক বাদে' জবাব দিয়ে একটু থেমে জনার্দ্দন যোগ দেয়, 'ফেল্‌নার জ্বরটা বেড়েছে।'

ফেলনা রাণীবালার ছেলে।

একসাথে বেরোয় দু'জনে, জনার্দ্দন ডাক দিয়ে নিয়ে যায় গোবর্দ্ধনকে। একসাথে বাড়ী থেকে বেরোবার কোন দরকার অবশ্য ছিল না। চক্রবর্ত্তীর বাড়ী হ'য়ে তারা সাব রেজেষ্ট্রারের অফিসে রওনা হবে, একে একে গিয়ে সেখানে জুটলেও চলতো। কিন্তু সাত বছর বিবাদ ক'রে আর দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কাটাবার পর দু'ভাই যখন শান্তভাবে ক'দিন ধরে কথা বলে, তখন কি আর দরকার আছে না আছে অত হিসাব করে সব কাজ তারা করে! দু'জনে চলতে থাকে একরকম নির্ব্বাক হ'য়েই। মাঝে মাঝে এ ওর মুখের দিকে তাকায় আড়চোখে। সাত বছরে দু'জনের বয়স যেন বিশ বছর বেড়ে গেছে সংসারের চাপে, দুর্ভিক্ষের গত দু'বছরেই যেন বেশী বেড়েছে। ভবিষ্যতে আরও কি আছে ভগবান জানেন।

'দরটা সুবিধা হল না।'

'উপায় কি ?'

'ডবল দরে এমন জমি মিলবে না।'

'ঠিক। লতিফের সেচা জমির চেয়ে ভাল ফসল দিয়েছে গতবার।' গোবর্দ্ধন এক গাছতলায় দাঁড়িয়ে পড়ে।—'শোন, বলি জনা। না বেচলে হয় না জমিটা ? এক কাজ করি আয়। না বেচে বাঁধা রাখি, পারি তো ছাড়িয়ে নেব দু'জনে মিলে।'

'চকোত্তি মহাশয় কি রাজী হবে ?'

'রাজী না হয় তো মধু সা'র কাছে বাঁধা দেব। নয় তো রথতলার নকুঞ্জ। বেচে দিলে তো গেল জন্মের মত। যদি রাখা যায়।'

গাছতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোবর্দ্ধন ও জনার্দ্দন—অনন্ত হাতীর দুই ছেলে, কথাটা বিচার ও বিবেচনা ক'রে দেখতে থাকে। দেখে লোকের মনে হয় যেন আলাপ ক'রছে দু'টি সাঙ্গাৎ।

এদিকে জ্বর বাড়তে বাড়তে ফেলনার যায় যায় অবস্থা হয় দুপুর বেলা। চাঁচের বেড়া থাকলেও ওপারে সব টের পায় সবাই। সূর্য্যের মা ইতস্ততঃ করে অনেকক্ষণ, ফিস ফিস ক'রে সূর্য্য আর লক্ষ্মীকে জিজ্ঞেস করে কয়েকবার, 'যাব নাকি ?' তারপর বেলা পড়ে এলে সতীরাণীর বিনুনী কান্না শুনে হঠাৎ মনস্থির করে সাত বছর পরে সূর্য্যের মা বেড়ার ওপারে যায়, আস্তে আস্তে গিয়ে বসে ফেলনার শিয়রে চাঁদের মার পাশে। সন্ধ্যার আগে ফেলনা মারা গেলে মড়া কান্না শুনে এপারের বাকী সকলেও হাজির হয় ওপারে। সাত বছরে পাঁচবার মড়া কান্না উঠেছে জনার্দ্দনের অংশে কিন্তু গোবর্দ্ধনের অংশ থেকে বেড়া পেরিয়ে কেউ কখনও আসেনি। সাত বছর পরে আজ বেড়ার দু'দিকের মেয়েরা বেড়ার একদিকে হ'য়ে একসঙ্গে কাঁদতে আরম্ভ করে। চাঁদ শোকের নেশায় পাগলের মত কাণ্ড আরম্ভ করলে সূর্য্য তাকে ধরে রাখে। একটু রাত করে গোবর্দ্ধন ও জনার্দ্দন যখন বাড়ী ফেরে তখনও দেখা যায় ওপারের প্রায় সকলেই রয়েচে এপারে, ওপারের ছেলেমেয়েগুলি ঘুমিয়ে পড়েছে এপারের মাদুরে, কাঁথায় এপারের ছেলেমেয়েগুলির সঙ্গে।

তাই বলে যে খিটিমিটি ঝগড়াঝাটি বন্ধ হ'য়ে গেল দু'পারের মধ্যে চিরদিনের জন্য, উঠানের মাঝখানে পুরানো চাঁচের বেড়াটা থেকেও রইল না, তা নয়। মানুষ তা'হলে দেবতা হ'য়ে যেত। তবে পরের আশ্বিনের ঝড়ে পচা বেড়া পড়ে গেলে সেটা আবার দাঁড় করাবার তাগিদ কোন পারেরই দেখা গেল না। বেড়াটা ভেঙ্গে ভেঙ্গে জ্বালান হতে লাগলো দু'পারেরই উনানে। দু'পারের ঝাঁটার সঙ্গেও সাফ হ'য়ে যেতে লাগলো বেড়ার টুকরোর আবর্জ্জনা। শেষে একদিন দেখা গেল দাওয়ার বেড়াটি ছাড়া উঠানে বেড়ার চিহ্নও নেই, বাড়ীর মেয়েদের ঝাঁটায় দু'টার বদলে একটা উঠান তকতক ক'রছে।

বিদায়

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

শীতকাল। সন্ধ্যার পর থেকেই একটা বিশ্রী কনকনে হাওয়া দিচ্ছে। কৃত্তিবাস ঘোষেদের দাওয়ায় আর বসে থাকতে পারলো না। সদ্য ম্যালেরিয়া থেকে উঠে তার দেহে শুধু ক'খানা হাড় সার হয়েছে। চোখ হ'লদে, দেহে রক্তের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। এই হাওয়া ওর যেন হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।

উঠতে-উঠতে বললে, কী হাওয়া দেখেছ মোড়ল! আর তো ব'সে থাকতে পারি না। হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত হিল হিল করে কাঁপছে।

কাঁপছে অবশ্য শুধু একা ওরই নয়। মজলিসের সবই অল্পবিস্তর ম্যালেরিয়ার রোগী। তবে কৃত্তিবাসই বেশি জেরবার হয়েছে। লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারে না।

কৃত্তিবাস উঠলো। দত্তদের আমবাগানের ভিতর দিয়ে সরু পায়ে চলা পথ গিয়েছে। সাপের ভয়ে হাতে তালি দিতে দিতে সে চললো। বাগান পেরিয়ে যেখানে দু'পাশে দু'টো এঁদো ডোবার মধ্যে দিয়ে বাঁশের সাঁকো, তার উপরে এসে সে একবার দাঁড়ালো। হাওয়া যেন এইখানটায় সব চেয়ে বেশি জোর। কেমন যেন একটা দূষিত দুর্গন্ধ!

তবু কোনো রকমে চললো।

গায়ে একটা ছেঁড়া শতচ্ছিদ্র কাঁথা। তাই তার লেপ তার তোষক। বাড়ী এসে ঘরের দরজার পটপটে ভাঙ্গা তালাটা চাবি দিয়ে খুললে। একে অন্ধকার তার উপর শীতে হাত কাঁপছে। তবে কোনমতে খুললে।

তারপরে দরজা বন্ধ করে এক কোণে সেই কাঁথাটা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

জ্বর নয়। কাঁপুনি। শীতের হাওয়ার ঠকঠকে কাঁপুনি! ক্ষুধাও পেয়েছে। ও-বেলার বাসি-ভাত আছে। কলাই গুঁড়ো এবং কাঁচা পেঁয়াজও আছে। ঠিক করেছে লবণ, কাঁচা লঙ্কা এবং কাঁচা তেল সহযোগে তাই দুটি খাবে। কিন্তু এই কাঁপুনিটা না থামলে নয়।

কৃত্তিবাস শুয়ে শুয়ে কাঁপে, আর নিজের দুঃখময় জীবনের কথা ভাবে : অত্যন্ত ছোট বেলায় তার বিয়ে হয়েছিল। তার কিছু পরেই বাপ-মা দুজনেই গেল মারা। তখন তার বয়স চৌদ্দ-পোনেরো। কিন্তু অসুরের মতো বলিষ্ঠ চেহারা। বিঘে দু'-তিন জমি বাপ রেখেছিল। পাড়ার ভদ্রলোকদের আরও কিছু জমি ভাগে নিয়ে একখানা হালের চাষ সে চালাতে লাগলো। বৌ রতনমণির বয়স তখন এগারো-বারোর বেশি হবে না কিন্তু ওই বয়সেই সে গোটা সংসার মাথায় তুলে নিলে।

শামলা রঙের পাৎলা ছোট মেয়েটি মাথায় ঘোমটা টেনে ভাত রাঁধতো, গরু-বাছুরকে খেতে দিত, গোয়াল পরিষ্কার করতো, কোন কোন দিন মাঠে স্বামীর জন্যে জলখাবারও নিয়ে যেতো। তারপর সমস্ত দিনের খাটুনির পর রাত্রে একপাশে শুয়ে এমন অঘোরে ঘুমুতো যে কৃত্তিবাস ওর চুলের মুঠি ধরে টেনেও ঘুম ভাঙাতে পারতো না।

বৎসরের পর বৎসর যায়। রতনমণির সর্বদেহে যৌবনের বান ডেকে ওঠে। তার শ্যামল দেহে নববসন্তের কচি পাতার আভাস লাগে। ক্ষণে ক্ষণে তার মাথার ঘোমটা যায় খুলে, কথায় কথায় উচ্ছ্বসিত হাসির তরঙ্গে যেন ফেটে পড়ে।

আনন্দে কৃত্তিবাসের দিন কাটে।

তার পরে এলো দুর্ভিক্ষ। তার বিয়ের বাবদ বাপ মরবার সময় পঞ্চাশ টাকা দেনা রেখে গিয়েছিল মহাজনের ঘরে। সুদে-আসলে সেই টাকা পাঁচশো টাকায় উঠেছিল। পিতৃশ্রাদ্ধের জন্যে তার নিজেরও কিছু দেনা হয়েছিল। সেই সমস্ত দেনা সে আট-ন' বসৎরের মধ্যে শোধ ক'রে দিয়েছিল।

কিন্তু উপর্য্যুপরি ক'বৎসর অজন্মা এবং তারপরে দুর্ভিক্ষের ধাকা সে সামলাতে পারলো না। প্রথমে জমি গেল, তারপরে হালের বলদ লাঙল, তারপরে শুধু ভিটেটা ছাড়া আর কিছুই রইল না।

তারপরে একদিন ভোরের অন্ধকারে রতনমণির হাত ধরে কৃত্তিবাস বেরিয়ে পড়লো।

বহু জায়গা ঘুরে বহু দোরে হাত পেতে অবশেষে তারা কল'কাতায় পৌছুলো। ছ'মাস এখানে তারা রইলো। তারপরে যখন ভিখারী

বিতাড়ন আরম্ভ হ'ল, তখন একদিন রতনমণিকে সে আর কোথাও খুঁজে পেলে না।

নিজেও সে তখন আর ক'লকাতায় থাকতে পারছে না। পুলিশের সামনে প'ড়ে গেলে তাকেও কোথায় চালান ক'রে দেবে। সুতরাং একদিন একাই সে দেশে ফিরে এল। রটিয়ে দিল বৌ ম'রে গেছে।

তারপর থেকে এই ভাঙা ঘরেই সে রয়েছে। নিজে এক বেলা রাঁধে, দু'বেলা খায়। যেদিন জ্বরে ধোঁকে, সেদিন আর রান্নার বালাই থাকে না। জ্বরের যন্ত্রণায় ছটফট ক'রে, আর রতনমণির কথা ভাবে। রতনমণি যে তার জীবনের এতখানি একথা সে এর আগে কখনও বুঝতেও পারেনি।

আজকেও কাঁথা-মুড়ি দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে তারই কথা ভাবছিলো। কাঁপুনি আর থামে না। কে জানে আবার তার জ্বরই আসছে কি না। জল তৃষ্ণা পাচ্ছে খুব, গলা শুকিয়ে আসছে। এই সময় রতনমণি থাকলে কাঁথাশুদ্ধ তাকে জড়িয়ে ধরলে তার শীত ভেঙে যেত। কলসী থেকে একটু জলও গড়িয়ে দিতে পারতো। কিন্তু কোথায় গেল সে? কোথায়? কোথায়?

কাঁপতে-কাঁপতে কোঁথাতে-কোঁথাতে কৃত্তিবাস উঠলো। জল একটু না খেলেই নয়।

হঠাৎ জানালা থেকে একটা ছায়ামূর্তি যেন স'রে গেল।

—কে? কে?

স্পষ্ট দেখলে কৃত্তিবাস। জানালায় তার কপাট নেই। বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। সেই আলোয় স্পষ্ট সে দেখলে যেন একটী নারীমূর্তি স'রে গেল।

ভূত নয় তো?

ওদিকটায় ওদের খিড়কির ডোবা। তার চারিদিকে ঘন বাঁশবন। ওদিক দিয়ে কে আসবে তার ঘরের ভিতর রাত্রি বেলায় উঁকি দিতে?

সেই মূর্তি আবার উঁকি দিলে। মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুল। তারই উপর একটুখানি ঘোমটা যেন ঝুলছে। মূর্তি যে স্ত্রীলোকের তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই অসময়ে কে এই স্ত্রীলোক?

—কে? কে? কে তুমি?—কৃত্তিবাস চীৎকার ক'রে উঠলো। মূর্তি সরে গিয়েছিল। ফিরে এসে শান্তভাবে জানালার ধারে দাঁড়ালো। চাঁদের আলো তির্যকভাবে এসে পড়েছে ওর কালো মুখের খানিকটায়। সেই আলোয় ওর চোখ যেন চকমক করছে।

কৃত্তিবাস রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। গলা দিয়ে ওর যেন স্বর বেরুচ্ছিলো না। প্রাণপণ চেষ্টায় কোনমতে সে আবার বললে, কে?

—চিনতে পারছ না?

—না।

মূর্তি হাসলে। সঙ্গে সঙ্গে ওর দাঁত নেকড়ে বাঘের দাঁতের মতো ঝকমক ক'রে উঠলো।

ভয়ে কৃত্তিবাসের বুকের ভিতরটা পর্য্যন্ত যেন হিম হয়ে গেল।

মূর্তি বললে, তা চিনতে পারবে কেন? আমি রতনমণি।

—তুমি? তুমি বেঁচে আছ? সত্যি?

সঙ্গে-সঙ্গে তার সংজ্ঞাহীন দেহ সেইখানে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল।

যখন জ্ঞান হোল দেখলে, ও রতনমণির কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে।

আস্তে আস্তে সব কথা ওর মনে পড়লো। কিন্তু রতনমণির স্পর্শে ভয় ওর অনেকখানি ভেঙে গেছে। তবু বোধ হয় সুনিশ্চিত হবার জন্যেই শীর্ণ হাতখানি ওর অস্থিসার দেহের সর্বাঙ্গে একবার বুলোলে। তেল তো পাওয়া যায় না। ঘরে আলো নেই। অন্ধকারে রতনের মুখও ভালো দেখতে পাচ্ছিলো না।

বললে, কত রোগা হয়ে গিয়েছিস?

রতন হাসলে। বললে, তোমার চেয়েও?

কৃত্তিবাস বললে, তোকে খুঁজে কোথাও পেলাম না। বাড়ি ফিরে এলাম। এসে ম্যালেরিয়ায় পড়েছিলাম। তুই ছিলি না। কী কষ্ট!

টেনে টেনে কৃত্তিবাস বললে।

গভীর স্নেহে রতনমণি ওর বড় বড় রুক্ষ চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। কৃত্তিবাসের এবং নিজের দুঃখে ওর চোখ ছলছল ক'রে উঠলো। কিন্তু অন্ধকারে কৃত্তিবাস তা দেখতে পেলে না।

রতনমণি বললে, পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে। সেখান থেকে পালিয়ে কত জায়গা ঘুরতে-ঘুরতে তবে এলাম।

কোথায় দেশ, তা কি ছাই চিনি!

রতনমণি হাসলে।

—খাবি কিছু?—কৃত্তিবাস একটু পরে জিজ্ঞাসা করলে,—ভিজে ভাত আছে দেখ্ ওই কোণে। কলাই গুঁড়ো আছে, পেঁয়াজ আছে, কাঁচা লঙ্কা আছে······

রতনমণির জিহ্বা লালাসিক্ত হয়ে উঠলো। তবু বললে, তুমি কিছু খাবে না?

—জ্বর দেখছিস না? এই জ্বরে খায় কখনও?—কৃত্তিবাসের বুকের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

রতনমণি আর অপেক্ষা করলে না। অন্ধকারেই ঢাকা খুলে সেই ভাত খেতে আরম্ভ ক'রে দিলে। খাওয়ার অতি দ্রুত সপ সপ, সড়াৎ-সড়াৎ শব্দে কৃত্তিবাস বুঝলে কতদিন হয়তো ওর খাওয়াই হয়নি। করুণায় তার মন ছলছল ক'রে উঠলো।

এক মিনিটের মধ্যে থালা-ভরা ভাত নিঃশেষ ক'রে সুনিপুণ হস্তে এঁটো বাসন গুছিয়ে রেখে দিলে।

কৃত্তিবাস বললে, আর দুটি ভাত নিতিস, না?

লজ্জিতভাবে রতনমণি বললে, না না।

বাইরে থেকে হাত ধুয়ে এসে রতনমণির শীত ক'রে উঠলো। দাঁতে-দাঁতে ঠকঠক শব্দ হতে লাগলো। বললে, উঃ! কী শীত গো!

নিজের কাঁথাটা একটু ফাঁক ক'রে কৃত্তিবাস বললে, ভিজে ভাত খেয়ে উঠলি কি না তাই। এইখানে আয়।

রতনমণি ছুটে এসে সেই কাঁথার মধ্যে আশ্রয় নিলে। স্বামীর জ্বরতপ্ত দেহ জড়িয়ে ধ'রে বললে, আঃ! তোমার গা'টা কি গরম! ভারি ভাল লাগছে।

ব'লে চোখ বন্ধ ক'রে একটু হাসলে।

সকালে উঠে রতনমণি সংসারের কাজে মন দিলে। দাওয়ায় একটা

চাটাই পেতে বসে কৃত্তিবাস একদৃষ্টে ওর কর্মতৎপর লঘু গতিভঙ্গি দেখতে লাগলো।

কিন্তু কী চেহারা হয়েছে রতনমণির! মাথার চুলগুলি কটিয়ে জট পাকিয়ে গিয়েছে। মুখে একটা রুক্ষতা। গায়ের চামড়া ফাটা-ফাটা, যেন খড়ি উঠছে।

আপন মনেই জোরে জোরে বললে, নারকোলের তেল আবার পাওয়া যাচ্ছে না। মতি দত্তকে তোয়াজ ক'রে দেখি, যদি ছটাকখানেক পাওয়া যায়।

আবার বললে, সর্ষের তেল আছে। বেশ ক'রে তেল খানিক মেখে সকাল-সকাল চান ক'রে আয়। ছিরি একটু ফিরুক।

রতনমণি হাসলে। বললে, দাঁড়াও, তোমার বাড়ির ছিরি আগে ফেরাই। চারদিকের পাঁচিলটা পড়ে গেছে, বাড়ি যেন শ্মশানের মতো খাঁ খাঁ করছে। আব্রু বলতে কিছু নেই।

উঠতে উঠতে কৃত্তিবাস বললে এতদিন আব্রুর দরকার তো ছিল না। এইবার দেব। মুখুজ্যে বাড়ির গিন্নিমা বলেছিলেন, একখানা কাপড় দেবেন। দেখি তোর জন্তে একখানা প্রসাদী শাড়ি যদি পাওয়া যায়।

কৃত্তিবাস চলে গেল।

রতনমণি বেশ ক'রে সরিষার তেল মাখলে গায়ে। অভাবে পড়ে মাথায়ও সরিষার তেলই দিলে। মাথায় যে কতদিন হাত দেয়নি তা তার মনেও পড়ে না। অমন যে তার চুলের বোঝা, অযত্নে ইন্দুরের লেজের মতো ছোট হয়ে গেছে।

তেল মেখে একখানা গামছা কাঁধে ফেলে ঘড়া কাঁখে দাঁত মাজতে মাজতে রতনমণি ঘাটে গেল কতদিন পরে!

—ওমা মোড়ল বৌ যে! কখন এলি?

—কাল রাত্তিরে।

—তাই নাকি? চুপি চুপি এসেছিস, কেউ জানতে পারেনি।

একজন টিপ্পনি কাটলে চুপি-চুপি আসবে না তো কি ঢাক বাজিয়ে আসবে? দিদির যেমন কথা!

—তবে যে কৃত্তিবাস ঠাকুরপো বললে···কোথায় ছিলি এতদিন?

রতনমণি হেসে বললে, চুলোয়।

—কেন গিয়েছিলি মা? নিজে শ্বশুরের ভিটেয় না খেয়ে ম'রে পড়ে থাকাও ভালো। দেখ দিকি কী ছিরি ক'রে এসেছিস!

ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী প্রবীণা স্ত্রীলোক। রতনমণির মায়ের মতন। তাকে স্নেহও করেন যথেষ্ট। তাঁর কথায় রতনমণির অশ্রু আর বাঁধ মানলো না। এতক্ষণ পরে ঘাটের সিঁড়িতে বসে সে অঝোরে কাঁদতে লাগলো। আর তার চারিদিকে সান্ত্বনার যেন ঝড় বইতে লাগলো। তার তোড়ে ও যেন আরও দিশাহারা হয়ে গেল।

কিন্তু এটা বাহ্য।

রতনমণি স্নান সেরে চলে যেতেই ঘাটে আবার পার্লামেণ্ট বসলো।

—একটা কথা বলব সরলাদি? মোড়ল-বৌকে কেমন-কেমন লাগলো না?

—তুই লক্ষ্য করেছিস?

—তা আর করব না? আমরা কি পেটে ছেলেপুলে ধরিনি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। একসঙ্গে অনেক কণ্ঠ সমস্বরে চীৎকার ক'রে উঠলো: সবাই পেটে ছেলেমেয়ে ধরেছে। সবাই লক্ষ্য করেছে। ওদের চোখকে ফাঁকি দেবে কে? কী ঘেন্নার কথা মা! অমন ভালো মেয়ের একী মতিচ্ছন্ন হ'ল!

—কৃত্তিবাসদা জানতে পেরেছে?

—দাঁড়া। এই তো সবে এলো। ওসব জিনিস অত সহজে কি পুরুষ মানুষের চোখে পড়ে! তবে জানবে বই কি! ওসব কি আর চাপা থাকে?

একটা খবরের মতো খবর পেয়ে সবাই খুশি হয়ে কলসী-কাঁখে ডান হাতটা জোরে-জোরে দোলাতে-দোলাতে নিজের নিজের বাড়ি চলে গেল।

রতনমণির ফিরে আসার খবরে মুখুয্যে গিন্নি খুবই খুশি হলেন। নিজের একখানা টুকটুকে লাল চওড়া পাড় শাড়ি কৃত্তিবাসকে দিয়ে দিলেন।

বললেন, ও-বেলায় বৌমাকে একবার পাঠিয়ে দিবি, বুঝলি?

ভক্তিভরে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে কৃত্তিবাস ঘাড় হেলিয়ে বললে, সে আর বলতে ঠাকরুণ! আপনার নাম করতে চোখে জল আসে।

শুনে গিন্নিমার চোখ ছলছল ক'রে উঠলো। অচিরে চোখ মুছে বললেন, বড় ভালো মেয়ে বাবা। কতটুকু বয়স থেকে তো দেখে আসছি। অনেক তপিস্যে না করলে অমন বৌ পাওয়া যায় না।

ওঁর মুখে রতনমণির প্রশংসা শুনে কৃত্তিবাসের শীর্ণ বুকও দশ হাত ফুলে উঠলো। কথাটা মিথ্যে তো নয়। অমন বৌ এ গ্রামে আর একটাও নেই। তার তপস্যার জোর আছে বলেই রতনমণিকে সে পেয়েছে। একথা নিজেই কতবার নিজের কাছে সে স্বীকার করেছে।

চওড়া লাল পাড় শাড়িখানা পরলে তাকে দেখতে কেমন লাগবে, সেই দৃশ্য কল্পনা করতে করতে সে বাড়ি ফিরলো।

তখনও রতনমণি স্নান ক'রে ফেরেনি। কিন্তু এই একটা সকালেই সে যেন বাড়ির শ্রী ফিরিয়ে দিয়েছে। উঠানে সে জঙ্গল নেই। বাড়ি ঢুকতেই কতকগুলো ভাঙা মাটির হাঁড়িকুঁড়ি চোখে পড়তো, সেগুলোও কোথায় অদৃশ্য হয়েছে। গোময়-লিপ্ত উঠান-দাওয়া যেন ঝকমক করছে! রতনমণি নইলে বাড়ি মানায়!

এখন একটা আব্রু দরকার।

রতনমণি আসামাত্র কৃত্তিবাসের জ্বর যেন সেরে গেছে। তার গায়ে আবার যেন সেই আগেকার দিনের মহিষের শক্তি ফিরে এসেছে। সে তখনই একখানা কাটারী কোমরে গুঁজে তালগাছে উঠল এবং দেখতে দেখতে প্রচুর তাল-বাগড়া কেটে ফেলে চারিদিকে বেড়া দিতে লেগে গেল।

স্নান সেরে রতনমণি ফিরে আসতেই আড় চোখে একবার ওর দিকে চেয়েই কৃত্তিবাস গম্ভীরভাবে বললে, ঘরের ভেতর কাপড় রয়েছে পর।

বঙ্কিম ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে রতনমণি বাঁকা হেসে বললে, আসতে-না-আসতেই পাহারার ব্যবস্থা হচ্ছে বুঝি?

মুখ না ফিরিয়েই কৃত্তিবাস বললে, হবে না? তুই কি যেমন-তেমন বৌ নাকি? গিন্নিমার কাছে ও-বেলায় গিয়ে তোর গুণের কথা শুনে আসিস।

ব'লেই একটা হাত কানে দিয়ে আর একটা হাত আকাশে তুলে

কৃত্তিবাস ভাঙা গলায় গান ধরলে : "বহুদিন পরে বঁধূয়া আইল, দেখা না হইত পরাণ গেলে…"

—মরণ আর কি!—বলে রতনমণি খুশিতে সমস্ত দেহ তরঙ্গায়িত ক'রে কাপড় ছাড়তে ঘরে ঢুকলো।

একটু পরে মাথা আঁচড়ে এলোচুল পিঠে ফেলে চওড়া লাল-পাড় শাড়িখানি প'রে রতনমণি যখন বেরিয়ে এলো, কৃত্তিবাস হাতের কাজ ফেলে উবু হয়ে ব'সে, দুই হাতে হাঁটু জড়িয়ে ধ'রে হাঁ ক'রে চেয়ে রইলো।

রতনমণির কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙা হয়ে উঠলো। ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, অমন করলে আমি দরজা বন্ধ ক'রে ঘরের ভেতর ব'সে থাকবো,—হুঁ্যা।

ব'লে রান্না করতে চলে গেল।

বিকেল থেকে আরম্ভ হ'ল পাড়ায়-পাড়ায় ঘোট। রতনমণি অন্তঃস্বত্বা! কী ঘেন্নার কথা!

ঘোষেদের আড্ডায় ঘেন্নার কথাটা কৃত্তিবাসের কানেও পৌঁছুলো। সে তো রেগেই আগুন! ব'লে বসলো কোন্ শালা একথা বলে! তার মাথায় মারি জুতো! এ হতেই পারে না।

শশী ঘোষ বুড়ো মানুষ, স্বভাবতই ধীর প্রকৃতি। ওর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত ক'রে বসিয়ে বললে : এতো রাগের কথা নয় বাবাজী, এ হ'ল সমাজ নিয়ে কথা! সত্যি কি মিথ্যে তুমি নিজে যাচাই ক'রে দেখো। তাহ'লেই ল্যাঠা চুকে যাবে। মিথ্যে হ'লে সবারই থোতা মুখ ভোতা হবে। আর সত্যি হ'লে……শশী ঘোষ কথাটা শেষ না ক'রে শুধু একটু কাশলে।

কিছুক্ষণ সেখানে গুম হয়ে বসে থেকে কৃত্তিবাস বাড়ি ফিরে এলো।

রান্না সেরে রতনমণিও চুপ ক'রে দাওয়ায় একা অন্ধকারে বসে ছিল। কানাঘুষায় কথাটা তার কানে পৌঁছেছিলো। কৃত্তিবাসের সাড়া পেয়ে রতনমণি তাড়াতাড়ি উঠে প্রদীপটা জ্বাললে। সেই আলোয় কৃত্তিবাসের পাথরের মতো কঠিন মুখের দিকে চেয়ে তার বুকের ভিতরটা ধ্বক্ ক'রে উঠলো। কৃত্তিবাস কোনো দিকে না চেয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে ধুপ ক'রে শুয়ে পড়লো।

—কি হ'ল? আবার জ্বর এলো নাকি?

কৃত্তিবাস সাড়া দিলে না। চোখ বন্ধ ক'রে প'ড়ে রইলো।

রতনমণি হাত দিয়ে ওর ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করতে যেতেই একটা ঝাপটায় কৃত্তিবাস ওর হাত সরিয়ে দিলে। এবং উপুড় হয়ে শুয়ে অঝোরে ফুপিয়ে-ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

কাঠের মতো শক্ত হয়ে রতনমণি সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলো। তার বুকের ভিতরে ঝড় উঠেছে, কিন্তু বাইরেটা স্তব্ধ। তারপরে আস্তে আস্তে ওর পায়ের কাছে বসলো। ওর চোখ চাঁদের আলোয় কালকের মতো জ্বলতে লাগলো।

বললে, তুমি স্বামী, তোমার কাছে মিথ্যে বললে আমার জিব খসে যাবে। তুমি যা শুনেছ, তা সত্যি। কিন্তু আমার কোনো দোষ নেই। বিশ্বাস করো, আমি খারাপ নই।

—সত্যি? সত্যি?—কৃত্তিবাস চীৎকার ক'রে উঠলো।

—হ্যাঁ। এক এক ক'রে সব কথাই তোমাকে বলছি।

রতনমণি তার উপর অত্যাচারের সমস্ত কথাই বললে। ওর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। চাঁদের-আলোর-আবছা ঘরের দিকে একবার চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, কেনই বা এসেছিলাম। এক দিনে কত স্বপ্ন দেখলাম, সব মিলিয়ে গেল। একটা দিন যে তোমার সেবা করতে পেলাম, যাবার সময় তোমার পায়ের ধুলো মাথায় নিলাম, এইটুকুই শুধু লাভ!

রতনমণি হাসলে, কিন্তু সে কান্না না হাসি বোঝা যায় না।

বললে, আমার মনে কিন্তু কোনো দুঃখ নেই। তুমি যে আমাকে ভালোবাসো তা নিয়ে আমার মনে কোনো সন্দ নেই। তুমিও দুঃখ করো না। বরং আর একটা বিয়ে ক'রে সংসারী হয়ো।

রতনমণি আর বলতে পারলে না। তার গলা ধ'রে গেল। আর একবার কৃত্তিবাসের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো।

* * *

বাইরে ফুট ফুট করছে চাঁদের আলো; কিন্তু সে যেন এ পৃথিবীর চাঁদের আলো নয়। ধুলা-ভরা গ্রাম-পথও যেন এ পৃথিবীর পথ নয়।

অভিভূতের মতো রতনমণি চলেছে,—কোথায় তা সে নিজেও জানে না। হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে তার কাঁধের উপর একখানা হাত রাখলে।

—মাগো!—ব'লে রতনমণি চমকে চেয়ে দেখে কৃত্তিবাস।

সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

কৃত্তিবাস শান্তকণ্ঠে বললে, দাঁড়ালে কেন? ভোর হবার আগে আমাদের অনেক দূর যেতে হবে, যেখানে কেউ আমাদের চেনে না।

—তুমিও যাবে?

—যাবো না তো, বৌমানুষ তোমাকে একলা ছেড়ে দোব নাকি? বাঃ! বেশ!

কৃত্তিবাস পাগলের মতো হা হা ক'রে হাসলে।

সে হাসিতে রতনমণির চোখ জলে ভরে এল। নিঃশব্দে সে চাঁদের দিকে চাইতেই জলভরা নদীর মতো তা চকচক ক'রে উঠলো।

মা হিংসীঃ

— সুবোধ ঘোষ

"অজস্র প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, আসামী গিরধারী গোপ বর্তমান মামলার বহুদিন আগে থেকেই হিংস্র হয়ে উঠেছিল। বর্তমান মামলা আসামীর সেই বিকৃত জীবন ও স্বভাবের চরম পরিণাম। পৃথিবীতে পত্নী-নির্যাতক নামে এক ধরণের লোক দেখা যায়, আসামী গিরধারী বোধ হয় নিষ্ঠুরতায় সেই অপমানবদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর অন্যতম। প্রতিদিন ও প্রতি কথায় সে তার স্ত্রীকে অকথ্য প্রহার, অত্যাচার ও নির্যাতন করতো।"

চারজন অ্যাসেসর অবিচল আগ্রহ নিয়ে ছোট ছোট বিষণ্ণ পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে বসেছিল, দায়রা জজের রায় শুনছিল।

রায় পড়তে পড়তে দু'তিন মিনিট পর পর দায়রা জজ যেন ঢোঁক গিলবার জন্য থেমে যাচ্ছিলেন। রুদ্ধ শ্বাসবায়ু মুক্ত করে দিয়ে নতুন বাতাসে দম ভরে নিচ্ছিলেন।

একটা শব্দহীন ভীড় আদালত কক্ষে জমাট হয়েছিল। প্রাণের ধুকপুক শব্দগুলি যেন প্রত্যেকের বুকের কোটরে আড়ষ্ট হয়ে আছে। প্রত্যেকের নিশ্বাস থেকে, প্রত্যেকের চোখের দৃষ্টি থেকে কিছুক্ষণের জন্য সকল চঞ্চলতার ধর্ম নির্বাসিত। একটু নড়ে উঠলেই যেন এই মুহূর্তের শোকাক্রান্ত ছন্দের লয় ক্ষুণ্ণ হবে। শুধু ব্যস্ত হয়েছিল পাংখাকুলি—মেজের ওপর প্রায় চীৎপাত হয়ে শুয়ে, যেন আক্রোশের সঙ্গে অবিরাম পাখার দড়ি টেনে চলেছে। এজলাসের মাথার ওপর পাখার ঝালর একঘেয়ে শব্দ করে চলেছে—ঝট্‌পট্‌ ঝট্‌পট্‌ ঝট্‌পট্‌। আজকের কাহিনীর সকল যন্ত্রণাকে যেন ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটে তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিতে চায়।

এক একটা বিরামের পর, রায় পড়তে গিয়ে দায়রা জজের গলাটা অস্পষ্টভাবে ঘড়ঘড় করে, পরমুহূর্তেই বেশ স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে ওঠে।

"আসামী গিরধারী গোপের এই হিংস্রতার পিছনে একটা ইতিহাস

আছে। আসামী ইচ্ছা করেই নিজেকে হিংস্র করেছিল, বেশ ভেবে-চিন্তে সে এই পথ ধরেছিল, তার মনের ভিতর একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। আসামী গিরধারী তার প্রতিবেশী সহদেব গোপের তরুণী পত্নী শনিচরীর প্রতি আকৃষ্ট ছিল। হাবেভাবে, ইঙ্গিতে এবং স্পষ্ট ভাষায় সে বহুবার শনিচরীর প্রতি প্রণয় প্রস্তাব করেছে। গিরধারীর ধারণা হয় যে, তার নিজ বিবাহিত পত্নী রাধিয়া যতদিন তার ঘরে আছে, ততদিন তার অভিলাষ সফল হবার আশা নেই। রাধিয়া তার পথের কাঁটা। রাধিয়ার ওপর আসামীর সকল অত্যাচারের রহস্য হলো, পথের কাঁটাকে সে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল।

"আসামী বলেছে যে, সে তার স্ত্রী রাধিয়ার চরিত্রে সন্দেহ করতো। আসামীর সব সময় আশঙ্কা ছিল যে, রাধিয়া তাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টায় আছে। সেই হেতু আসামী তাকে মারধর করেছে, তাড়িয়ে দিতে চেয়েছে। আসামীর স্ত্রী রাধিয়া জেরার উত্তরে বলেছে যে, আসামী তাকে কখনো মারধর করে নি। এই দুই উক্তিই অবিশ্বাস্য।"

মুখ তুলে তাকালো গিরধারী। কাঠের খাঁচার মত আসামীর ডক, তার মধ্যে গুটিসুটি হয়ে সম্মুখের ঘটনার স্পর্শ থেকে নিজেকে আড়াল করে চুপ করে বসেছিল গিরধারী গোপ। জজ সাহেবের বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে একমাত্র ওরই যেন এতক্ষণ কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু হঠাৎ মুখ তুলে তাকিয়েছে গিরধারী। ওর দু'চোখে একটা অদ্ভুত রকমের কৌতূহল ফুটে উঠেছে। তার সমগ্র জীবনের এলোমেলো অর্থহীন ভাঙাটুকরা ভাষাগুলি সুন্দর একটা কাহিনী হয়ে গেছে। হোক্ না ইংরেজি ভাষা, প্রত্যেকটি ধ্বনিতে একটা নতুনত্ব আছে। রাধিয়া! রাধিয়া! জজসাহেব উচ্চারণ করছেন—এই নামটার কোন ইংরেজি করা যায় না। ঐ নামটাকে বদ্‌লানো যায় না।

"শেষ পর্যন্ত রাধিয়া টিঁকে থাকতে পারে নি। আসামীর হাতে নিগ্রহ অসহ্য হওয়ায় সে বাপের বাড়ী চলে যায়। তারপর এক মাসের মধ্যেই ঘটনা অন্যদিকে মোড় ফেরে।

"আসামীর প্রস্তাবে শনিচরী রাজী হয় নি। গত অক্টোবরের পয়লা তারিখে, ভোরবেলার কুয়াশার মধ্যে শনিচারী জল আনবার জন্য কলসী

হাতে গ্রামের বড় ইঁদারার দিকে চলেছিল। পথের পাশে আখের ক্ষেতের ভেতর আসামী গিরধারী একটা হেসো নিয়ে অপেক্ষায় ছিল। ঠিক হিংস্র প্যান্থারের মত গিরধারী আখের ক্ষেত থেকে লাফ দিয়ে বের হয়, শনিচরীর গলার ওপর হেসো দিয়ে তিনটে পোঁচ দেয়। শনিচরী সেইখানে দাঁড়িয়ে একবার চীৎকার করে, তারপরেই প্রাণহীন হয়ে পড়ে যায়।

"গিরধারী গোপ যখন পালিয়ে যাচ্ছিল, গ্রামের তিনজন চাষী তাকে দেখতে পায় ও চিনতে পারে। আসামী ফেরার হয়। পাঁচদিন পরে কাটিহার বাজারে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

"আসামী তিনবার অপরাধ স্বীকার করেছে, তিনবার অপরাধ অস্বীকার করেছে। সকল সাক্ষ্যপ্রমাণ ও তদন্তের হিসাব নিলে এ বিষয়ে তিলমাত্র সংশয় থাকে না এবং সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, গিরধারী গোপ শনিচরীকে প্রতিহিংসাবশে খুন করেছে।

"এক্ষেত্রে আসামীর প্রতি সুবিচার করার জন্যই আমি তাকে চরম দণ্ড—প্রাণদণ্ড দিলাম।

ঝটপট, ঝটপট, ঝটপট,—ঝালর লাগানো প্রকাণ্ড পাখাটা সশব্দে চলছিল। আদালত ঘরে আর কোন শব্দ ছিল না। জনতা শুধু নিষ্পলক চোখে তাকিয়েছিল গিরধারী গোপের মূর্তিটার দিকে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স, রোগা চেহারার গিরধারী। চোখের কোন দুটো কালো, যেন বেশ মোটা করে সুর্মা লেপে দেওয়া হয়েছে। দুহাতে হাঁটু দুটোকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে পা দোলাচ্ছিল গিরধারী।

জজসাহেবের গলা ঘড়ঘড় করে উঠলো,—হিন্দী ভাষায় বললেন—"আসামী গিরধারী গোপ, তোমার অপরাধ সবুদ হয়েছে, তুমি মুসাম্মত শনিচরীকে খুন করেছ। মহামান্য সরকারের ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার নির্দেশমত আমি তোমাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলাম। তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে, যতক্ষণ না তোমার প্রাণ বাহির হয়।"

—বহুত আচ্ছা।

গিরধারী উত্তর দিল। শাণিত বিদ্রূপের হিংসামাখা একটা ক্ষুদ্র প্রতিধ্বনি ক্ষণিকের জন্য যেন আদালত ঘরের স্তব্ধতাকে খান্ খান্ করে দিল। ডকের চারিদিকে পুলিশেরা উঠে দাঁড়ালো। উকিল-মোক্তারের

দল একে একে আসন ছেড়ে বাইরে চলে গেল। জনতা টলমল্ করে একবার ডকের দিকে কৌতূহলের আবেগে ঝুঁকে পড়লো। পুলিস বাধা দিয়ে জনতা সরিয়ে দিতে লাগলো—আগে চলো! আগে চলো! রাস্তা ছাড়ো, খবরদার!

কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়া, গিরধারী গোপ আদালত ঘর ছেড়ে হেঁটে চললো। তার আগুপিছু দু'দিকে প্রহরী। দুপাশে তিন তিনজন করে বন্দুকধারী পুলিস। গিরধারীর প্রতিটি পদক্ষেপ শান্ত ও নির্ভুল। প্রহরীদের উৎকণ্ঠা ও ব্যস্ততার সীমা ছিল না। আদালতের সিঁড়ি থেকে অপেক্ষমান হাজতগামী পুলিস-লরীটা পর্যন্ত বড় জোর দেড়শো গজ পথ। এইটুকু পথ পার হতে হাবিলদার তিনবার অ্যাটেনসন আর দশবার লেফট রাইট হাঁক দিল। ধুপ-ধাপ বুট ঠোকাঠুকি চললো। তবু এতদিনের প্যারেডে অভ্যস্ত পায়ের কদম বার বার ভুল হয়ে যায়। এদিকে দু'জন হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে যায় তো ওদিকে একজন হোঁচট খেয়ে পেছনে পড়ে থাকে। গিরধারীর কোমরের দড়ির এক প্রান্ত শক্ত করে মুঠোয় ধরে এমন জোয়ান চেহারার সিপাহীটাও মিছামিছি হাঁপায়। হাবিলদারের হাতের ছড়ির ইঙ্গিতের তালে তালে বন্দুকধারীরা শরীর দুলিয়ে এক ঢঙে কদম ফেলার চেষ্টা করে। স্বেদাক্ত কপালের রগ দপ দপ করে কাঁপে। বড় বেশী উৎকণ্ঠা, বড় বেশী উদ্বেগ, ভয়ানক রকমের দায়িত্ব। সাধারণ আসামী নয়। এক জঘন্য খুনের আসামী, এইমাত্র তার পরমায়ু নীলামে বিকিয়ে গেছে; তাই তার আজ এত দাম। তাই এত সাবধানতা। রোগা গিরধারী গোপের ছোট ফুসফুসটাকে লোহার আবরণ দিয়ে ঘিরে নিয়ে যেতে পারলেই ভাল ছিল। ওর গায়ে যেন এক কণা ধুলো না লাগে, ওর কানে যেন পাখীর ডাকের শব্দ না পৌঁছয়। কে জানে কোথা থেকে কোন্ ফাঁকে কোন বে-আইনী সূর্যের রক্তমাখা আলোক ওর চোখের দৃষ্টিকে উতলা করে দেবে। হয়তো থমকে দাঁড়াবে, আকাশের দিকে তাকাবে, নড়তে চাইবে না। গিরধারীর জীবনে আজ এই পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ অবান্তর হয়ে গেছে। আলগোছে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে গিরধারীকে। ফাঁসীর আসামীর বুক যেন আনন্দে দুলে না ওঠে—ছিঁড়ে যেতে পারে। যেন চমকে না ওঠে—ফেটে পড়তে পারে। এত বড়

মামলার ঘটা, আইনতুরুস্ত পৃথিবীর এত বন্দোবস্ত সব ভেস্তে যাবে। কোন রোগীকে, কোন মুমূর্ষুকে, কোন আহতকে এত সতর্ক সমাদরে কোন দিন তারা বহন করেনি।

পুলিশ লরীর ভেতর পা দিয়েই গিরধারী একবার বাইরের দিকে উঁকি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলো। কাউকে যেন সে খুঁজছে।

হাবিলদার ব্যস্তভাবে বললো, উঁহু, বসে পড়। দেখবার মত কিছু নেই।

গিরধারী হেসে ফেললো—আপনি ঠিক বলেছেন হাবিলদার সাহেব। আর দেখবার কিছু নেই, কেউ আসেনি।

আদালত এলাকার সীমা ছাড়িয়ে পুলিশ লরী দ্রুত বেগে দৌড়ে চলেছিল। প্রহরীরা যেন একটু স্বস্তি ফিরে পেয়েছে। আসামী লোক ভাল। কোন দৌরাত্ম্য করলো না। আসামী একেবারেই ছিঁচকাঁদুনে নয়, একবারও একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েনি, হাহুতাশ করেনি। এই ধরণের আসামীর হেপাজত নিতে বেশ ভাল লাগে। কোন হাঙ্গামা সইতে হয় না।

মাথার পাগড়ী খুলে পাশে রাখলো সেপাইরা। কপালের ঘাম মুছলো। গিরধারীর দিকে একটু করুণাভরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তারা বার বার তাকিয়ে দেখছিল। লোকটার প্রাণ বেশ শক্ত ধাতুতে তৈরী। একটুও ঘাবড়ায়নি।

অর্জুন সিং বলে—শেষ পর্যন্ত এই রকম দেমাক নিয়ে টিঁকতে পারলে ভাল। কোন কষ্ট পাবে না।

হাবিলদার সন্দিগ্ধভাবে উত্তর দেয়—হুঁ।

ভগীরথী পাণ্ডে হাতের চেটোয় এক টিপ খৈনি নিয়ে জোরে জোরে মলতে আরম্ভ করে। প্রসঙ্গে যোগ দেয়—হ্যাঁ, আর ঘাবড়ে গিয়ে লাভ কি? জোরসে রাম নাম কর, সখসে ঝুলে পড়। ভয় করার কিছু নেই।

ঠোঁট কুচকে গিরধারী আর একবার হাসলো। সেপাইদের দিকে তাকিয়ে যেন একটু তাচ্ছিল্য করেই বললো—আপনারা কেন এত মাথা ঘামাচ্ছেন? মনে হচ্ছে, আপনারাই ঘাবড়ে গেছেন। বড় বেশী প্রেম দেখাচ্ছেন। কিন্তু জেনে রাখুন, আমি ফাঁসি যাব না।

সিপাহীরা একটু অপ্রস্তুত হয়ে শুকনোভাবে হাসতে লাগলো—মাপ

কর ভাইয়া। বেশ, তোমার কথাই সত্যি। তোমার সঙ্গে তর্ক করার ইচ্ছে নেই আমাদের।

হাবিলদার গিরধারীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তীব্র একটা দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে রইল। তার পরেই পাশের সেপাইয়ের কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বললো—দেখছো তো ওষুধ ধরে গেছে। এরই মধ্যে মাথার গোলমাল শুরু হলো। হতেই হবে, মানুষ তো আর লোহার তৈরী নয়।

কনষ্টবল সাকির আলী বলে—বোধ হয় আপীল করবে বলে ঠিক করছে।

হাবিলদার ঠাট্টা করে—হুঁ, আপীল করবে! ওর সংসার বিক্রী করলে দশটা টাকাও হবে না। এক নম্বরের দরিদ্দর, আপীল করবে কোথা থেকে?

অর্জুন সিং—তবে ও কি বলতে চায়?

হাবিলদার—বলছে ওর মাথা আর মুণ্ডু। বুদ্ধি বিগড়ে যাচ্ছে, আর কদিনের মধ্যেই……

গিরধারী এক টিপ খৈনি চায়। হাবিলদার একটু সহৃদয়ভাবেই আপত্তি করে—মাপ কর বাবা।

গিরধারী আবার ঠাট্টা করে—দিয়ে ফেলুন সিপাহিজী, আমি এখনি মরছি না। কোন ভয় নেই আপনাদের, হাজত পর্যন্ত বেঁচে বেঁচেই পৌঁছে যাবে। আপনার মাথার পাথর নেমে যাবে।

সেপাইরা সবাই চুপ করে থাকে। হাবিলদার বলে—আমাদের কাছে মেহেরবাণী করে কিছু চেও না গিরধারী। এই তো আর কিছুক্ষণের মধ্যে হাজত পৌঁছে যাবে। জেলরবাবুর কাছে আর্জি করো, যা চাইবে সব পাবে।

গিরধারী অহংকারের সুরে উত্তর দিল—কিছু আমি চাইব না। কিছু দরকার নেই! আমি সব পেয়ে গেছি। বড় খুসী লাগছে সিপাহিজী।

প্রহরী পুলিশদের মধ্যে কানাকানি আলোচনা হয়—এত টনটনে জ্ঞান ভাল নয়। এরাই শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ে। এখন তো শুধু জেদের জোরে ফরফর করছে—লম্বা লম্বা বুলি ঝাড়ছে। আর দুটো দিন পার

হোক, অন্ধ ভইসের মত গরাদে মাথা ঠুকবে, আর গোঁ গোঁ করবে। ফাঁসির শাস্তি, এ কি ঠাট্টার কথা রে ভাই।

গিরধারী বলে—আমি সব শুনতে পাচ্ছি সিপাইজি। যত খুসী আপশোষ করুন আপনারা। কিন্তু আমি জানি, আমার ফাঁসি হবে না।

গিরধারীর কথাবার্তায় পাগলামির কোন আভাষ নেই। কিন্তু এত জোর গলায় সে যে কথা বলছে, সেটা প্রলাপ ছাড়া আর কি হতে পারে? প্রহরীদের সংশয় আর কৌতূহল এক সঙ্গে মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠছিল। কোথা থেকে এই বিশ্বাস পেল গিরধারী?

মোটর লরি একটা চক পার হয়ে বাঁ দিকে মোড় ঘুরালো। মুখ ঘুরিয়ে ডানদিকের পথের দিকে যেন একটা তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি প্রসারিত করে গিরধারী কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। লাল কাঁকরের একটা কাঁচা সড়ক চলে গেছে এঁকে বেঁকে, দুপাশে দু'সার আম, শাল আর তেঁতুলের ছায়া নিয়ে। অবাধ অবারিত মাঠের বুকের ওপর দিয়ে সড়কটা ডাইনে বাঁয়ে এক একটা ছোট ছোট গ্রাম ছুঁয়ে চলে গেছে—দিগ্বলয়ের কোণে গিয়ে যেন মিলিয়ে গেছে।

গিরধারী জিজ্ঞেসা করলো—এই রাস্তা কোনদিকে গেছে হাবিলদার সাহেব?

হাবিলদার—অনেক দূর চলে গেছে। রফিনগরের বাজার ছাড়িয়ে, বাবুঘাট থানা পার হয়ে একেবারে মুঙ্গের জেলায় গিয়ে পড়েছে। কেন বল তো?

গিরধারী—ছেদিতালাও গাঁ এই পথে পড়ে?

হাবিলদার—হাঁ। কিন্তু ছেদিতালাওয়ের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

গিরধারী—আমার শ্বশুরার ঐ গাঁয়ে।

প্রহরীর দল চাপা স্বরে এক সঙ্গে আপশোষ করলো—আর তোমার শ্বশুরার!

গিরধারী মুখ ঘুরিয়ে আবার ছেদিতালাওয়ের কাঁচা সড়কের দিকে স্থির দৃষ্টি তুলে তাকিয়েছিল। পুলিসদের কোন মন্তব্য বোধ হয় কানে শুনতে পাচ্ছিল না গিরধারী। দূর সর্পিল পথের মাটির সঙ্গে গিরধারীর

সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম যেন পাকে পাকে জড়িয়ে পড়েছে। ওর চোখেমুখে সেই রকম একটা মুগ্ধ আবেশ থম্‌থম্‌ করছিল।

আবার সোজা হয়ে বসতেই অর্জুন সিং প্রশ্ন করলো—সত্যি কথা বলতো গিরধারী, মেয়েটাকে তুমি খুন করেছিলে?

গিরধারী—হ্যাঁ, আমি আগেই ওকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, একদিন সব দেনা-পাওনার হিসাব নেব। যেদিন সুবিধা পেলাম, হিসেব নিয়ে নিলাম।

হবিলদার—বড় ভুল করেছিলে গিরধারী।

গিরধারী যেন ভুল বুঝতে পেরেছে, তেমনি অনুশোচনার সুরে জবাব দিল—হাঁ, হাবিলদার সাহেব, রাত্রিবেলায় একটু নিরালা জায়গাতেই কাজ খতম করা উচিত ছিল, কিন্তু সকাল হয়ে গেছে বুঝতে পেরেও রাগকে বোঝাতে পারলাম না। লোকে দেখে ফেললো। নইলে .....।

খুন করেছে, তার জন্য কোন অনুতাপ নেই গিরধারীর মনে। এবিষয়ে সে নিজেকে আজও নির্ভুল মনে করে। শুধু ভুল—সে ধরা পড়ে গেছে। অপরাধীর দীনতা লজ্জা ও মর্ম্মপীড়ার আর কোন চিহ্ন আবিষ্কার করা যায় না গিরধারীর কথায়।

সাকির আলি আশ্চর্য হয়ে বলে—আমি বাস্তবিক এই কথা ভেবে আশ্চর্য হই, আজ পর্যন্ত কোন ফাঁসীর আসামীকে তার কসুরের জন্য দুঃখ করতে দেখলাম না।

হাবিলদার—আর দুঃখ করার মত ওদের মন থাকে না ভাই। নিজের কসুরের কথা ওরা এক দম ভুলে যায়।

অর্জুন সিং বলে—ফাঁসির হুকুম না হলে, মানুষের মত মনটা তবু থাকে। নিজেকে পাপী বলে বুঝতে পারে, এক আধটুকু আপশোষ করেও। কিন্তু...।

হাবিলদার একটু সম্ভ্রম ও সঙ্কোচে আম্‌তা আম্‌তা করে বলে—একটা প্রশ্ন করবো গিরধারী, মাপ করো ভাই।

গিরধারী—বলুন।

হাবিলদার—তোমার জেনানা রাধিয়া কি সত্যিই খারাপ হয়ে গিয়েছিল?

গিরধারীর মুখটা কঠিন হয়ে উঠলো, শান্তভাবে বললো—সে খবর সে জানে আর আমি জানি। আপনাদের শুনে কি লাভ?

হাবিলদার তীক্ষ্ণ মেজাজে বেশ চড়া গলায় বিদ্রূপ করলো—আরে তুমি তো দুনিয়াকে সে খবর শুনিয়ে দিয়েছ। নিজেই আদালতে আর পুলিসের কাছে বলেছ যে…।

গিরধারীর মুখটা অসহায়ের মত করুণ ও বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। যেন অনুনয়ের সুরে প্রশ্ন করলো—হ্যাঁ, মেহেরবাণী করে বলুন তো হাবিলদার সাহেব, আমি কি বলেছি। আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

হাবিলদার—তুমি বলেছ যে, তোমার জেনানা রাধিয়া তোমাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করতো।

কথাগুলিকে যেন মনের সব আগ্রহ দিয়ে বরণ করে নিচ্ছিল গিরধারী। শুনতে শুনতে সারা মুখে এক বিচিত্র ধরণের পরিতৃপ্তির উচ্ছলতা ছড়িয়ে পড়ছিল। নৌকার ঘুমন্ত যাত্রী যদি হঠাৎ জেগে উঠে ঘাটের মাটি নিকটে দেখতে পায়, সকল ভরসার আনন্দে দীর্ঘ অপেক্ষার ক্লান্তি মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যায়, গিরধারীর দৃষ্টি সেই রকমের। এক প্রচণ্ড অন্ধকারের স্রোতের টানে অবধারিত অস্তিমের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে, কিন্তু গিরধারীর মনে কোন শঙ্কা নেই, তার হাতের মুঠোয় যেন একটা শক্ত কাছির অবলম্বন রয়েছে—দূর তটভূমির হৃদয়ের এক কঠিন আশ্বাসের সঙ্গে বাঁধা। মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে আরও দূরে, মুঙ্গের রোডের এক পাশে ছেদিতালাও গ্রাম। গিরধারীকে ফাঁসির অপমান ও বেদনা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে, মিঠাতালাওয়ের এক মেটে ঘরের নিভৃতে একটা বুকভরা আকুলতা এখন প্রস্তুত হচ্ছে, উপায় খুঁজে বার করছে। সব বুঝতে পেরেছে রাধিয়া, এতখানি বুদ্ধি তার আছে।

সাকির আলি প্রশ্ন করে—কথাটা কি সত্যি?

গিরধারী প্রশ্ন শুনে চমকে ওঠে। ঘোর মিথ্যার আবরণ দিয়ে ঢাকা এই কথার অর্থটা কি ধরা পড়ে গেল? সামলে নিয়ে বেশ শান্তভাবেই গিরধারী উত্তর দেয়—সত্যি না মিথ্যে, সে খবর আমি জানি আর সে জানে।

হাবিলদার মন্তব্য করে - এটা কিন্তু একেবারে মিথ্যে কথা বলেছ

গিরধারী। নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্ত জঘন্য একটা মিথ্যে কথা বললে, কিন্তু কোন লাভ হলো না, না বাঁচলো নিজের প্রাণ, না রইল নিজের

অর্জুন সিং কর্কশভাবে বলে—একবার ভেবে দেখলে না, কি ভাবলো তোমার বউ। বেচারী নিজের কানে তোমার ঐ কথা শুনেছে।

অনুযোগ আর ধিক্কার শুনে গিরধারী একটুও কুণ্ঠিত হয় না, তার চেহারায় উৎফুল্লতা যেন নতুন বিশ্বাসে আরও সজীব হয়ে ওঠে। মনের ভেতর আদালত ঘরের ছবিটা অস্পষ্টভাবে দেখতে পায়। কালো কালো কতকগুলি নরমুণ্ড তাকে ঘিরে ধরে আছে। জজ আর উকীলেরা প্রশ্ন করছে, প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে গিরধারী—রাধিয়া আমাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করতো। আমি জানি একদিন না একদিন বিষ খাওয়াবে। আমি তাই......।

আদালত ঘরের এক কোণে নাকমুখ আঁচল দিয়ে ঢেকে বদ্‌রী চাচার পাশে চুপ করে বসেছিল রাধিয়া। গিরধারীর প্রলাপ শুনতে পেল। চোখ তুলে তাকালো গিরধারীর ধূর্ত মূর্তিটার দিকে। কয়েকটি মুহূর্তের মত চোখের তারা দুটো স্থির হয়ে রইল। সব বুঝতে পেরেছে রাধিয়া। গিরধারীর শেষ কামনার নিবিড় আগ্রহ ঐ প্রলাপের আড়ালে কী স্পষ্ট ইসারা দিচ্ছে। রাধিয়ার হাতের কাঁচের চুড়িগুলি একবার শব্দ করে ওঠে। গিরধারীর সকল উদ্বেগ এক সাফল্যের গর্বে নিশ্চিহ্ন হয়ে উড়ে যায়। ফাঁসির মৃত্যুর অসম্মান থেকে গিরধারীর অন্তরাত্মা উদ্ধার পাবার জন্য যার কাছে আবেদন জানাচ্ছে, সেই আবছা ভাষার ষড়যন্ত্র পৃথিবী ধরতে না পারুক, রাধিয়া নিশ্চয় ধরেছে।

জেলের ফটক দেখা যায়। বুড়ো বটের ছায়ায় ফটকের দাঁতগুলি অস্পষ্ট হয়ে আছে। ওপরে বটের পাতার আড়ালে শত শত বাদুড় ঝুলছে। নীচে বন্দুক কাঁধে শান্ত্রী পাইচারী করে। ফটকের পাশে একটা কাঠের ত্রিভুজের মধ্যে পেতলের ঘণ্টা ঝুলছে।

মোটর লরী ক্রমে মন্থর হয়ে ফটকের সামনে এসে একেবারে থামলো। থপ্ থপ করে মাথায় পাগড়ী গুঁজে, লাঠি খাত্রা বন্দুক আর গিরধারীকে নিয়ে প্রহরীরা বুড়ো বটের ছায়ায় দাঁড়ালো।

অর্জুন সিংয়ের মনটা একটু কল্পনাপ্রবণ রোমান্টিক ধরণের। গিরধারীর পাশে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বললো—আর সময় নেই গিরধারী। এইবার আমাদের হেপাজাত ছেড়ে তোমাকে ভেতরে ঢুকে পড়তে হবে। ধরিত্রীকে প্রণাম করে নাও।

গিরধারী বিস্মিতভাবে অর্জুন সিংয়ের দিকে তাকালো। অর্জুন সিং বললো—সবাই করে ভাইয়া। নাও, তাড়াতাড়ি একটু ধুলো কপালে ঠেকিয়ে নাও। আর সুযোগ পাবে না।

ফটকের ছোট দরজাটা তখন কঁকিয়ে কঁকিয়ে খুলছে, গিরধারীর জীবনের রথ এসে পথের শেষে পৌঁছে গেছে। পেছনের দুনিয়ার মাটি সরে যাবে এই মুহূর্তে। গিরধারীর জীবনে আর উল্টো রথের আশা নেই, চাকা ভেঙ্গে গেছে। লোহার গরাদের ওপারে এক গভীর সুপ্তির জলকুণ্ড লুকিয়ে আছে, সেখানে প্রণাম করার মত মাটি পাওয়া যাবে না। অর্জুন সিং দুঃখিত হয়েই দেখছিল, গিরধারী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

হাবিলদার বললো—চল।

ঢং ঢং করে পাঁচটার ঘণ্টা বাজলো। বুড়ো বটের ছায়া লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ লরির ইঞ্জিনটা স্টার্ট নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফোঁপাচ্ছিল। ফটকের মুখ থেকে বের হয়ে এসে প্রহরীর দল অলসভাবে আবার লরীর ভেতর একে একে উঠে বসলো—হাবিলদার, অর্জুন সিং, সাকির আলি…। গিরধারী নেই, জ্যান্ত গিরধারীর বাসি প্রাণ জেলরের কাছে জমা দিয়ে শুধু রসিদ নিয়ে ফিরে চললো প্রহরীর দল।

মোটর লরিটা আচমকা একবার বাষ্প্ করে দ্রুত দৌড়ে চলে গেল।

পাঁচ হাত লম্বা পাঁচ হাত চাওড়া নিরেট পাথর আর কংক্রীটের গাঁথুনি দিয়ে তৈরী খুপরীর মধ্যে ভাগলপুরী কম্বলের ওপর শুয়ে সে রাত্রে গিরধারী কি স্বপ্ন দেখেছিল, তা কেউ জানে না। কিন্তু সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জেলের প্রত্যেক কর্মচারী, ওয়ার্ডার, শান্ত্রী আর কয়েদী বুঝতে পারলো—এক অতি দুর্দান্ত ফাঁসির আসামীর আবির্ভাব হয়েছে। জেলর থেকে আরম্ভ করে ওয়ার্ডার শান্ত্রী আর ডাক্তার—সবাইকে যা খুসী টিট্‌কারী দিয়েছে, গালাগালি করেছে। একেবারে বেপরোয়া আসামী। মেথরের সঙ্গে

রসিকতা করে শালা সম্পর্ক পাতিয়েছে। স্থূলাকার শাস্ত্রী পাঁড়েজির একটা নতুন নামকরণ করেছে—বীর বৃকোদর।

তাঁতঘরের কয়েদীরা কাজ করতে করতে তখনো শুনতে পাচ্ছিল, সেলের মধ্যে ফাঁসীর আসামী গিরধারী গলা খুলে গান গাইছে—"নজরিয়া লুভায় লিয়ে যায়, মন তিরছি! হাঁরে মন তিরছি!"

কে জানে কিসের স্বপ্নে মাতোয়ারা হয়ে আছে গিরধারী। সারাদিন গোলমাল করে। চীৎকার ক'রে বলে—কোন্ শালা আমার ফাঁসি দেয় দেখবো।

বিদ্রূপ করে বলে—আহা! কত সখ। দড়িতে ঝুলিয়ে মারবে। পাগলা কুত্তা পেয়েছে, না?

প্রতিদিন খাবার নিয়ে হাঙ্গামা করে গিরধারী। এক গ্রাস ভাত মুখে দিয়েই থু থু করে ফেলে দেয়।

সন্ধ্যে হতেই চেঁচামিচি আরম্ভ করে—মশারী চাই। উঃ কি ভয়ানক মশা! যেমন জেলের লোকগুলি তেমনি মশাগুলি।

শাস্ত্রী পাঁড়েজি মেজাজের ধৈর্য কষ্ট করে অটুট রাখে। শান্তভাবেই বোঝাতে চেষ্টা করে—এই রকম গোলমাল করো না, সব পাবে। ঘুমাও, ঘুমাও।

আরও কিছুক্ষণ দাপাদাপি করে একটু শান্ত হয় গিরধারী, ঝিমোতে থাকে, তারপর ঘুমিয়ে পড়ে। গরাদের বাইরে পাঁড়েজির একটানা প্রহরা ও বুটের শব্দ অন্ধকারে মচমচ করে। ঘণ্টা বাজে। পাহারা বদল হয়। ঘুমন্ত গিরধারীর বুকের প্রতিটি স্পন্দনকে সযত্নে পাহারা দেবার জন্য নতুন শাস্ত্রী আসে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসে গিরধারী। জিজ্ঞেস করে—কত রাত হলো?

—এগারটা। চুপ করে ঘুমাও। শাস্ত্রী দিলবর মিঞা উত্তর দেয়। গিরধারী তবু জেগে জেগে কিছুক্ষণ উসখুস করে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে অঘোরে। সমস্ত পৃথিবীর জীবনযন্ত্রের ছন্দের সঙ্গে নিশ্বাস প্রশ্বাসে তাল রেখে কোটী কোটী মানুষের মত ঘুমোতে থাকে গিরধারী।

দু'মিনিট পরেই জেগে ওঠে; শান্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে—খুব ভাল ঘুম হলো সিপাহীজী! আঃ!

দিল্‌বর মিঞা বলে—আবার ঘুমাও।

গিরধারী বিরক্ত হয়ে ওঠে—আর কত ঘুমোব সিপাহীজী!

লাল চিঠি এসে গেছে—হাইকোর্টের সহি এসে গেছে। ওয়ার্ডার আর শান্ত্রীরা সকলেই সে খবর রাখে। গিরধারীর আয়ুর মুহূর্তগুলির মাত্রা বাঁধা হয়ে গেছে।

ব্যারাকের রসুইঘরে রান্না করতে করতে সিপাইরা আলোচনা করে—দুদিন থেকে গিরধারী গোপ একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আরও ঠাণ্ডা হওয়া এখনো বাকী আছে। এখনো কিছু কিছু ইয়ার্কি করে।

—এখনো ওর বিশ্বাস যে ওর ফাঁসি হবে না।

—তাই ভাল, তাই ভাল। ঐ বিশ্বাস নিয়েই বাকি কটা দিন পার করে দিক।

—যাই বল, গিরধারী গোপ কিন্তু বড় শক্ত খুনী। এদের যাওয়া ভাল।

—আরে নেহি ভাই, তাতে কোন লাভ হয় না।

—সব খুনীর যদি ফাঁসি হতো তবে না হয় বলা যেতো যে একটা নিয়ম আছে।

—যারা খুন করে ধরা পড়ে, তাদেরই শুধু ফাঁসি হয়।

—ভেজাল খাবার খাইয়ে কত লোককে খুন করা হচ্ছে, তাদের তো কই ফাঁসী হয় না?

—উল্টে তাদের লাইসেন্স দেওয়া হয়।

—গাঁজা আফিম খেয়ে কত লোক রক্ত শুকিয়ে মরে যায়। কই কেউ তো বাধা দেয় না, বিচার করে না?

—কত লোকে ফুর্তি করে মোটর গাড়ি চালিয়ে কত লোক মারে।

—কিন্তু জেনে শুনে তো মারে না ভাই, ভুল করে মারে।

—আরে হাঁ হাঁ। সব খুনই ভুল করে হয়। মেজাজের ভুল।

শান্ত্রী পাঁড়েজি পাহারায় এসে দেখে, গিরধারী ধীর স্থির হয়ে বসে আছে। এই রকম দৃশ্যই পাঁড়েজি আশা করেছিল। মৃত্যুর ফাঁদে পড়ে

প্রত্যেক অভিশপ্ত প্রাণ প্রথম কয়েকটা দিন যেন দুরন্ত হয়ে ওঠে, বিদ্রোহ করে। তার পরেই ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়ে। শত আশ্বাসে ও প্রেরণায় তখন তাকে আর ঠেলে তোলা যায় না।

পাঁড়েজি বললো—খবর তো এসে গেছে গিরধারী।

গিরধারী—হ্যাঁ, পাঁড়েজি।

পাঁড়েজি—বাস, ভয় করবার কিছু নেই। প্রেমসে রাম নাম কর।

গিরধারী শান্ত ভাবেই উত্তর দিল—অপনি সান্ত্বনা দেবেন না পাঁড়েজি, আমার ফাঁসী হবে না।

শাস্ত্রী পাঁড়েজি চুপ করে গেল। এখনো মুক্তির স্বপ্ন দেখছে গিরধারী। সব দিকে এত টন্‌টনে জ্ঞান, শুধু এই একটি ক্ষেত্রে একেবারে অপোগণ্ড শিশুর মত সে বোকা। এর কারণ খুঁজে পায় না পাঁড়েজি। হয়তো মাথায় দোষ দেখা দিয়েছে গিরধারীর।

গিরধারী বলে—আমাকে এক টুকরো খড়ি যোগাড় করে দিতে পারেন পাঁড়েজি ?

পাঁড়েজি—কেন ?

গিরধারী—ছবি আঁকবো।

পাঁড়েজি—জেলর বাবুকে বলবো।

গিরধারী—জেলের গরুগুলি এত রোগা কেন পাঁড়েজি ?

পাঁড়েজি—আমি জানি না।

গিরধারী—নিশ্চয় ভাল করে খাওয়ানো হয় না।

পাঁড়েজি—জানি না, আমি গয়লা নই।

গিরধারী—জেলরবাবু আসুক, আচ্ছা করে শুনিয়ে দেব।

গিরধারী কয়েকটা দিন আর গান গায়নি। শুধু বার বার প্রশ্ন করে—কটা বেজেছে সিপাহিজী ? আজ কত তারিখ ?

ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক এক সময় নিঝুম হয়ে থাকে গিরধারী। অন্তর্লোকের পথে যেন কারও পায়ের শব্দ শুনছে। সে আসছে। সে এতক্ষণ রওনা হয়ে গেছে। আর কত দেরী করবে ? ছেদিতালাও থেকে লাল কাঁকরের সড়ক ধরে হেঁটে হেঁটে শান্তিময় মৃত্যুর উপঢৌকন নিয়ে রাধিয়া আসবেই। তার ইসারা বুঝতে কি ভুল করবে রাধিয়া ?

অসম্ভব। খুব চালাক মেয়ে রাধিয়া। জীবনের সব কাজে রাধিয়া সাহায্য করেছে। শুধু একটি ক্ষেত্রে পারেনি। রাধিয়ার জীবনের তৃপ্তির একটি মাত্র অভিশাপ, একটি মাত্র বাধা, তাকেও হেসো দিয়ে নির্মূল করে দিয়েছে গিরধারী। তবে আর কেন? এখন তো পথে আর কোন কাঁটা নেই। স্বচ্ছন্দে রাধিয়া চলে আসতে পারে।

গিরধারীর বিশ্বাস অবিচল থাকে। রাধিয়া ঠিক সময় মত পৌছে যাবে। ফাঁসার মৃত্যু থেকে রাধিয়া তাকে মুক্তি দেবে।

গিরধারীর স্বপ্ন বোধ হয় মিথ্যে হতে চলেছে। জেলর ও ডাক্তার এলেন সেলের কাছে। গিরধারীর ওজন নেওয়া হলো।

কোন প্রশ্ন করার আগেই জেলর জানিয়ে দিলেন—কাল তোমার ফাঁসির দিন, গিরধারী গোপ।

গিরধারী চুপ করে রইল। জেলর বললেন—যা খেতে টেতে চাও বল, সব মিলেগা।

গিরধারী জবাব দিল কিছু না।

সেলের দরজা বন্ধ হলো।

দুপুর পর্যন্ত সেলের মেজের ওপর গিরধারীর শীর্ণ মূর্তিটা কুঁকড়ে পড়েছিল। দেয়াল মেজে ছাত—সব নিরেট, কোথাও একটা ফুটো নেই যে সাপ হয়ে পালিয়ে যাওয়া যায়। কয়েদীদের খাওয়া হয়ে গেছে, কাকের ঝাঁক এঁটো খাওয়ার জন্য কলরব করে উড়ে বেড়াচ্ছে বাইরে—শব্দ শোনা যায়।

সেলের দরজা খুলে দিল্‌বর মিঞা এসে খবর দিল—মোলাকাতে চল। তোমার জেনানা এসেছে।

না, স্বপ্ন মিথ্যে হয়নি। এক লাফে উঠে দাঁড়ালো গিরধারী। মেজের ওপর কম্বলটাকে এক লাথি মেরে পেছনে সরিয়ে দিল। গিরধারী যেন সব বন্ধন ছিন্ন করে চলেছে। আর এখানে ফিরে আসতে হবে না।

অফিস ঘরের পাশে, একটা গরাদের ওপারে এসে বসলো গিরধারী। একজন ওয়ার্ডারের সঙ্গে রাধিয়া ঢুকলো অফিস ঘরে।

এক দৌড়ে এসে গরাদের ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো রাধিয়া। মেজের ওপর ঢপ করে একটা প্রণাম করলো।

ফুঁপিয়ে কাঁদছিল রাধিয়া। চরম বেদনা ও হতাশার একটা প্রতিধ্বনি যেন টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। রাধিয়া বলছিল—ছিনিয়ে নিলে গো। তোমার খাবার ছিনিয়ে নিলে।

অতি নগণ্য খাবার জিনিষ, একটুখানি গুড়ের হালুয়া আর একটা পেঁড়া পাতায় মুড়ে নিয়ে এসেছিল রাধিয়া। কিন্তু সে সাধ সফল হয়নি। ফটকের শান্ত্রীর কাছে জমা রেখে আসতে হয়েছে।

জেলর রাধিয়াকে বোঝাতে চেস্টা করলেন—এর জন্যে এত কান্না কেন? আরও ভাল খাবারের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। তুমি নাম কর, কি খাওয়াতে চাও। রসগোল্লা জিলিপী……।

গিরধারী তাকিয়েছিল অদ্ভুত ভাবে। একটা মৃত মানুষের মূর্তির মধ্যে চোখের কোটর দুটো যেন হাঁ করে রয়েছে। সে দৃষ্টিতে কোন অর্থ নেই, ভাষা নেই, আবেগ নেই, জ্যোতি নেই। আজ এতদিনে সত্যিকারের ফাঁসির হুকুম শুনতে পেয়েছে গিরধারী। রাধিয়ার নিজের হাতের তৈরী মধুর মৃত্যুর উপহার হাতের নাগালে পৌছলো না। গিরধারীর মেরুদণ্ডটা কাঁপছে, বেঁকে যাচ্ছে, কটকট করে বাজছে, জীবনকাঠি ভাঙছে।

ভয়ার্ত ছোট ছেলের মত হাঁউ হাঁউ ক'রে কেঁদে উঠলো গিরধারী।—বাঁচাও রে বাবা! বাঁচিয়ে দে রে বাবা!

সবাইকে আশ্চর্য করলো গিরধারী। অদ্ভুত। গিরধারীর মত এত শক্ত আসামী, হঠাৎ এভাবে ভেঙে পড়ে কেন?

কেরাণীবাবু ঘড়ি দেখলেন। মোলাকাতের সময় শেষ হয়ে গেছে। দু'জন ওয়ার্ডার রাধিয়ার হাত ধরে ফটকের বাইরে টেনে নিয়ে গেল।

সমস্ত জেলের কয়েদী আশ্চর্য হয়ে শুনলো ফাঁসির আসামী গিরধারীর ব্যাকুল চীৎকার আর কান্না। বধ্যভূমির গন্ধ পেয়ে একটা পশু যেন সেলের ভেতর আর্তনাদ করছে।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। শান্ত্রী পাঁড়েজি পাহারায় আছে। কান্না থামিয়ে গিরধারী কম্বলের ওপর মুখ গুঁজে পড়েছিল।

রাত্রি আর অন্ধকার ক্রমে ঘনিয়ে উঠলো। সব নম্বর বন্ধ হলো। দেখা যায়, কলঘর থেকে একটু দূরে খোলা মাঠের ওপর নতুন একটা বাতি জ্বলছে। ফাঁসির তক্তা পাহারা দিচ্ছে শান্ত্রি। ঠিক আছে, সব ঠিক আছে।

দড়ি পরীক্ষা হয়ে গেছে। তিন মণ ওজনের বালির বস্তা ঝুলিয়ে দড়ির শক্তি টেস্ট করা হয়েছে। পোষা অজগরের মত চর্বি-মাখানো দড়িটা গুটিয়ে পাকিয়ে পড়ে আছে অফিস ঘরের একটা সিন্দুকে—তালাবদ্ধ হয়ে।

আর এক নম্বরের কুঠুরিতে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছে জহ্লাদ বংশী দোসাদ। ফাসি প্রতি পাঁচ টাকা রেট। আজ রাত শেষ হয়ে সকাল হতেই বংশী দোসাদের রোজগারের হিসাবে পাঁচ টাকা জমা হবে।

জেলখানার মাথার ওপরের অন্ধকারে পাখার বাতাস দিয়ে, বুড়ো বটের পাতার ভীড় ছেড়ে মাঝে মাঝে বাদুড়ের ঝাঁক উড়ছিল। টর্চ হাতে নিয়ে জেলর আর হাবিলদার শাস্ত্রী রাউণ্ড দিয়ে গেলেন। সব ঘুমিয়ে পড়েছে, প্রত্যেকটি নম্বর নিঝুম। তাঁতখানা, কলঘর, ঘানি—তারপর বাঁ দিকে ঘুরে ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে সেলের কাছে পৌঁছলেন।

গিরধারী উঠে বসে সেলাম জানালো।

জেলর জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছ? ঘুম হয়েছে?

গিরধারী—হ্যাঁ, বাবু।

জেলর—তবিয়ৎ ভাল আছে?

গিরধারী—হাঁ বাবু।

জেলর—খেয়েছ?

গিরধারী—হাঁ বাবু।

জেলর—বেশ বেশ। এখনও অনেক রাত আছে ঘুমোও।

জেলরবাবু চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে আর একবার দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেসা করলেন—তোমার কিছু বলবার আছে?

গিরধারী চুপ করে রইল। তার পর বললো—না।

জেলরবাবু চলে যাচ্ছিলেন। গিরধারী ডাকলো—বাবু!

জেলর—বল।

গিরধারী—রোজ রাত্রিবেলা বাইরে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান হয় শুনতে পাই, কে গায়?

জেলর—আমার মেয়েরা গায়।

গিরধারী—আজ কিন্তু দিদিদের গান শুনতে পেলাম না বাবু।

জেলর একটু অপ্রস্তুত হয়ে কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বাইরে চলে গেলেন। সেলের সামনে ডবল শান্ত্রীর পাহারা অন্ধকার আগলে দাঁড়িয়ে রইল।

গিরধারী নিঃশব্দে বসে রইল। শান্ত্রী পাঁড়েজি বললেন—ঘুমোবার চেষ্টা কর গিরধারী।

গিরধারী বললো—কিছু তুলসীবচন শোনাতে পারেন পাঁড়েজি?

পাঁড়েজি—রাম নাম কর গিরধারী। তুলসীবচনের সার হলো রাম নাম। কোন ভয় নেই।

সীতারাম! সীতারাম! নিশ্বাসের সঙ্গে আস্তে আস্তে নাম উচ্চারণ করলো গিরধারী।

ভোরের আবছা অন্ধকারে জেল কম্পাউণ্ডের বাইরে সড়কের ওপর গাছ তলায় চুপ করে বসেছিল রাধিয়া। একটা কুপিতা নিশাচরী মূর্তি যেন সময় গুণতে গুণতে ভোর করে ফেলছে। আর পালিয়ে যেতে পারেনি। রাধিয়ার কাপড় ধুলোয় লাল হয়ে গেছে। রুক্ষ চুলগুলি এলোমেলো হয়ে আছে। সারা রাত যেন জেলখানার প্রত্যেকটি শব্দকে উৎকর্ণ হয়ে পাহারা দিয়েছে, চোখের পলক ফেলেনি। চোখ দুটো ফুলে লাল হয়ে আছে। রাধিয়ার আঁচলে কয়েকটি শ্বেতকৌড়ি আর খই পুঁটলি করে বাঁধা। পাশে একটা মেটে কলসী, জলে ভরা।

ফটকের আলো নিভলো। জেলখানার মাঝখানে একটা গাছের মাথায় সারা রাত আলোর ছটা লেগেছিল। সে আলোও নিভেছে, রাধিয়া দেখতে পায়।

ফটকের ভেতর দিয়ে লোক আসা যাওয়া করছে। ভোরের কাকের দল শব্দ করে পূব আকাশের দিকে ছুটেছে।

সীতারাম! সীতারাম! সীতারাম! মানুষের বুক থেকে একটা আর্ত মন্ত্রের শব্দ ছিটকে বের হয়ে জেলখানার বাতাসে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে।

রাধিয়া জলের কলসী হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ফটকের দিকে এগিয়ে চললো।

সীতারাম! সীতারাম! সীতারা…।

এক অদৃশ্য সেতারের তার হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। হুমম্—হ্যাঁচকা টানে একটা ভাষাহীন বোবা যন্ত্রণা যেন নিমিষের মধ্যে পৃথিবীর বুকের ভেতর ঢুকে পড়লো।

ফটকের কাছে একটা গরুর গাড়ি দাঁড়িয়েছিল লাস বয়ে নেবার জন্য। রাধিয়া ফটকের কাছে এসে দাঁড়াতেই শাস্ত্রী বললো—বসো, লাস আসছে।

লাস এল—কম্বলে জড়ানো গিরধারী।

রাধিয়া বললো—কম্বল সরাও। আমি ওকে একবার দেখবো।

ডোমেরা কম্বলের ঢাকা সরিয়ে দিতেই, চমকে কপালে হাত দিয়ে এক ঠায় দাঁড়িয়ে রইল রাধিয়া। গিরধারীর আধ হাত লম্বা জিভ আর দড়ির মত লিকলিকে গলাটার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখ দুটো জোরে ঘসে নিয়ে চারদিকে তাকালো।

সমস্ত পৃথিবীকেই আড়চোখে একবার দেখে নিল রাধিয়া। বুক ফেটে চরম ধিক্কার বের হয়ে এল—ছি ছি, একি চেহারা করে দিয়েছে রে। এর চেয়ে আমার বিষেক্ষ হালুয়া যে ঢের ভাল ছিল রে!

বলতে বলতে কেঁদে ফেললো রাধিয়া।

কি বলছে? কি বলছে? ওয়ার্ডারেরা একে একে এসে রাধিয়াকে ঘিরে দাঁড়ালো।

এক আছাড় দিয়ে জলের কলসীটা ফটকের সামনে ফাটিয়ে দিল রাধিয়া। আঁচল থেকে শ্বেতকোড়ি আর খই বের করে ছিটিয়ে দিল।

শেষ ব্রত সাঙ্গ হয়েছে রাধিয়ার। রাধিয়া আর ফিরে তাকালো না। ওয়ার্ডারদের পাশ কাটিয়ে দৌড়ে চলে যাবার জন্য চেষ্টা করলো।

ওয়ার্ডারেরা বললে—দাঁড়াও, পালিয়ো না। জেলরবাবু আসুক, পুলিশ আসুক। ইস, কী সাংঘাতিক মেয়েমানুষ!

মুক্তপুরুষ হরিদাস

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এটি মুক্তপুরুষ হরিদাসের জীবনী।

হরিদাস চক্রবর্ত্তী বি, এ, বি, টি,; এখানকার স্কুলে অনেকদিন ধরিয়া মাষ্টারি করিতেছেন। সম্প্রতি মুস্কিল হইয়াছে এই যে, একে দিনে রাতে চোখের অসুখে তিনি রীতিমত ভুগিতেছেন, তাহার উপর হেডমাষ্টারের কড়া তাগাদা—হাফ্ইয়ারলির খাতাগুলো আর ক'দিন ফেলে রাখবেন মশাই? সব মাষ্টারদের খাতা দেওয়া হয়ে গেল, আর আপনি ফাইভ উইক্স্ খাতা নিয়ে বসে আছেন—একখানাও দেখলেন না—এতে করে স্কুলের কাজের যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে।

হরিদাস বাবু বিনীত ভাবে বললেন—চেষ্টা তো করচি স্যর, চোখের জন্যে পড়তে পাচ্চি না, দিচ্ছি যত শিগগির হয়—

আবার তিনদিন গেল। আবার হেডমাষ্টার কড়া তাগাদা দিচ্চেন—কি মশাই? এখনো আপনি খাতা দিচ্চেন না?

— দিচ্চি স্যার, আর দু-পাঁচটা দিন—

—না মশাই, তা হবে না। আপনি পরশু নিশ্চয় খাতা দেবেন, নয়তো ষ্টেপ নিতে বাধ্য হবো। আমি কোনো অন্প্লেজ্যাণ্ট ব্যাপার করতে চাইনি, কিন্তু—

তার ওপর বাড়িতে একপাল ছেলেমেয়ে দিন রাত খাই খাই করিতেছে; তাহাদের আকাঙ্খা মিটাইতে পারে, ত্রিভুবনে হেন বাপ মা আজও জন্মগ্রহণ করে নাই। সামান্য বিয়াল্লিশ টাকা বেতনের স্কুল মাষ্টার হরিদাস বাবু এই যুদ্ধের বাজারে আর কত খাওয়ানোর ব্যবস্থা করিতে পারেন।

খাতা একটি গাদা। সকালে উঠিয়া টিউশনি করিতেই সময় কাটিয়া যায়, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা বলিবার পর্য্যন্ত সময় হয় না। বাজার করিতে হয় টিউশনি করিয়া ফিরিবার পথে। বাড়িতে গিয়াই শুনিতে হয়, গিন্নি বলিয়া বসেন, আজ একখানি শাড়ি দ্যাখো, যেখানেই হোক, মেয়েটা কি ন্যাংটো হয়ে থাকবে? তোমার না হয় গা ভিম করে বসে থাকলে চলে, আমার তো তা চলে না?

কাপড় কোথা হইতে আসে সে জ্ঞান যদি বাড়ির মেয়েদের থাকিত! তাহা ছাড়া দু-এক মাস হয়, লোকে পারে। এই ব্যাপার চলিতেছে কি আজ? কতকাল হইতে এই অবস্থায় তিনি কালযাপন করিতেছেন বা আরও কতকাল করিতে হইবে, তাহা কে জানে?

কিন্তু উপায় কি? উপায়ও তো কিছু দেখেন না।

এই সময় আর একদিন হেডমাষ্টারের কড়া কথা শুনিতে হইল, পরীক্ষার খাতা ভাল করিয়া দাগ দিয়া না দেখার দরুণ। হেডমাষ্টার বলিলেন খাতাগুলো কি অমন করে দেখে? ওতে ছেলেদের কি সুবিধে হবে মশাই? আপনি আজকাল কাজে বড় অমনোযোগী হয়েচেন, খাতাগুলি ফেরৎ নিয়ে যান, ওতে কাজ চলবে না। সেদিন টিফিনের ছুটিতে স্কুলের সম্মুখের মাঠের গাছতলায় বসিয়া বিড়ি টানিতে টানিতে হরিদাস বাবুর মনে হইল এ বিষম বিপদ হইতে কবে তিনি পরিত্রাণ পাইবেন। এই বন্ধন দশা চলিতেছে কতকাল। এমন কি কোনো উপায় নাই, যাহাতে তিনি এই দুঃখ দারিদ্র্য ও ক্রীতদাসত্বের বন্ধন এড়াইতে পারেন?

ভগবান এ প্রার্থনা শুনিলেন।

কি ভাবে তাহা বলি। বড় আশ্চর্য্য ঘটনা!

থার্ড ক্লাসের শ্রীপতি কুণ্ডু বেঞ্চির তলায় লুকাইয়া একখানা কি বই পড়িতেছে হরিদাস বাবু দেখিতে পাইলেন। দুবার বারণও করিলেন— এই, কি হচ্চে? অঙ্ক কসো—তাড়াতাড়ি কসো—

কিন্তু শ্রীপতি অঙ্ক কসিবে কেন, ভগবান যে অদ্য তাহাকেই দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন সংসারক্লিষ্ট হরিদাসের নিকট। এরূপ অলৌকিক ঘটনা আপনারা মহাপুরুষদের জীবনীর মধ্যে অনেক পাঠ করিয়াছেন, মনে করিয়া দেখুন। শ্রীপতি আবার লুকাইয়া সেই বইখানি পড়িতে লাগিল। এবার হরিদাস বাবু চেয়ার হইতে উঠিয়া গিয়া তাহার হাত হইতে ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইয়া তাহার কাণ সজোরে মলিয়া দিলেন। পরে চেয়ারে ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন। কৌতূহল বশতঃ বইখানি খুলিলেন। আগে ভাবিয়াছিলেন, কোনো নাটক নভেল হইবে—অন্ততঃ ভূতের গল্প। কিন্তু তা নয়, বইখানার নাম 'দেববাণী', স্বামী বিবেকানন্দ

রচিত। হরিদাস বাবু ধর্ম্মের ধার কখনো ধারিতেন না, তবে বিবেকানন্দের নাম ভালই জানিতেন। বইখানি একবার পড়িয়া দেখিবেন বলিয়া হাতে করিয়া রাখিয়া দিলেন।

পরদিন রবিবার টিউশানি ছিল না। বাড়িতে চা খাইয়া হরিদাস বইখানি লইয়া বসিলেন। পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া গেলেন। এসব কি কথা! আমিই সেই! আমিই ভগবান। অহং ব্রহ্মাস্মি সোঽহং।

কি মহান, বিরাট আইডিয়া! কি হিমালয়ের মত উদার গগনচুম্বী বাণী! হরিদাস মাষ্টার ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার মাথা গিয়া মহাব্যোমে ঠেকিল, স্বসংবেদ্য অনুভূতিতে মনপ্রাণ ভরিয়া গেল, তিনি আজ অজর, অমর, শাশ্বত আত্মা, ভগবান আর তিনি হাত ধরাধরি করিয়া যুগ যুগ পার হইয়া চলিয়া আসিয়াছেন অনন্তকাল ধরিয়া, চলিবেন অনন্তকাল ধরিয়া। তিনি মহাজ্ঞানী, মহাপ্রেমিক, মহাবীর। জগতকে বেদান্ত শিক্ষা দিবার জন্য, এই পরম সত্য প্রচার করিবার জন্য তিনি লীলাদেহ ধারণ করিয়াছেন—ক্রমে একথাও ধীরে ধীরে হরিদাসবাবুর মনের নিভৃত কোণে বাসা বাঁধিতে লাগিল।

হরিদাস মাষ্টার ব্রহ্ম।

এক আধদিন নয়, সাতদিনে বইখানি অন্ততঃ পাঁচবার পড়িলেন। খাতা দেখিবার জন্য ফোর্থ ক্লাসের মুকুল হকের নিকট হইতে যে নীল পেন্সিলটা আনিয়াছিলেন, তাহা দিয়া দাগ মারিয়া পড়িলেন, ছেলেদের পরীক্ষার কাগজ হইতে সংগৃহীত সাদা কাগজে অনেক ভালো ভালো কথা টুকিয়া রাখিলেন, রাত্রি জাগিয়া বইখানার মধ্যে উদ্ধৃত অনেক সংস্কৃত শ্লোক কণ্ঠস্থ করিলেন, মোটের উপর বইখানি লইয়া মশগুল হইয়া রহিলেন।

ধন্য শ্রীপতি কুণ্ডু! তুমি বালকমাত্র, তুমি জানো না একজন দুঃস্থ, হতভাগ্য শিক্ষকের জীবনে তুমি কি জিনিস দিলে। এ অনেকটা সেই ঘটনার মত। হরিদাসবাবু ও তাঁহার এক বন্ধু পায়ে হাঁটিয়া বৈদ্যবাটি বেড়াইতে গিয়াছিলেন, দুপুর ঘুরিয়া গেল, দুজনেই অভুক্ত। অবশেষে কোথাকার বাজারের এক অপকৃষ্ট হোটেলে তাঁহারা পিতলের থালায় মোটা চালের ভাত খাইতে বসেন। তখন দুপুর অনেকক্ষণ ঘুরিয়া

গিয়াছে। তাঁহার বন্ধুটি দারুণ ক্ষুধার মুখে ভাত পাইয়া মহা খুসি, খাইতে খাইতে গদগদকণ্ঠে বার বার বলিতে লাগিল—হরিদাস, তুমি জানো না সিষ্টেমকে তুমি কি দিলে!

হরিদাসবাবুর বড় মনে ছিল কথাটা।

শ্রীপতি কুণ্ডু, তুমিও জানো না, হরিদাসবাবুকে তুমি কি দিলে।

এই সাতদিনে হরিদাস বাবু সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেলেন। এমন সব বাণী পৃথিবীতে আছে তাঁহাকে কেহ বলে নাই। তিনিই বা কি করিয়া জানিবেন?

স্কুলে গিয়া শ্রীপতি কুণ্ডুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁরে ও বই কোথায় পেলি?

—আজ্ঞে ও দাদার বই।

—কোথায় পেলেরে তোর দাদা ও বই?

—কোত্থেকে এনেছিল স্যর। আরও আছে ওইরকম দু'তিনখানা বই।

—আছে? আজ টিফিনের সময় নিয়ে আসবি। অবিশ্যিকরে আনবি—বুঝলি?

টিফিনের ছুটির পরে শ্রীপতি কুণ্ডু আরও দুখানা বই আনিয়া দিল। বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' এবং স্বামী মহেশ্বরানন্দ গিরির "অধ্যাত্ম দর্শন।"

হরিদাসবাবু যেটুকু সময় পান, বই দুখানি পড়েন। দুদিন টিউশানি কামাই করিলেন। হরিদাস বাবুর স্ত্রী তাগাদা দেন—তুমি এ দুদিন ছেলে পড়াতে যাওনি যে? আজও তো হিম হয়ে বসে আছ। টুইশানি আছে তো?

—থাকবে না কেন?

—তবে যাওনা কেন? ঐ দশটা টাকা আসে তাই দুধটা হয়। সকালের ছেলে পড়ানটা চলে গেলে দুধ ছাড়িয়ে দিতে হবে। দাম জোগাবে কোথা থেকে? আজও যাবেনা নাকি?

—আজ শরীরটা তেমন ভাল নেই।

—এই তো দিব্যি চা খেলে, মুড়ি খেলে। যাও একবার বেড়াতে বেড়াতে। লালমোহন ঘোষ কড়া লোক, সেবার সেই জানো তো?

বেনুর বিয়ের জন্যে তিন দিন কামাই হয়েছিল বলে ছাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। আজ বসে থেকো না, যাও।

লালমোহনের তাগাদার চেয়েও গৃহিণীর তাগাদা কড়া। হরিদাস বাবু স্ত্রীকে ভয় করিয়া চলেন! অগত্যা বই লইয়াই চলেন ছাত্রের বাড়ি। ছাত্রের বাবা লালমোহন ঘোষ বড় আড়তদার ব্যবসায়ী। ঘুঘু লোক। লালমোহন বাড়ি ছিলনা তাই রক্ষা। হরিদাস বাবু আর আগের মত ভয়ও করেন না। যা বলে বলিবে। পুস্তকের অধীত জ্ঞান যদি দৈনন্দিন কর্ম্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে না পারা গেল, তবে আর জ্ঞানের মূল্য রইল কোথায়।

স্বামী মহেশ্বরানন্দ গিরির পুস্তকেই আছে, "যে ব্যক্তি শুধু বোঝা বোঝা পুঁথি পড়ে অথচ একবারও আত্মচিন্তা করে না, ভগবানের সহিত একাত্মবোধ তাহার নিকট হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিতেছে। সেবা-ধর্ম্মের উৎকর্ষ সম্বন্ধে প্রবন্ধ অনেক রচনা করিয়াছে, পাঠ করিয়াছে, কিন্তু ভিখারিকে একটা পয়সাও দেয় নাই, ভগবানকে চিনিতে বা বুঝিতে তাহার এখনো বহু বিলম্ব।"

হরিদাস বাবু ছাত্রকে ডাকিলেন—কেশব?

ছাত্র বাহিরে আসিয়া বলিল—কাল পরশু এলেন না স্যর?

হরিদাস বাবু আগে আগে এক্ষেত্রে বলিতেন, অসুখের জন্য আসিতে পারেন নাই। কিন্তু এবার তিনি সে লোক নহেন। এত ভয় কিসের। লালমোহন ঘোষের তিনি ধার ধারেন না। সত্য কথা বলিবেন, ইহাতে ভয় করিলে চলে না। অতএব বলিলেন—এমনি একটু অসুবিধে ছিল।

—বাবা বলছিলেন তাই বলচি স্যর।

—কি বলছিলেন?

—বকছিলেন। জানেনতো বাবাকে। ওই রকম লোক।

—তা কি হবে এখন? বাড়ীতে অন্য কাজ ছিল। পড়ো।

ছেলেকে অঙ্ক কসিতে দিয়া হরিদাস মহেশ্বরানন্দ গিরির বই পড়িতে লাগিলেন।

"বিচারবলে কেহ কেহ জানিতে পারেন যে জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। বহু সাধনবলে সংস্কার সকল দূর হইয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে, তবে আপনাকে ও জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে দর্শন হয়।

যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্ববিধ সংস্কার বর্জ্জিত হইয়াছেন, তাঁহারা আপনাকে ও বহুরূপী জগৎকে ব্রহ্মরূপেই দর্শন করেন।"

হরিদাসবাবুর দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, জ্ঞান তাঁহার হইয়া গিয়াছে। সর্ব্ব সংস্কারের একটি সংস্কারও তাঁহার নাই। ব্রহ্ম ও তিনি যে এক, এ জ্ঞান তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে ঢুকিয়াছে।

কি ভয়ানক কথা!

এত সহজে সংসারের জ্বালাযন্ত্রণার হাত এড়ানো যায়, কেহ এতদিন তাঁহাকে বলে নাই কেন?

পুনরায়—"মুক্ত পুরুষসহ উপযুক্ত সাধন অবলম্বন করিয়া উত্তমপুরুষ ব্রহ্মে চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়েন।"

সাধন তো তাঁহার হইয়া গিয়াছে। তিনি সব বুঝিতে পারিয়াছেন। সাধন না হইলে দিব্যজ্ঞান হয়? দিব্যজ্ঞান তাঁহার হইয়া গিয়াছে অথবা যদি বাকি থাকে, সামান্যই বাকি।

"তদবস্থায় গুণাতীত আশ্রয়রূপী ব্রহ্ম তাঁহাদের নিকট স্বতঃই প্রকাশিত হয়েন এবং তাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়েন।"

উঃ, এ সব কথা এতদিন কোথায় ছিল!

পুনরায়—"সময় না হইলে তত্ত্বসমূহ জীবনের নিকট প্রকাশ করা হয় না। যে উপযুক্ত পাত্র, মহাপুরুষ বাক্যের সম্পূর্ণ অনুকূল, শুধু তাঁহারই নিকট গভীর শাস্ত্রতত্ত্বসমূহ উপস্থাপিত হইয়া থাকে।"

ধন্য মহেশ্বরানন্দ গিরি! ধন্য শ্রীপ্রীতি কুণ্ডু!

আজ সময় হইয়াছে বলিয়াই তাহা হইলে এ তত্ত্ব তাহার চোখের সামনে মেলিয়া ধরিয়াছেন।

দিন কুড়ি কোথা দিয়া কাটিয়া গেল, হরিদাসবাবু বুঝিতে পারিলেন না। আগের সে হরিদাসবাবু একেবারেই নাই। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করে, সে কি আর সাধারণ মানুষ থাকে? হরিদাসবাবুর সাহস বাড়িয়া গিয়াছে, আগের মত ভীরু তিনি আর নাই, টুইসানির ছাত্রের পিতাকে আর তত গ্রাহ্য করিবার আবশ্যক কি? কিসের ভয় তাঁর? তিনি অজর অমর আত্মা। দুদিনের জন্য লীলাখেলা করিতে

পৃথিবীতে আসিয়াছেন। এতদিন বুঝিতে পারেন নাই তাই ছোট হইয়া ছিলেন।

হরিদাসবাবু স্বাধীন হইবেন।

সর্ব্বপ্রথমে চাকুরী ছাড়িতে হইবে। জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে হইলে বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইবে।

সেদিন ভাবিলেন, স্ত্রীকে সব খুলিয়া বলেন, কিন্তু সাহসে কুলাইল না। দশটার সময় আহারাদি সারিয়া সাজিয়া গুজিয়া প্রতিদিনের মত বাহির হইলেন কিন্তু স্কুলে গেলেন না।

পথের মধ্যে আলতাপোলের খালের ওপর যে পুল আছে, তাহার নিচে ঘাসের উপর ছায়ায় গিয়া বসিয়া রহিলেন। সঙ্গে দুখানা অধ্যাত্ম-তত্ত্বের পুস্তক। একপ্রকার লুকাইয়াই রহিলেন এইজন্য যে স্কুলের ছেলেরা স্কুলে যাইবার পথে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। স্কুলে গিয়া হেডমাষ্টারের কাছে বলিয়া দিবে অথবা বাড়িতে তাঁহার স্ত্রীর নিকট। চুপচাপ থাকিয়া বই পড়িতে পড়িতে বিড়ি টানিতে লাগিলেন। বিড়ি ফুরাইয়া গেল। অসুবিধা হইতে লাগিল। বাজার স্কুলেরই কাছে। সেখানে বিড়ি কিনিতে গেলে কেউ না কেউ টের পাইবে। কি করা যায়?

রাস্তা দিয়া একটা লোক বিড়ি টানিতে টানিতে যাইতেছে। কে লোকটা? হরিদাসবাবু মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন। একটা বিড়ি কি চাহিবেন? নাঃ, লোকটা কি মনে করিবে।

হরিদাসবাবু ডাকিলেন—ওহে শোনো—

লোকটা রেলিং হইতে নিচের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ের স্বরে বলিল—কি বাবু?

—নেমে এসো। বাজারে যাচ্ছ কি? দু'পয়সার বিড়ি আমার জন্যে আনবে?

—দাঁড়ান বাবু।

সে নামিয়া আসিল। বলিল—এখানে কি করচেন বাবু?

—এই—এই—ইয়ে কাঠের গাড়ী আসচে কিনা, তাই বসে আছি। কাঠ কিনবো।

লোকটি চলিয়া গেলে হরিদাস বাবুর মনে অনুতাপ হইল। ছিঃ,

বিড়ির আসক্তিতে মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিলেন, আর বিড়ি খাইবেন না। বিড়ি ত্যাগ করিলেন আজ হইতে। অবশ্য এই দুই পয়সার বিড়ি খাইয়া লইবেন আজকার মত।

বেলা চারটার পর হরিদাস বাবু পুলের তলা হইতে বাহির হইয়া বাড়ি আসিলেন। দিব্যি চা খাইলেন, খাবার খাইলেন, যেমন স্কুল হইতে ফিরিয়া প্রতিদিন খাইয়া থাকেন।

আবার পরদিনও সেই রকম। তবে এবার স্কুলের তলা নয়, মাঠের একটা বটগাছের তলায় বসিয়া রহিলেন। অন্য একটি বাণ্ডিল বিড়ি বসিয়া বসিয়া পুড়াইলেন।

এমনি ভাবে সাত দিন কাটিয়া গেল। দশটায় বাড়ি হইতে রোজ বাহির হন, আবার ঠিক সাড়ে চারটায় বাড়ি আসিয়া পৌছান। কোন হাঙ্গামা নাই, মুক্ত মন মুক্ত জীবন। এতদিনে তিনি আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। কিন্তু বোধহয় ভগবান অধ্যাত্ম সাধনার পথে বাধা সৃষ্টি করেন, সাধককে আরও উন্নত করিবার জন্য। সেদিন বাড়ি ফিরিতেই গৃহিণী বলিলেন—আজ মাইনে হয়েচে?

হরিদাস বাবু থতমত খাইয়া বলিলেন—মাইনে?

—হ্যাঁ গো মাইনে হয়নি?

—না।

—কেন হয়নি? আজ তো ইংরেজী মাসের সাত তারিখ। পাঁচ তারিখে তো তোমাদের মাইনে হয়।

—আজও হয়নি।

—ইদিকে তো আর চলে না। হাজরী মেছুনি রোজ তাগাদা আরম্ভ করেচে, গায়ের মাংস খুলে যাচ্ছে। দুধওয়ালী আজ সকালেও তাগাদা দিয়েচে—তাদের বলে রেখেচি তুমি আজ মাইনে আনবে।

—তা আজ না দিলে আমি কি করবো?

—চালও বাড়ন্ত। কাল কি হবে তার ঠিক নেই। কি খেয়ে কাল ইস্কুলে যাবে? কাপড় একজোড়া না কিনলে এমাসে, বাড়ি থেকে আর বেরুনো যাচ্ছে না।

—না যায়, বেরিও না—

এই কথায় গৃহিণী তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া ধুন্ধুমার ঝগড়া সুরু করিলেন।

বড় মেয়ে আসিয়া বলিল—বাবা, আমার বই এনে দিলে না?

—কি বই?

—কবিতা সোপান, দ্বিতীয় ভাগ। না কিনলে বুড়ো মাষ্টার রোজ বকে। তুমি কালই কিনে দাও বাবা।

—আচ্ছা, আচ্ছা, হবে। এখন যা।

গৃহিণী ওঘর হইতে গলা চড়াইয়া বলিলেন—কাল থেকে তোর স্কুলে যেতে হবেনা। যতদিন না বই কেনা হয়, ততদিন স্কুলে যাবি নে, খবরদার বলচি।

সংসার অসার তো বটেই, ঘোর অশান্তিময়। এসব তিনি গ্রাহ্য করেন না। স্ত্রী বকিতেছে, বকুক। নারীজাতির স্বভাবই ওই। তাঁহার মন ব্রহ্মোপলব্ধির পন্থায় শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, এসব সাংসারিক ঝগড়া দ্বন্দ্ব অতি তুচ্ছ জিনিষ, তিনি এসবের উর্দ্ধে আছেন। চিরকাল তো তোমাদের দাসত্ব করিলাম, এখন জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়াছে, চোখ রাঙাইয়া আর সাবেক পথে ফিরাইতে পারিবেনা। বকিতেছে বকিয়া মরুক।

মানুষ কত সহজে দেবতা হয়, তাঁহার জানা ছিলনা। দেবতা কে, না যে সংসারের মধ্যে থাকিয়াও নির্লিপ্ত। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণপথে উদিত হইল। জয় ও পরাজয়, লাভ ও ক্ষতিকে যে সমান দৃষ্টিতে দেখিতে পারে সে-ই তো অধ্যাত্ম রাজ্যের একজন বড় গাঁতিদার বা তালুকদার। তিনি আজ সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত আছেন। কিসের বলে? জ্ঞানের বলে। ব্রহ্মোপলব্ধির বলে। আত্মসাক্ষাৎকার লাভের বলে। অতএব তিনি জীবমুক্ত। তিনি দেবতা।

পর দিনের প্রভাতটি যেন তাঁহার কাছে তাঁহার নবজীবনের প্রভাতের মত ঠেকিল।

কি সুন্দর শরতের ঝলমলে আলো গাছ পালায়! কি সুন্দর বিহঙ্গ কাকলী! এ সব যেন নতুন চোখে আজ দেখিতেছেন। কিন্তু এ দৃষ্টি, কবির দৃষ্টি, আত্মতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানীর দৃষ্টি নয়। হরিদাস বাবু যে সে কথা

বুঝিলেন তা নয়, তবু ভাল লাগিল এই শরতের আলো, সবুজ গাছপালা, নীল আকাশ।

কবির দৃষ্টি তাই কি, কবি কি জ্ঞানী নয়?

সবে আসিয়া বাইরের ঘরে বসিয়াছেন, এমন সময় হাজরী মেছুনি আসিয়া বলিল—বাবা ঠাকুর উঠেছেন? দুদিন আমি আপনার দেখাই পাইনে। পেন্নাম হই। ইয়ে গিয়ে আমার ও মাসের সেই চিংড়ি মাছের দরুণ সাতসিকে পয়সা বাকি। আজ না দিলে চলবে না। মহাজনের টাকা বাকি, আজ তাদের দেনা শোধ দিতে হবে।

হরিদাসবাবু বলিলেন আচ্ছা, আচ্ছা এখন যা—বেলা হোলে আসবি।

—কত বেলা হ'লি?

—আঃ বিরক্ত করলে! এই বেলা ন'টা দশটা।

—বাবা ঠাকুর, আপনি ব্যাজার হবেন না, ব্যাজার হ'লি চলে? আমরা হচ্চি গরীব লোক। আপনার দোর থেকে নিয়ে গিয়ে তবে খাব। একটু বেলা হ'লি আসবো এখন, দামটা চুকিয়ে দেবেন এখন।

মেছুনি চলিয়া গেল।

হরিদাসবাবু সকাল দশটার আগেই ভাতে ভাত খাইয়া গিয়া পুলের তলায় বসিলেন। মুস্কিল এই যে, বিড়ি ফুরাইয়াছে। নগদ পয়সার অভাব। যে কয়টি খুচরা আনি দুয়ানি পকেটে ছিল, স্ত্রীকে দিয়া আসিতে হইয়াছে।

যাকগে। আশাতে আসক্তির বন্ধন? সর্ব্ব বন্ধন মুক্ত না তিনি? তিনি না অজর, অমর, আত্মা? বিড়ি না টানিলে কি হয়? বিড়ি ছাড়িয়া দিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া গীতার ভাষ্য পড়িলেন। কৃষ্ণানন্দ স্বামীর এই ভাষ্যখানি সম্প্রতি পাড়ার রামতারণ মুখুয্যের কাছে চাহিয়া লইয়াছেন। বুড়ো রামতারণ ঘুঘু লোক, সুদখোর মহাজন, গীতার মহিমা সে কি বুঝিবে? টাকার আণ্ডিল, একটা পয়সার সদ্ব্যয় নয়। গীতা অত সহজ জিনিস নয়।

আরও একদিন এভাবে কাটিল।

তাগাদার চোটে পথে ঘাটে বাহির হাওয়ার যো নাই। বাড়ীতেও তিষ্ঠিবার যো নাই। গত মাসের মাহিনা দিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, স্কুলের হরিদাস বাবু হিসাব করিয়া দেখিলেন, আজ ইংরাজি মাসের এগার

তারিখ। চার তারিখে মাহিনা হওয়ার দিন। এদিকে আর চলে না। একরাশ দেনা, দুধওয়ালী দুধ বন্ধ করিবে কাল হইতে।

বাড়ীতে গৃহিণী বলিলেন—হ্যাঁগা, আর তো চলে না। এবার কি তোমাদের মাইনে হবে না? এত দেরী করচে কেন এবার? আজ ইস্কুলে গিয়ে ভালো করে বলো পোড়ার মুখো হেডমাষ্টারকে।

তেরোদিন অনুপস্থিতির পর হরিদাস বাবু আজ স্কুলে গিয়া, গুটি গুটি হাজির হইলেন।

তখনও ঘণ্টা পড়ে নাই। হরিদাস বাবুর পা কাঁপিতেছে। জিব শুকাইয়া গিয়াছে। এতদিন কামাই করিবার কি কৈফিয়ৎ দিবেন? বড় কড়া হেডমাষ্টার।

হেডমাষ্টারের আফিসে কম্পিত পদে দুরু দুরু বক্ষে ঢুকিতেই হেড-মাষ্টার মুখ তুলিয়া চাহিয়া নীরস স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—এতদিন কি হয়েছিল আপনার?

ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্ত পুরুষ হরিদাস সে চশমা পরা চোখজোড়ার তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে আত্মজ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস হারাইয়া মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিলেন।

বলিলেন—স্যার, ইয়ে—বাড়িতে বড্ড অসুখ। তলপেটে যন্ত্রনা। তাই নিয়ে আজ এ ক'টা দিন যে কি ভাবে কেটেচে। তার ওপর রাত জেগে নার্স করতে হচ্চে। আর তো দ্বিতীয় লোক নেই বাড়ীতে। কি কষ্টে যে যাচ্চে স্যার। একে পয়সার অভাব, ডাক্তারে—ওষুধে বিশ পঁচিশ টাকা ব্যয় হয়ে গেল—বড় বিপদে পড়ে গিয়েচি স্যার—

হেডমাষ্টার বলিলেন—বুঝলাম। আপনার একটা খবর দিতে কি হয়েছিল? অসুখ বিসুখ হবে সেটা আশ্চর্য্য নয়—বাট ইউ অট টু হ্যাভ ইনফর্মড্ মি—স্কুলের ইণ্টারেষ্ট সাফার করচে, এ জ্ঞান আপনার থাকা উচিত ছিল। আপনি না পুরনো টিচার? না, এরকম হোলে হরিদাস বাবু, আই অ্যাম সরি টু টেল ইউ, আমাকে সেক্রেটারির কাছে রিপোর্ট করতে বাধ্য হোতে হবে আপনার নামে—

—এবারটা স্যার এক্সকিউজ করুন দয়া করে। আমার মাথার একদম ঠিক ছিল না এ ক'দিন, সে কি কষ্ট আর যন্ত্রণা রাত্রে, যদি দেখতেন স্যার তবে আপনারও কষ্ট হোত—এগারো দিন রাত্রে ঘুমুই নি, ঠায় শিয়রে জেগে বসে আছি স্যার - চোখে দেখা যায় না সে যন্ত্রণা—

হরিদাস বাবু কাঁদো কাঁদো হইলেন।